সম্রাট ও সুন্দরী

সম্রাট ও সুন্দরী

শংকর

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
—মাঘ, ১৩৬৮
—জানুআরি, ১৯৬১

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৯

মুদ্রাকর :
দিলীপকুমার চৌধুরী
সরস্বতী প্রেস
১২ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা ৯

উৎসর্গ

সেকালের কোহিনুর থিয়েটারে
অভিনীত 'রাণী দুর্গাবতী'
ও 'দধীচি' ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক
আমার পিতৃদেব
স্বর্গত হরিপদ মুখোপাধ্যায়ের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

"It is remarkable how virtuous and generously disposed everyone is at a play. We uniformly applaud what is right, and condemn what is wrong, when it costs us nothing but the sentiment."

William Hazlitt

অর্বাচীন সমকালের উদ্ধত ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে নগর কলকাতার উত্তরাঞ্চলে যে সব বিগতযৌবনা রঙ্গশালা বর্ষীয়সী নটী বিনোদিনীর মতো বিষণ্ণ বদনে রাজপথের উদাসীন জনস্রোতের দিকে আপন মনে তাকিয়ে আছে তারই কোথাও এই কাহিনীর শুরু।

শুরুর আগে প্রণাম জানাই নাট্যমঞ্চের জাগ্রতদেবতা শ্রীশ্রীঠাকুর পরমহংসদেবকে। মানসিক পদধূলি গ্রহণ করি বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের পরমপুরুষ মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের।

এইভাবেই প্রতিদিন অপরাহ্ণে দৈনন্দিন জীবন শুরু করেন আমাদের এই কাহিনীর অন্যতম চরিত্র শ্রীবীরেশ্বর রক্ষিত। প্রাতঃস্মরণীয় দুজন পুরুষের পাদপদ্মে দুটি সুগন্ধি ধূপ নিজের হাতে জ্বালিয়ে দেওয়ার পরে বাহান্ন বছরের বীরেশ্বর রক্ষিত কোহিনূর থিয়েটারের দোতলায় নিজের অফিস-ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে যে-কাণ্ডটি করেন তা এই থিয়েটারের অফিস-ম্যানেজার নরহরি এবং বেয়ারা অর্জুন ছাড়া আজ পর্যন্ত কেউ নিজের চোখে দেখে নি। আড়াল থেকে দৃশ্যটা আবার দেখবার লোভে অর্জুন বেয়ারা আজও তৈরি হয়ে আছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সায়েবের দেখা নেই।

খোদ বীরেশ্বরকেই এবার আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করছি। তিনি এখন একটা সবুজ রঙের অ্যামব্যাসাডর গাড়ির মধ্যে বসে আছেন।

বীরেশ্বর রক্ষিত—নাদুসনুদুস চেহারা, গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌর, কাকাতুয়ার মতো তীক্ষ্ণ খাড়া নাক, কিন্তু গোলগাল চোখদুটো দেহের সাইজের তুলনায় একটু ছোট। উচ্চতা পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। ঠোঁট-জোড়াও নজরে পড়বার মতো, তবে নিচের ঠোঁটটা অনেক বেশী পুরু। ওজন বিরাশি কেজি—গত পনেরো বছর ধরে নিয়মিতভাবে বছরে এক কেজি ওজন বাড়ছে বীরেশ্বরের। কিন্তু তা বলে কোনোরকম বেয়াড়া রোগের অধিকারী নন বীরেশ্বর। শরীরের রক্ত ও রক্তচাপ তিনি নিয়মিত পরীক্ষা করিয়ে যাচ্ছেন।

বীরেশ্বরের মোটরগাড়ি মন্থরগতিতে রঙমহল, বিশ্বরূপা থিয়েটার পেরিয়ে একটা পুরনো ট্রামের পিছন-পিছন কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে শহরের উত্তর দিকে এগিয়ে চলেছে। গাড়ির ভিতর অনেকক্ষণ শালগ্রামশিলার মতো হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার পরে বীরেশ্বর এবার নড়েচড়ে উঠলেন। পিছনের সীটে দেহ এলিয়ে দিয়ে সামনের সীটে মাইনে-করা ড্রাইভারের প্রায় ঘাড়ের কাছে বীরেশ্বর ভারি পা দু'খানা তুলে দিলেন। একবার এক বদলী ড্রাইভার (পুরনো ড্রাইভার দুঃখহরণ সেবার ছুটিতে পাটনা গিয়েছিল) নিজের কাঁধের কাছে মনিবের এই চরণপদ্ম দেখে খাপ্পা হয়ে উঠেছিল এবং বীরেশ্বরকে পা নামিয়ে নিতে বলেছিল। ছোঁড়াটা নাকি অনেকদিন এই শহরে ডেরাইভারি করছে, কিন্তু কখনও কোনো মালিককে এইভাবে পা তুলে দিতে দেখে নি।

বীরেশ্বর রক্ষিত বিস্ময়ে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। দাঁতে দাঁত চেপে বীরেশ্বর বলেছিলেন, "আমার গ্যাঁটের পয়সায় কেনা মোটরগাড়িতে আমার ঠ্যাং কোথায় রাখবো তাও আমাকে

চাকর-বাকরের কাছে শিখতে হবে!" সেদিন অফিসে পৌঁছেই বদলী ড্রাইভারকে বিদায় করেছিলেন বীরেশ্বর রক্ষিত এবং সেইসঙ্গে নরহরিকে বলেছিলেন, "বাপধনের একটু 'চিকিৎসার' ব্যবস্থা কোরো।"

বিনয়ে বিগলিত নরহরি হুকুম তামিল করবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। দু'দিন পুলিস হাজতে রাত্তির কাটিয়ে ডেরাইভার পরশুরাম পাত্রের বিষ দাঁত ভেঙে গিয়েছিল। এবং টেমপোরারি মনিবের যে-পায়ের ওপর এত অশ্রদ্ধা তাই জড়িয়ে ধরে ভেউ-ভেউ করে কেঁদেছিল। বীরেশ্বরের কাছে মিনতি জানিয়েছিল, "আমাকে কেসের হাত থেকে বাঁচান।"

বীরেশ্বর গম্ভীরভাবে ঠোঁট উল্টেছিলেন এবং এই অবস্থায় তাঁর কী কর্তব্য তা জানবার জন্যে অফিস-ম্যানেজার নরহরি ব্যানার্জির মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। নরহরি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন "ক্যাৎ-ক্যাঁৎ করে লাথি মারুন, স্যার। না-হলে ডিসিপ্লিন রাখতে পারবেন না।"

যে-পায়ের লাথি খেয়ে টেমপোরারি ড্রাইভার পরশুরাম পাত্র বিদায় নিয়েছিল সেই ডান-পাটাই এখন বীরেশ্বর সামান্য নাড়াচ্ছেন। গাড়ি স্টার থিয়েটারের সামনে হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পিছনের কাঁচ দিয়ে বীরেশ্বর একবার শত সহস্র রজনীর অভিনয়ে ক্লান্ত থিয়েটারপাড়াটা দেখলেন। স্টারের দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবলেন—বড় রাস্তার ওপরে অথবা খুব কাছে থেকে এপাড়ার থিয়েটারগুলো কেমন সহজে দর্শক টানছে। তাঁর কোহিনুর থিয়েটারে এই সুবিধে নেই। সেখানে যেতে হলে পাবলিককে অনেক বেশী মেহনত করতে হয়।

সামনের ট্রাম কোনো অজ্ঞাত কারণে থেমেছিল—গাড়িটা এবার বেতো ঘোড়ার মতো নড়ে উঠলো। স্টার থিয়েটারকে

পূর্বদিকে রেখে বীরেশ্বরের গাড়ি আবার মন্থর গতিতে উত্তর দিকে এগিয়ে চললো।

লোকে লোকারণ্য বিধান সরণী। ট্রাম-বাস তো দূরের কথা, রিকশা ছুটবার মতো জায়গা নেই। বীরেশ্বর আগে এই ভিড় দেখলে বিরক্ত হতেন। ভাবতেন, সন্তানের জন্ম দেওয়া ছাড়া এদেশের মানুষগুলোর বোধহয় আর কোনো কাজ নেই। কিন্তু এই কোহিনূর থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত হবার পর থেকে বীরেশ্বর মত পরিবর্তন করেছেন। বীরেশ্বর এখন প্রার্থনা করেন, প্রতিটা সংসার নতুন নতুন মানুষে ভরে যাক। বাড়িতে তাদের যেন নড়বার-চড়বার জায়গা না থাকে। তবেই তো ঘরকুনো মানুষগুলো বারমুখো হবে এবং কয়েক ঘন্টার আনন্দের জন্যে তারা কোহিনূর থিয়েটারের সমস্ত সীট ভরিয়ে ফেলবে।

বীরেশ্বর সম্প্রতি এক বিচিত্র অভ্যাস আয়ত্ত করেছেন। মানুষের ভিড় দেখলেই তিনি দ্রুত গুণতে আরম্ভ করেন। এক হাজার মানুষ গণা হলেই তাঁর মনে পড়ে যায় কোহিনূর থিয়েটারে এর থেকে বেশী বসবার ব্যবস্থা নেই। বীরেশ্বরের গাড়ি হাতি-বাগানের মোড়ের কাছে আবার থমকে দাঁড়ালো। "আঃ, আবার কী হলো ?" বিরক্তভাবে বীরেশ্বর প্রশ্ন করলেন।

"ছেলেদের মিছিল আসছে।" দুঃখহরণ ড্রাইভার ডানদিকের জানলা দিয়ে বাইরে উঁকি মেরে মালিককে খবর দিলো।

বীরেশ্বর আপন মনে উপর-নিচের চোয়ালের দাঁতগুলো চেপে ধরলেন। এ-যুগের ছোঁড়াগুলোকে তিনি অন্তর থেকে ঘেন্না করেন। এক এক সময় তাঁর মনে হয়, এদের অনেকে গত জন্মে জন্তু-জানোয়ার ছিল। পরের ব্যাপারে কাঠি দেওয়া ছাড়া পাড়ার ছোঁড়াদের আর কোনো কম্ম নেই। এরা যে কি হতভাগা তা বীরেশ্বর হাড়ে-হাড়ে বুঝেছিলেন সেবার বেলেঘাটায়।

বেলেঘাটার ব্যাপার কিছু আজকের নয়। ইতিমধ্যে আদি

গঙ্গার নালা দিয়ে অনেক ময়লা জল বয়ে গিয়েছে, কিন্তু বীরেশ্বর এখনও ভুলতে পারেন নি।

এখন কি গাড়ি চলবে না? ড্রাইভার দুঃখহরণ খেলার মাঠে পুলিসের ঘোড়ার মতো ছটফট করছে—জ্যামে পড়লে তার মেজাজ ঠিক থাকে না। গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দুঃখহরণ তিড়িং করে ডানদিকের দরজা খুলে রাস্তায় নেমে পড়লো। একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে অবস্থা দেখে এসে বললো, "গরমেণ্টের উচিত দুনিয়ার যেখানে যত ছোঁড়া আছে তাদের সবাইকে জেলে পুরে ফেলা। তাহলে এই শহরে ডেরাইভাররা গাড়ি চালিয়ে একটু সুখ পাবে।"

মতলবটা মন্দ দেয়নি দুঃখহরণ—বীরেশ্বর মনে মনে খুশী হলেন। লোকাল বয়েজগুলো সব পাড়াতেই সমান—নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করতে এদের জুড়ি হোল্ ওয়ার্লডে নেই। হাজারে-হাজারে লাখে-লাখে এদের গারদে পুরে রাখো না, বাবা। তারপর একটু বয়েস বাড়লেই তেজ কমবে, গ্যাস ফুরিয়ে আসবে—তখন ছেড়ে ছুড়ে দিও। আপিসে, দোকানে, কারখানায় তখন এরা মন দিয়ে কাজকর্ম করবে। অবসর সময় বউকে নিয়ে চলে আসবে এই পাড়ায়—কোহিনূর থিয়েটারে একখানা সীটও পড়ে থাকবে না। নরহরির হুকুমে দারোয়ান 'হাউস ফুল' বোর্ড টাঙিয়ে দেবে।

বীরেশ্বর এই মুহূর্তে মানসচক্ষে কোহিনূর থিয়েটারের রঙচটা নড়বড়ে দেড় ফুট-বাই-এক ফুট বোর্ডখানা দেখতে পাচ্ছেন। হঠাৎ মনে পড়লো অনেক দিন আগে মধুমালতী তাঁকে বলেছিল, "এখন আর ইংরিজী কথা কেন? হাউস ফুলের জায়গায় বড় বড় করে লিখে দিন প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ।" ইস্কুল-কলেজে কোনোদিন না গেলেও, মধুমালতীর পেটে বেশ বিদ্যে আছে। নাটক নবেল কবিতা অনেক পড়েছে মধুমালতী—সেসব থেকে যা জ্ঞান মেয়েটা আহরণ করেছে তা এম-এ ক্লাসের অনেক মাস্টারও জানে না।

মধুমালতীর কোনো কথায় তখন তো বীরেশ্বর না বলতে পারতেন না। তবু হাউস ফুল সাইনটা শেষ পর্যন্ত পাল্টানো হলো না। বীরেশ্বরের মনে পড়ছে, বোর্ডখানা রঙ করবার হুকুম তিনি নরহরিকে দিয়েছিলেন। নগেন মিস্ত্রি দু' নম্বর সিরিশ কাগজ এনে বোর্ডখানা ঘষতে আরম্ভ করেছিল। সেই সময় অধর চাটুজ্যে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল বীরেশ্বরের ঘরে। হাতে সেই বোর্ডখানা এমনভাবে ধরেছে অধর, যেন প্যারিসের মিউজিয়াম থেকে 'মোনালিসার' অরিজিন্যাল ছবিখানা সে দাম দিয়ে কিনে বাড়ি ফিরছে।

"তুমি করছো কী?" বীরেশ্বর জিজ্ঞেস করেছিলেন অধর চাটুজ্যেকে। বীরেশ্বরের সেই মুহূর্তে মনে পড়েছিল নিজের বউ এবং একমাত্র পুত্রসন্তানের কথা। অনেকদিন আগে ফিয়ার্স লেনের বাড়িতে নবজাত খোকনকে ঠিক ওইভাবে কোলের কাছে আঁকড়ে ধরে শ্যামা ঘোরাঘুরি করতো।

অধর চাটুজ্যে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিল, "আর একটু দেরি হলেই সর্বনাশ হতো। এই 'হাউস ফুল' কার হাতের লেখা জানেন?"

"কার হতে পারে?" বীরেশ্বর এইসব ব্যাপারে কখনও মাথা ঘামান নি। নাটকীয় কায়দায় অধর বলেছিল, "স্বয়ং গিরিশবাবুর। ওঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে অমর দত্ত এই সাইনবোর্ড ঝুলোতেন ক্লাসিক থিয়েটারে। সেখান থেকে গোপনে স্মাগ্‌ল হয়ে বোর্ড-খানা এসেছিল আমাদের এই থিয়েটারে।"

বীরেশ্বর এই সব সেকেলে সেন্টিমেন্টের ধার ধারতেন না। কিন্তু কোথা থেকে খবর পেয়ে গ্রীনরুম থেকে বেরিয়ে মধুমালতীও তখন বীরেশ্বরের কামরায় হাজির হয়েছে।

অধর চাটুজ্যে বললো, "একেবারে ঘোড়ার মুখ থেকে শোনা। আমার বাবা নধর চাটুজ্যে তখন পুরনো এমারেল্ড থিয়েটারে

প্রম্পটারের চাকরি করেন। এমারেল্ড থিয়েটার মনে আছে তো? ধনপতি মতিলাল শীলের উত্তরাধিকারী গোপাললাল শীল রোখের বশে বহু টাকা খরচ করে বীডন স্ট্রীটের স্টার থিয়েটারের বাড়ি তিরিশ হাজার টাকায় কিনেছেন। বাংলা থিয়েটারে সেই প্রথম ডায়নামো বসিয়ে ঝলমলে ইলেকট্রিক আলো সাজানো হয়েছে।"

"তাই বুঝি?" জিজ্ঞেস করলো মধুমালতী।

অধর চাটুজ্যে নাটকীয়ভাবে বললো, "বাবু গোপাললাল শীল বিশ হাজার টাকা বোনাস এবং মাসিক সাড়ে তিনশ টাকা মাইনেতে গিরিশবাবুকে ভাঙিয়ে এনেছেন স্টার থিয়েটার থেকে। এমারেল্ডের জন্যে জম-জমাট নতুন নাটক লিখে ফেললেন গিরিশবাবু—নাম পূর্ণচন্দ্র। সে নাটক মৃত্যুর দিন পর্যন্ত আমার বাবার মুখস্থ ছিল।"

একবার ঢোক গিললো অধর চাটুজ্যে। অল্পেতেই নাটকীয়তা এনে হাজির করে অধর—ব্যাপারটা বীরেশ্বরের স্বভাবে নেই।

অধর বললো, "পূর্ণচন্দ্রের প্রথম অভিনয় রজনী। তারিখটা বলে দেবো? আমার মুখস্থ আছে।"

"তারিখটা বলতে হবে না! ব্যাপারটা কী হলো বলো," অধরকে মৃদু বকুনি লাগিয়েছিলেন বীরেশ্বর।

অধর শুরু করলো, "অভিনয়ের অনেক আগেই সব টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। চারদিক লোকে-লোকারণ্য। গিরিশবাবু থিয়েটারের ম্যানেজার। খোঁজ-খোঁজ। কোথাও হাউস ফুল বোর্ড নেই—এর জন্যে কেউ তৈরি ছিল না। তখন গিরিশবাবু নিজেই ঘরের মধ্যে গিয়ে ওটা লিখে ফেললেন। কী পয়মন্ত বোর্ড আপনাকে বলবো! ওই পূর্ণচন্দ্র থেকেই খরচ-খরচা বাদ দিয়ে বাবু গোপাললাল শীল হাজার হাজার টাকা কামালেন।

নিজের ধুতির খুঁট দিয়ে অধর চাটুজ্যে 'হাউস ফুল' বোর্ডখানা খুব যত্ন করে মুছতে মুছতে বলেছিল, "এমারেল্ড থিয়েটার থেকে

চলে যাবার সময় গিরিশবাবু বোর্ডখানা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং যথা সময়ে এটি যার হাতে পড়বার সেই অমর দত্তর হাতে পড়লো। কালুবাবু এই বোর্ডের পয়েই বাংলা থিয়েটারে ভেল্কি খেলিয়ে দিয়েছিলেন, সে তো জানেনই। তারপর অনেক কষ্টে এ বোর্ড এখানে এসেছে।"

সেদিনের ঘটনা স্মরণ করে বীরেশ্বর মনে মনে হাসলেন। গিরিশ ঘোষের বক্স অফিসের কেরামতি তাঁর জানতে বাকি নেই। এতই যদি পাবলিক টানবার ক্ষমতা ছিল, তাহলে বেশীর ভাগ নাটক আঁতুড়ঘর থেকে বেরনো মাত্রই অক্কা পেতো কেন? বীরেশ্বর রক্ষিতের মতো শত অভিনয় রজনী, দ্বিশত রজনী, অর্ধসহস্র রজনীর রেকর্ড কী গিরিশ ঘোষ, দানিবাবু, অমরেন্দ্র দত্ত কেউ করতে পেরেছেন?

কিন্তু সেদিন অধরের মুখে গিরিশের নাম শুনেই মধুমালতীর চোখে জল এসে পড়লো। নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে সে আর একবার সাইনবোর্ডটা মুছেছিল। আদরের ভড়ং দেখে একটু হিংসে হয়েছিল বীরেশ্বরের। বাইরের লোক না থাকলে, বীরেশ্বর ওইসময় একটা সীন ক্রিয়েট করতেন, বলতেন, "মালতী পরের জন্মে আমি যেন ওই বোর্ড হয়ে জন্মাই।"

বুকের কাছ থেকে বোর্ডটা নামিয়ে দিয়ে মধুমালতী আবার গ্রীনরুমে ফিরে গিয়েছিল। অধর চাটুজ্যে বলেছিল, "আমরা বরং, আর একটা বাংলা বোর্ড লিখিয়ে নিচ্ছি।" কিন্তু তা আর শেষ পর্যন্ত করা হয়ে ওঠে নি।

·

দুঃখহরণ ড্রাইভার হঠাৎ গাড়িতে স্টার্ট দিতেই বীরেশ্বর রক্ষিত চমকে উঠলেন। সামনের গাড়িগুলো ইতিমধ্যে নড়ে উঠেছে। পুলিস তাহলে একটু-আধটু কাজ করছে, ভাবলেন বীরেশ্বর রক্ষিত। ছোঁড়াগুলোকে ওরা তাহলে কব্জা করেছে।

ওমা! কোথায় কজা? কয়েক পা গিয়েই গাড়ি আবার থমকে দাঁড়িয়েছে। সামনের গাড়িতে প্রবল উত্তেজনা। মিছিলের কয়েকটা ছোকরা এসে গাড়িটা ঘিরে ধরেছে। দুঃখহরণ বললো, "হঠাৎ স্টার্ট নিতে গিয়ে গাড়িখানা একটা লোককে গুঁতিয়ে দিয়েছে।"

কয়েকজন ছোকরা এসে কাছাকাছি কয়েকটা গাড়ির ওপর তবলার চাঁটি মারতে শুরু করলো। দুঃখহরণ মিনতি করে বললো, "ওরকম করবেন না দাদা—আজকালকার গাড়ি, দালদা টিনের বডি, এখনই তুমড়ে যাবে।"

ছোকরাদের একজন শুনিয়ে দিলো, "রাস্তার নবাব তোমরা! বাপের পয়সা আছে বলে, যাকে খুশি চাপা দিয়ে যাবে? যারা পায়ে হাঁটে তাদের বুঝি মা-বাপ নেই?"

বীরেশ্বরের সমস্ত শরীর রাগে জ্বলছে। ইচ্ছে করছে রাস্তায় নেমে ছোঁড়াগুলোকে জুতোপেটা করেন।

মনিবের মনের অবস্থা দুঃখহরণ বুঝতে পারছে। অবস্থা আয়ত্তে আনবার জন্যে সে কায়দা করে বললো, "দাদারা, গাড়ি চাপা পড়ার কথা উঠছে কেন? ভদ্রলোককে শুধু একটু গুঁড়িয়ে দিয়েছে। যন্তর হলেও, ভগবানের জীব তো, কাঁহাতক এই জ্যামে বেচারার মেজাজ ঠিক থাকে বলুন?"

গুঁতনো কথাটা দুঃখহরণ বেশ জব্বর বার করেছে তো, ভাবলেন বীরেশ্বর রক্ষিত। হাটে বাজারে ষাঁড়রা যে কর্মটি করতো, এখন রাজপথের ট্যাক্সি এবং প্রাইভেট গাড়ি সেই পবিত্র দায়িত্ব নিয়েছে।

ইতিমধ্যে মিছিলের মুখ একটুখানি এগিয়ে এসেছে। বীরেশ্বরের খেয়াল ছিল না, দু'দিন পরেই ২৩শে জানুআরি। নেতাজী জন্মোৎসব শোভাযাত্রার ড্রেশ রিহার্সাল হচ্ছে আজ। ছেলেদের ভয়ে, নেতাজীর মূর্তি দেখে বীরেশ্বরকে একবার নাম-কা-ওয়াস্তে মাথা নিচু করতে হলো। কিন্তু সুভাষ বোসের কাণ্ডের মাথামুণ্ডু বীরেশ্বর

কিছুই বুঝতে পারেন না। "বেশ তো বাপু, আই-সি-এস হয়েছিলে। সুখে থাকতে ভূতে কিললো, দেশ দেশ করে জীবনটা গুবলেট করলে। এমন কি বিদেশে বেঘোরে শেষ পর্যন্ত কী যে হলো, তা ঠিকমতো জানাই গেল না।"

আর এখনকার ছোঁড়াগুলোও বলিহারি যাই— কতদিন হয়ে গিয়েছে এখনও নেতাজী সুভাষ এবং স্বামী বিবেকানন্দ নিয়ে নাচানাচি করছে।

ছোঁড়াগুলো মিছিল দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। গাড়ির মধ্যে বীরেশ্বরকে দেখে একজন ছোকরা এগিয়ে এসে বললো, "এই যে বীরেশ্বরদা। কোহিনূর থিয়েটারে এবার যে একটা দেশাত্ম-বোধক নাটক নামাবেন বলেছিলেন, তার কী হলো?"

বীরেশ্বর একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। দেশকে উদ্ধার করবার জন্যে নেতাজী দেশ ছাড়তে পারেন, কিন্তু বীরেশ্বর রক্ষিত দেশোদ্ধারের জন্যে এই কোহিনূর থিয়েটারের দায়িত্ব নেন নি। কিছু লোকের খপ্পরে পড়ে, কোহিনূর থিয়েটারের আগেকার মালিক হরেনবাবু তো নামিয়েছিলেন 'বন্দেমাতরম্'। কী হলো? প্রথম উইকে টোটাল বিক্রি হয়েছিল, সাতশ পঁচাত্তর টাকা।

এসব কথা এই চ্যাংড়ারা বুঝবে না। এদের মধ্যে কয়েকটা আবার কট্টর আদর্শবাদী। বিড়ি খায় না, সিগারেট খায় না, মদের নেশা নেই, বিশ্বাস করে বিবেকানন্দ, সুভাষ বোস, রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথে নতুন দেশ গড়ে উঠবে। সেই সঙ্গে আবার গান্ধী-মহারাজের বচন আওড়ায় ওই ছোকরা অসিত সেনশর্মা।

গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে একগাল হেসে বীরেশ্বর এবার অসিতকে বললেন, "অনেকদিন দেখি না কেন, ভাই? নরহরিকে বলা আছে, যখন-খুশি নাটক দেখতে চলে আসবেন আপনি। যুবসমাজের জন্যেই তো আমার এই নাট্যজগতে আসা। নাহলে আপনারা তো জানেন, অন্য বিজনেসে ভালই আছি।"

অসিত সেনশর্মা এখনও বীরেশ্বর রক্ষিতকে পুরোপুরি বোঝে নি। একমুখ হেসে সে বললো, "এম-এ পরীক্ষার জন্যে কয়েকদিন ব্যস্ত আছি। আজ তেইশে জানুআরির মহড়া। না বেরোলেই নয়, তাই একটু বেরিয়েছি। পরীক্ষার পরেই আপনার ওখানে যাবো একদিন। দেখুন যদি দেশকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে কিছু করতে পারেন। আপনারা না হলে দেশকে কেউ জাগাতে পারবে না। শুধু এই মিছিল বার করে কিছুই হবে না, বীরেশ্বরদা।"

দার্শনিকের মতো রহস্যময় হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেললেন বীরেশ্বরদা। অসিতকে শুনিয়ে দিলেন, "যুবশক্তিই তো আমাদের ভবিষ্যৎ—আপনারাই তো ভরসা।"

অসিত সেনশর্মা মিছিলের সঙ্গে আরও দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেলো। বীরেশ্বর রক্ষিতের দাঁত এবার কড়মড় করে উঠলো, "থিয়েটারটা বাপের সম্পত্তি পেয়েছো! তোমাদের হুকুম মতো আমাকে উঠতে-বসতে হবে?"

"হতভাগারা এখনও রাস্তা ক্লিয়ার করলো না?" সায়েবের গলা শুনেই দুঃখহরণ বুঝছে মনিব বেশ রেগে উঠেছেন।

পাড়ার ছোঁড়াদের ওপর বীরেশ্বরের সত্যিই জাতক্রোধ আছে। মামলা করে, বুদ্ধির প্যাঁচে ফেলে, টাকার ফাঁদ পেতে, ভয় দেখিয়ে দুনিয়ার সবাইকে আয়ত্তে আনবার মতো ক্ষমতা রাখেন বীরেশ্বর রক্ষিত—কেবল এই লোকাল বয়েজগুলো ছাড়া। রবি ঠাকুর লিখেছিলেন, ওরা অকারণে চঞ্চল। ব্যাটারা চঞ্চল নয়, চম্বলের এক একটা খুদে ডাকাত। এদের যেমন রোখ, তেমন মেজাজ। কোর্ট কাছারি, থানা পুলিস কিছুই ছোঁড়াগুলো বুঝতে চায় না, বীরেশ্বর ভাবলেন।

সে বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। বীরেশ্বরের মনে পড়লো, বাড়ির বউ-এর একঘেয়ে মুখ রোজ দেখে দেখে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে অনেক কষ্টে তিনি কুসুমকুমারীকে সংগ্রহ করেছিলেন।

সাক্ষাৎ উর্বশীর মতো দেখতে ছিল কুসুমকুমারী। যেমন হাসি, তেমন চাহনি, তেমনি বুক। কিন্তু বড্ড কষ্টে ছিল মেয়েটা—না পেতো খেতে, না পেতো পরতে। বীরেশ্বরের গোডাউনের পাশে আর একটা গোলায় কাজ করতো কুসুমের কাকা। বাপ-মা মরা মেয়ে—গরীব কাকার নিজের সাংসারিক বোঝার ওপর বাড়তি পোঁটলা।

সুযোগ বুঝে বীরেশ্বর কাকাকে বুঝিয়েছিলেন, "জলধর, শুধু শুধু এতো কষ্ট করছো কেন? অভাবে-অনটনে উঠতি বয়সের মেয়েমানুষরা অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। দাদার দায় কীভাবে উদ্ধার করবে ভেবে নিজের শরীরস্বাস্থ্য নষ্ট কোরো না জলধর। আমি তো রয়েছি—কুসুমের দায়িত্ব আমিই নেবো।"

ব্যাটা জলধর কাজেকর্মে গাধা হলেও, এ-ব্যাপারে তুখোড় ধাড়ি। কুসুমকে যে কর্তার মনে ধরেছে, তা বুঝে ফেলেছিল। তাল বুঝে, হাজার রকম দুঃখের গাওন আরম্ভ করলো। বাড়িতে এই নেই, ওই নেই, ঘরের ছাদ দিয়ে জল পড়ছে, মেয়েটার মাত্র একখানা শাড়ি। এইসব বলে, তখনকার দিনে নগদ আড়াই হাজার টাকার বিনিময়ে ভাইঝিকে হাতছাড়া করেছিল জলধর।

জলধরের বাড়ি থেকে কুসুমকে সরিয়ে আনবার জন্যে বেলেঘাটায় একটা ছোট বাড়িভাড়া করেছিলেন বীরেশ্বর। প্রথম দিকে কুসুম যাতে কান্নাকাটি না করে, নতুন পরিবেশে মনটা যাতে সহজে বসে যায়, সেই জন্যে প্রথম দিনেই দশখানা ঝলমলে শাড়ি কিনেছিলেন বীরেশ্বর। জলধর ছুটি নিয়ে ভাইঝির সঙ্গে ছিল। শিয়ালদায় গিনিসোনার দোকান থেকে বীরেশ্বর গয়না কিনেছিলেন কয়েক হাজার টাকার। ধর্মতলায় মুসলমান দর্জির দোকানে মাপ দিয়ে কুসুমের জন্যে টাইট ফিটিং জামার অর্ডার দিয়েছিলেন। তারপর কাকুর সঙ্গে গাড়ি চড়িয়ে কুসুমকে বেলেঘাটার বাড়িতে পৌঁছে দেবার হুকুম দিয়ে বীরেশ্বর ব্যবসার কাজে চলে গিয়েছিলেন।

বলেছিলেন, সন্ধ্যে আটটা নাগাদ পায়ের ধুলো দেবেন তিনি।

সেদিন কাজে মন বসছিল না বীরেশ্বরের। নতুন এক রোমাঞ্চ মনের মধ্যে গুনগুন করে উঠছিল। কুসুমকুমারীর সদ্যফোটা ফুলের মতো মুখটা বীরেশ্বরের চোখের সামনে ঘন ঘন ভেসে উঠছিল। সন্ধ্যা আটটার একটু আগেই বীরেশ্বর বেলেঘাটার নির্দিষ্ট জায়গায় ঢুকতে গিয়ে ধাক্কা খেলেন।

পাড়ার কয়েকটা ছোঁড়া বীরেশ্বরের পাঞ্জাবি ধরে গাড়ি থেকে নামালো। বললো, "ঘুঘু দেখেছো, ফাঁদ দেখো নি? গেরস্থঘরের মেয়ের সর্বনাশ করতে এসেছো? শালা, তুমি বেলেঘাটায় ফুর্তি করতে এসেছো। মেয়েটার কান্না না-দেখলে আমরা কিছুই বুঝতে পারতাম না।"

কুসুমের কাকা ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ছোঁড়াদের ধমক খেয়ে জলধর সব বলে ফেলেছে। ছেলেরা কুসুমকে সান্ত্বনা দিয়েছে "লক্ষ্মী দিদি আমাদের, তোমায় কাঁদতে হবে না। আমরা সব ব্যবস্থা করছি।" পাড়ার ছোঁড়ারা সেই রাত্রেই কুসুমের বিয়ের ব্যবস্থা করেছিল। ভয় দেখিয়ে বীরেশ্বরের পকেট থেকে তারা আরও পাঁচশ টাকা আদায় করে নিয়েছিল। তারপরেও ব্যাটারা বলেছিল, "বস্তায় পুরে দাদাকে এবার বৌদির কাছে ফিক্সড্ ডিপোজিট রেখে আয়।"

সেই অপমান বীরেশ্বর এই এতোদিনেও ভোলেন নি।

ছোঁড়াদের দেখলেই তার গা রিরি করে ওঠে। কিন্তু দিনকাল এখন আরও খারাপ হয়েছে—কিছুই করবার নেই। ছোঁড়াদের হাতে গোটা দেশটা তুলে দেবার কথাও কেউ কেউ বলছে। তাহলে কী যে হবে, তা স্বয়ং ঈশ্বর জানেন।

গাড়ি আবার দুলে উঠলো—দুঃখহরণ চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট দেবার

চেষ্টা করছে। সামনের ট্রাম গাড়িটাও চলতে আরম্ভ করেছে। বীরেশ্বর রক্ষিত ড্রাইভারকে বললেন, "হাত চালিয়ে— রাস্তায় অনেক সময় নষ্ট হলো।"

বীরেশ্বর রক্ষিতের খাস ড্রাইভার এবার সায়েবের নির্দেশে হাতিবাগান বাজারে ট্রাফিক পুলিসের নির্দেশ অমান্য করেই সামনে এগিয়ে চললো। তারপর দ্রুত পশ্চিমদিকে বাঁক নিলো সেই রাস্তার মোড়ে যেখানে বড় বড় করে লেখা রয়েছে "কোহিনূর।"

দিনের আলোয় এই লেখা তেমন বোঝা যায় না। এর রূপ খোলে সন্ধ্যেবেলায়। তখন মনে হবে, ওই কয়েকটা অক্ষরে আলোর মোহিনী মায়া মেশানো রয়েছে। দুনিয়ার সকলকে সম্মোহিত করে আলোর ডাইনীটা বলছে, এই রাস্তা ধরে পশ্চিম দিকে চলো, চলো। এখন যাবার মতো জায়গা একটাই আছে। তার নাম কোহিনূর, কোহিনূর থিয়েটার। বঙ্গরঙ্গমঞ্চের উজ্জ্বল মাণিক্য, বাংলা ও বাঙালীর গর্ব, বহু সাধকের বহু তপস্যার ধন কোহিনূর থিয়েটার তোমার জন্যেই খোলা রয়েছে।

বাঁ দিকে মোড় নিয়ে গলির মধ্যে প্রায় আধ কিলোমিটার পথ দুঃখহরণ ড্রাইভার বেপরোয়াভাবে পেরিয়ে এসেছে।

দূর থেকে সায়েবের গাড়িটা ঢুকতে দেখেই কোহিনূর থিয়েটারের কর্মীদের মধ্যে চাঞ্চল্য পড়ে গেলো। নরহরি ব্যানার্জি এতক্ষণ বুকিং আপিসে বসেছিল—সাইড দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে এলো সে। নরহরিকে টাট্টু ঘোড়ার মতো দৌড়তে দেখে লেডি

বুকিং ক্লার্ক মিনতি দত্ত আজও ফিক করে হেসে উঠলো এবং কারেন্ট বুকিং কাউণ্টারের হারুকে বললো, "বেশ ছিলুম। সায়েব এলেই আমার বুক ধড়ফড় করে।"

হারুবাবু এই থিয়েটারের পুরনো আমলের লোক। নিপুণ হাতে টিকিটের ওপর রবার স্ট্যাম্প লাগাতে লাগাতে হারু ভরসা দিলো, "অযথা ভয় করে কী হবে দিদি? টিকিট শর্ট পড়ুক, একই নম্বরের সীটে দু'খানা টিকিট বিক্রি হয়ে যাক, ক্যাশ কম পড়ুক, যাই করি ফাঁসি তো হবে না।"

মনের মধ্যে একটু বল পেয়ে আবার ফিক করে হেসে উঠলো লেডি বুকিং ক্লার্ক মিনতি দত্ত। "মালিকের বিশ্বাস না থাকলে আমাদের ক্যাশ কাউণ্টারে বসাতো না, কী বলেন হারুবাবু?"

"সার সত্য কথাটা বুঝে নিয়েছো, দিদি। ওই হিরো বলো, হিরোইন বলো, বাঘা-বাঘা অ্যাক্টর বলো, অ্যাকট্রেস বলো সব ফালতু। মোরগের মতো ঘাড় উঁচু করে ডাঁটের মাথায় প্লেয়াররা যখন থিয়েটারে ঢোকেন তখন মনে হবে ওঁরাই সব! কিন্তু মালিকের নেকনজর একমাত্র এই বুকিং কাউণ্টারের ওপর। সায়েবকে প্রথম যে খবরটা নরহরি দেবে তা হলো টিকিটের বিক্রি কেমন।"

মিনতি এবার গম্ভীর হয়ে হারুবাবুকে শোনালো, "আমাকে বললেন, ভাল। উনি শুনলে রেগে উঠতেন। ওঁর ধারণা নাটক ও অভিনেতা বাদ দিলে থিয়েটারের কিছুই থাকে না।"

"সারা জন্ম অ্যাক্টো করে তোমার স্বামী থিয়েটারের কচু বুঝেছে," এই কথা বলতে গিয়ে থমকালো হারু ভাদুড়ি। মনে পড়ে গেল মিনতির স্বামী নরু দত্ত এক সময়ের বিখ্যাত অভিনেতা, এখন অসুস্থ, মৃত্যুপথযাত্রী। সায়েবকে হাতে-পায়ে ধরে নরু দত্তর বউকে এখানে চাকরি দেওয়া হয়েছে।

কথা পাল্টে হারু ভাদুড়ি জিজ্ঞেস করলো, "নরুবাবু কেমন আছেন এখন?"

দু'খানা পাঁচ টাকার টিকিট বিক্রি করতে করতে মিনতি বললো, "কালকেও প্রচুর রক্ত উঠেছে। কিন্তু খুব ইচ্ছে একবার থিয়েটারটা ঘুরে যান। আমাকে জিজ্ঞেস করেন, কে কেমন পাট করছে। বিধু মিত্তির কোন্ কোন্ জায়গায় ক্ল্যাপ পাচ্ছে। আমি কোত্থেকে বলবো বলুন তো? আমি তো বুকিং কাউণ্টারে বসে থাকি। ক্যাশের ব্যাপার, হুট করে উঠবো বললেই ওঠা যায় না।"

"কেন? এখানে বসে বসেই মাঝে মাঝে অডিয়েন্সের হাত-তালির আওয়াজ পাও না?" জিজ্ঞেস করলো শিশির ভাদুড়ির দূর সম্পর্কের আত্মীয় হারু ভাদুড়ি।

মিনতি সরল মনে উত্তর দিলো, "বারে! আওয়াজ তো কানে আসে, কিন্তু কে ক্ল্যাপ পাচ্ছে, কী করে বুঝবো?"

হারু ভাদুড়ি বললো, "তোমার হাজবেণ্ড ব্যাচারা যখন এতই আগ্রহী তখন নরহরিকে জিজ্ঞেস করে একটা গোপন চার্ট বানিয়ে দেবো। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারবে কে ক্ল্যাপ পাচ্ছে। এসব নরহরির মুখস্থ। ৬-২৫ মিনিটে যদি ক্ল্যাপ পড়ে তা হলে বুঝবে, বিধু মিত্তিরের ডায়ালগখানা পাবলিকের মনে ধরেছে। কিন্তু খুব সাবধান—যদি ৬-২৭ মিনিটে হাততালি পড়ে তাহলে জানবে মধুমালতীর কপাল আবার খুলেছে—নায়কের সঙ্গে ওই হাসির লাভ সিনখানা পাবলিক নিয়েছে।"

লাভসিন কী করে হাসির সিন হয়, বুঝতে পারে না বেচারা মিনতি। একদিন এই কোহিনূর থিয়েটারে টিকিট কেটে নাটক দেখতে এসে মিনতি মজুমদার তখনকার উজ্জ্বল অভিনেতা নরেন দত্তর প্রেমে পড়েছিল। কোহিনূর থিয়েটারের টেমপোরারি বুকিং ক্লার্ক হলেও প্রেম কাকে বলে তার অভিজ্ঞতা মিনতির আছে।

ছাপানো-প্ল্যানের নম্বর কাটতে কাটতে লাল পেন্সিলে হারু ভাদুড়ি বললো, "পাবলিক চাইলে এখনকার থিয়েটারে সব হয়।

লাভ সিন কেন, ডেথ সিনেও হাসির ব্যবস্থা থাকছে পরের সপ্তাহে।”

মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর মুখটা স্মরণ করে চমকে ওঠে মিনতি। হারু ভাদুড়ি ফিসফিস করে খবর দিলো, “আমি পরশু দিন সায়েবকে ক্যাশ বোঝাতে গিয়ে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েছিলুম। সেই সময় শুনলুম, ম্যানেজার নরহরি এবং স্টেজ ম্যানেজার গণপতির সঙ্গে সায়েব আলোচনা করছেন।

সায়েবের গলার স্বর: তাহলে নরহরি, তুমি বলছো পরের সিনে পাবলিক হাসতে চাইছে—রিলিফ খুঁজছে।

গণপতি: চাইলেই তো হবে না! পরেরটাই তো ডেথ সিন। শ্মশানের দৃশ্য।

সায়েব: এত রেগে উঠছো কেন গণপতি? অডিয়েন্সের সাধ-আহ্লাদের খবর রাখবে না?

নরহরি: দর্শকদের ডোন্টকেয়ার করেই তো রথী-মহারথীরা, এমন কি ঘোষ, দত্ত, ভাদুড়ি মশাইরা বাংলা থিয়েটারের বারোটা বাজিয়েছিলেন।

গণপতি: পরের সিনটা শ্মশানের গেটের কাছে।

সায়েব: ঠাকুর বলেছেন, হাসি অক্সিজেনের মতো। আঁতুড়-ঘর থেকে আরম্ভ করে ভায়া বাসরঘর, শ্মশান পর্যন্ত সর্বত্র হাসি ছড়িয়ে আছে। শুধু তাকে ধরতে জানা চাই।

অবাক হয়ে যায় মিনতি। “সত্যি বুঝি ঠাকুর এই কথা বলেছেন?”

“তুমিও যেমন!” মৃদু বকুনি লাগালো হারু ভাদুড়ি। “কথামৃত আমার মুখস্থ। ঠাকুরের নামে এখন যার যা-খুশি চালিয়ে যাচ্ছে—যার যে রকম সুবিধে।”

মিনতি শুনলো পরের সপ্তাহ থেকে টিকিটের বিক্রি এবং দর্শকদের হাততালি বাড়তে পারে। শ্মশানের দৃশ্যে দেখা যাবে

বেশ কয়েকটা মড়া এসেছে—দাহর জন্যে লাইন পড়ে গিয়েছে, অনেক সময় লাগবে। তখন একটা বুড়ো মড়া নড়ে উঠবে। খাটিয়ার ওপর তড়াং করে উঠে বসে বলবে, "দূর ছাই, আমার টার্ন আসতে এখনও দেরি আছে, আমি ততক্ষণ হিন্দি সিনেমা 'দিলকে ডাকু' দেখে আসি।"

মৃত্যুর দূত যার স্বামীর বিছানার পাশে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে, মৃত্যু নিয়ে রস-রসিকতা তার ভাল লাগতে পারে না। মিনতি চুপ করে রইলো। বুকিং-এর চাপ আজ একটু বেশী—সামনের দু'দিন হাউস ফুল হতে আর বেশী দেরি নেই।

এই থিয়েটারে একদিন হারু ভাদুড়ির দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল। স্বয়ং শিশির ভাদুড়ির অনুরোধে পুরনো মনিব হরেন নিয়োগী তাঁকে চাকরিতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলেন। হারু ভাদুড়ির অভিনয়-প্রতিভা ছিল, কিন্তু গলাটা মেয়েদের মতন সরু বলে থিয়েটার লাইনে কিছুই হলো না। বীরেশ্বর রক্ষিত যখন এই থিয়েটারের দায়িত্ব নিলেন, তখন হারুর চাকরি গিয়েছিল। চোখের জল ফেলতে ফেলতে হারু তখন মধুমালতীর শরণাপন্ন হয়েছিল। পরের দিন হারুকে বীরেশ্বর ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন, নেহাত শিশির ভাদুড়ির কথা ভেবে হারুকে তিনি পুনর্নিয়োগ করছেন।

বুকিং অফিসের আজকের সুখবরটা দেবার জন্যে হারু ভাদুড়ি কোহিনুর থিয়েটারের পুরনো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ছুটলো। ওখানেই বীরেশ্বরের আপিস। তিন তলায় দরজার কাছে আসবার আগেই নরহরি বাধা দিলো, "এত তড়িঘড়ি কেন? যাচ্ছেন কোথায়?"

হারু ভাদুড়ি দেখলো সায়েবের ঘরের দরজা বন্ধ। দক্ষিণ দিকে একটা বড় জানলা আছে, সেটাও বন্ধ। ভিতরে যে আলো জ্বলছে তার ইঙ্গিত কাঠের দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে এসে পড়ছে।

বীরেশ্বর রক্ষিত আপিস ঘরে পা দেওয়া মাত্রই পিছন পিছন অর্জুন কালো রঙের ব্যাগটা নিয়ে ঢোকে। এই সময় নরহরিরও সায়েবের ঘরে প্রবেশ নিষেধ।

অর্জুন তাড়াতাড়ি দক্ষিণ দিকের জানলা দুটো বন্ধ করে দেয়। আপিসঘরের দরজাটাও এবার বন্ধ হয়ে যায়। বীরেশ্বর প্রথমে লাগোয়া স্নানঘরে ঢুকে মুখ হাত পা ধুয়ে নেন। তারপর জামা-কাপড় পাল্টাতে শুরু করেন।

যে-কাপড়ে শেয়ার মার্কেটে গিয়েছেন তাই পরে নাট্যমন্দিরে ঢুকতে চান না বীরেশ্বর। গেঞ্জি, আণ্ডারওয়্যার, পাঞ্জাবি, ফরাস-ডাঙার কালোপাড় কাঁচি ধুতি সব কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বদলে ফেলেন। তারপর অর্জুন ড্রয়ার খুলে কানের কাছে দামী আতর লাগিয়ে দেয়। আরাম-কেদারায় বসে বীরেশ্বর ভিজে পা দুটো নরম তোয়ালেতে অর্জুনকে দিয়ে মুছিয়ে নেন। ভিজে পা সম্বন্ধে বীরেশ্বরের খুঁতখুঁতনি সেই ছোটবেলা থেকে।

এরপর খালি পায়ে পরমহংসদেবের ছবির সামনে আধমিনিট চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকেন বীরেশ্বর রক্ষিত। এই অভ্যেসটা মোটেই ছিল না বীরেশ্বরের। মধুমালতী জোর করে দিব্যি করিয়ে নিয়েছে। সেটাই একটা গল্প। মধুমালতীর সঙ্গে বীরেশ্বরের অধ্যায়টা।

ঠাকুরের সামনে ধূপ জ্বালিয়ে বীরেশ্বর নতমস্তকে নগ্নপদে গিরিশের ছবির সামনে পনেরো সেকেণ্ড চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকেন —সেখানেও দুটো সুগন্ধি মাইসোর দরবারী ধূপ জ্বেলে দেন নিজের হাতে।

এবার অর্জুন নিচু হয়ে চীনেবাড়ির তৈরি কালো কুচকুচে পামশু পায়ের কাছে ধরে। বীরেশ্বর ছোট ছেলের মতন অর্জুনের দিকে পা এগিয়ে দেন। এরপর সায়েবের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই অর্জুন বুঝতে পারে মিনিটখানেকের জন্যে তাকে ঘর থেকে বেরিয়ে

যেতে হবে। দরজা বন্ধ করে দিয়ে অর্জুন বাইরে পাহারায় বসে থাকবে। কিছুক্ষণ পরেই বীরেশ্বর ঘণ্টা বাজাবেন, অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দেবে। সায়েব বলবেন, "নরহরিকে ডাকো।"

নরহরি এই সময় যেভাবে মালিকের কাছে ছোটে, তা দেখে হারু ভাদুড়ির অ্যালশেসিয়ান কুকুরের কথা মনে পড়ে যায়।

বীরেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, "বক্স আপিসের অবস্থা কেমন?"

নরহরি বললো, "গতমাসের তুলনায় একটু নীরেস—কিন্তু কলকাতার যত থিয়েটার আছে, তার মধ্যে এখনও আমরা ফার্স্ট যাচ্ছি।"

বীরেশ্বর সন্তুষ্ট হলেন না। "এত মধু ঢালছি—আমাদের জিনিস সবচেয়ে মিষ্টি হবে, তাতে আশ্চর্য কী? কিন্তু বিক্রি কমলো কেন? তোমরা ফ্রি পাস বাড়াচ্ছো না তো?"

"একটুও বাড়াই নি। আপনার নতুন পলিসিটা খুব কাজে লেগেছে, স্যর।"

"কোন্‌টার কথা বলছো?" মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন বীরেশ্বর।

"পাস নিলে পরমহংস স্মৃতি পাঠাগারের সাহায্যের জন্যে আড়াই টাকা ডোনেশন দিতে হবে।"

মিটমিট করে হাসলেন বীরেশ্বর রক্ষিত। যস্মিন দেশে যদাচার, কাছা খুলে নদী পার! যেমন পাসের জন্যে সবাই হন্যে হয়ে আছে, তেমন মন্তর দিয়েছেন তিনি। পরমহংস পাঠাগারে আদৌ কী বই কেনা হচ্ছে কিনা, তা নিয়ে কারও মাথা ঘামাবার কথা নয়। টাকাটা থিয়েটার ফাণ্ডেই চলে আসছে।

বীরেশ্বর বললেন, "তোমাকে যে স্টেটমেণ্ট তৈরি করতে বলেছিলাম।"

মাথা নীচু করে নরহরি দাঁড়িয়ে রইলো। সায়েব বলেছিলেন, কোন্ শোয়ে, কোন্ অভিনেতা বা অভিনেত্রী কতবার হাততালি

পাচ্ছে, তার একটা হিসেব খাড়া করতে। কাজটা খুবই গোপনে সারতে বলেছিলেন। যাতে আর্টিস্টদের কানে না যায়। থিয়েটার যে একটা দলগত প্রচেষ্টা বা যাকে বলে কিনা টীম ওয়ার্ক, তা কারুর মনে থাকবে না। হাততালি আদায়ের জন্যে সবাই নিজস্ব কাজ দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে—মাঝখান থেকে প্রোডাকশন মার খাবে।

বীরেশ্বরের নির্দেশ মতো একান্ত গোপনেই কাজটা সেরেছে নরহরি। কিন্তু স্টেটমেন্টের দিকে তাকিয়ে তার বুক ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। মধুমালতী গুপ্তা ক্ল্যাপিং পেয়েছে মাত্র দু'বার। সে দু'বারও যে জেনুইন নয়, তা নরহরি জানে। পাড়ার কয়েকটা ছোঁড়াকে ফ্রি পাস দিয়েছিল নরহরি এই শর্তে যে তারা মালতী গুপ্তার দ্বিতীয় দৃশ্যে জোর হাততালি দেবে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে নরহরি দেখেছে হাততালি জিনিসটা কলেরা বসন্ত খোস-পাঁচড়ার মতো ছোঁয়াচে—আধ মিনিট চালাতে পারলেই গোলা দর্শকরা তালি বাজাতে শুরু করে।

মধুমালতীর অ্যাকাউন্টে হাততালি যে খুব কম তা লক্ষ্য করলেন বীরেশ্বর। নরহরি সিঁটিয়ে উঠলো। সায়েবকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে হিসেবটা গোলমাল করে দেবে ভেবেছিল নরহরি—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস হয় নি। ধরা পড়লে তার চাকরি থাকবে না। গ্রীনরুমে, এবং স্টেজ ম্যানেজারের ঘরে আরেকজন যে মহিলা গম্ভীর মুখে বসে থাকেন তার কানে খবরটা গেলে সর্বনাশ।

নরহরির সঙ্গে ঝটপট আরও কিছু ব্যবসায়িক কাজ সেরে ফেললেন বীরেশ্বর রক্ষিত। খবরের কাগজের যে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে তার আর্ট-ওয়ার্ক দেখলেন তিনি। থিয়েটার লাইনে এখন বিজ্ঞাপনই সব। আগেকার দিনে ছিল হ্যাণ্ডবিল। ক্লাসিক থিয়েটারের অমর দত্ত এমন গরম গরম হ্যাণ্ডবিল ছাড়তেন যে তা পড়েই পাবলিকের বুকে সুড়সুড়ি লাগতো। ট্রামে চড়ে

তাড়াতাড়ি বুকিং অফিসে এসে আগাম টিকিট না কেনা পর্যন্ত তাঁরা স্বস্তি পেতেন না।

আর ছিল পোস্টার। বীরেশ্বর রক্ষিত এখনও বড় বড় পোস্টার ছাপান। মফস্বলের দূর দূরান্তে রেল বুকিং আপিসের সামনে, চায়ের দোকানে, মিষ্টির দোকানে এবং আদালতে হাজার হাজার উত্তেজক পোস্টার ছড়িয়ে দেন বীরেশ্বর। তবেই না মফস্বলের লোকরা কোহিনূর থিয়েটারের নতুন নাটক দেখবার জন্যে ছটফট করে।

বীরেশ্বরের নতুন অবদান এই খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন। বীরেশ্বর দেখলেন বিজ্ঞাপনের কপিতে মধুমালতীর নামটা সবার শেষে রয়েছে। মৃদু হাসলেন বীরেশ্বর। কচি পাঁঠা, বৃদ্ধ মেষ, দধির অগ্র, ঘোলের শেষ। রঙ্গমঞ্চের বিজ্ঞাপনে তারকা-তালিকার শেষ নামটাই সকলের নজরে আসে, ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায় না। মধুমালতীর নামটা শেষে রেখে ঠিকই করেছে নরহরি। কিন্তু···কিন্তু · এই বিজ্ঞাপনের আর্ট-ওয়ার্ক দেখলেই আজকাল বীরেশ্বরের মনে একটা কিন্তুর বুদবুদ সজীব হয়ে ওঠে। তাঁর মনে পড়ে যায় আর একটা মুখ। মুখটাকে একটু ভাবতে ইচ্ছে করছে বীরেশ্বরের।

সেই মিষ্টি মুখের মালিক এই মুহূর্তে কোহিনূর থিয়েটারের সামনে ভাড়াকরা প্রাইভেট গাড়ি থেকে নামছে। আর্টিস্টদের গাড়ি ও ট্যাক্সি রাখার জন্যে কমপাউণ্ডের কিছুটা জায়গা আলাদা করা আছে। বড় আর্টিস্টদের কে কোথায় গাড়ি রাখবেন তাও নরহরি ঠিক করে দিয়েছে। সাধারণত এঁদের গাড়িগুলো লাউঞ্জের খুব কাছে রাখা হয়, যাতে শোয়ের শেষে শিল্পীকে দর্শকদের খুব বেশী নজরে পড়তে না হয়। তারকারা টুক করে গাড়ির মধ্যে এসে বসতে পারেন এবং পাবলিকের ভিড় এড়িয়ে ড্রাইভার তাঁদের হুস করে বার করে নিয়ে যেতে পারে।

নিজের জায়গায় গাড়ি রাখতে গিয়ে লিপিকার অসুবিধে হলো। বুড়ো লোকটা আজও সেই জায়গায় নিজের দোকান সাজিয়ে বসেছে। লিপিকা আড়চোখে দেখলো লোকটা একটা পুরনো সরষের তেলের টিনের ওপর ঝুড়ি রেখে রাধাবল্লভী এবং আলুর দম বিক্রি করছে। লোকটা কি জানে না, এখানে বড় আর্টিস্টরা গাড়ি রাখে? লোকটা কি লিপিকার বিরক্ত মুখ দেখে বুঝতে পারে না, যে ওর জন্যে ড্রাইভারের গাড়ি রাখতে অসুবিধে হয় এবং কোহিনূর থিয়েটারের কমপাউণ্ডে যার খুশি জায়গা দখল করবার অধিকার নেই।

চোখের কালো চশমাটা ঠিক করে সুদেহিনী ও সুদর্শনা লিপিকা সেন বুকিং অফিসের সামনে এসে দাঁড়ালো। কাউন্টারের ফাঁক দিয়ে ঝকমকে লিপিকা দেখলো নরহরিবাবু সেখানে আছেন কিনা। হারু ভাদুড়ি মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, "পাসের কোনো ব্যাপার আছে নাকি?"

পাসের কোনো ব্যাপার নেই। লিপিকা সেনকে এখনও কোনোদিন বিনা পয়সায় গেস্ট নিয়ে আসতে দেখে নি হারু ভাদুড়ি। তবু ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞেস করতে হয়। সায়েবের হুকুম, প্লেয়ারদের মধ্যে মধুমালতী ও লিপিকা যত খুশি পাস নিতে পারেন।

ইতস্তত করছিল লিপিকা। এমন সময় সে শুনতে পেলো, "এখানে দাঁড়িয়ে কী পার্ট ভাবছো?"

পিছন ফিরে অবাক হয়ে লিপিকা বললো, "আরে, মালতীদি, আপনি?"

মধুমালতী ও লিপিকার এই সাক্ষাৎ নিতান্তই অপ্রত্যাশিত। কারণ আজ শোয়ের দিন নয়। শোয়ের দিন না হলেও কোহিনূর থিয়েটারের কমপাউণ্ড ফাঁকা থাকে না। কোনো না কোনো আপিসের বা ক্লাবের শখের থিয়েটার থাকে। হল বুকিং-এর দায়িত্ব নরহরির।

আজ নিশ্চয় কোনো বড় আপিসের থিয়েটার রয়েছে, কারণ গেটের কাছে বেশ ভিড়। গাড়ির সংখ্যাও অনেক। আপিসের বাবুদের নাটকে উৎসাহ দিতে নামকরা আপিসের সায়েবরা সস্ত্রীক এই একদিন কষ্ট করে উত্তর কলকাতার থিয়েটারপাড়ায় চলে আসেন।

উদ্ভিন্নযৌবনা লিপিকা চোখের কালো চশমা খুলে বললো সে নরহরিকে খুঁজছে। "কী হলো তোমার?" জিজ্ঞেস করলো মধুমালতী।

ওর কথা শুনে কৌতূহলের বশে মধুমালতী এবার এগিয়ে গেলো পার্কিং-এর জায়গায়। লিপিকা বললো, "দেখুন না, ওই বুড়োটা।"

চমকে উঠলো রূপসী ও বিদুষী অভিনেত্রী মধুমালতী গুপ্তা। লোকটা তখন রাধাবল্লভী ও আলুর দম নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে বলছে, "আসুন, আসুন। আমার ঘরে তৈরি রাধাবল্লভী।"

হাঁ করে কী দেখছে মধুমালতী, তা লিপিকা বুঝতে পারে না। শুকনো মুখে মধুমালতী এবার বললো, "তুমি কাকে সরে যেতে বলছো? উনি হরেন নিয়োগী! অনেক টাকা নিয়ে এই থিয়েটার লাইনে এসেছিলেন। এখানকার মালিক ছিলেন। এখন যথাসর্বস্ব খুইয়ে ফেরিওয়ালা হয়েছেন।"

গলা শুকিয়ে গিয়েছে মধুমালতীর। লিপিকাকে সঙ্গে নিয়ে সে বুকিং আপিসের পাশে একটা ঘরে গিয়ে বসলো। দারোয়ান ভীমপ্রসাদকে বললো, "হরেনবাবু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ওঁর মুখ দেখে মনে হলো, আজ বিক্রি আটকে আছে। ওঁর যতগুলো রাধাবল্লভী পড়ে আছে সব কিনে নিয়ে এসো।"

ভীমপ্রসাদ বেরিয়ে গেলো। মধুমালতী বললো, "পুরনো দিনে যাঁরা ওকে দেখেছে কেউ কি কল্পনা করতে পারতো যে ছোটবাবুর

ওই দশা হবে! ওঁর স্ত্রী এখন রোজ রাধাবল্লভী ভেজে দেন—দু'শো রাধাবল্লভীতে ছ'টাকা লাভ থাকে শুনেছি।"

পঁচিশখানা রাধাবল্লভী হাতে ভীমপ্রসাদ ঘরের মধ্যে ঢুকলো। তার থেকে দু'খানা তুলে নিলো মধুমালতী, দু'খানা এগিয়ে দিলো লিপিকার দিকে।

"বাকিগুলো তোমরা খেয়ে নাও," ভীমপ্রসাদকে বললো মধুমালতী।

"বাবু জিজ্ঞেস করছিলেন, এতগুলো রাধাবল্লভী কে চাইলো? আমি কিছু বলি নি।"

"ভাল করেছো, ভীমপ্রসাদ," এই বলে শুকনো মুখে রাধাবল্লভী খেতে শুরু করলো মধুমালতী। ছোটবাবুর স্ত্রী যে নিজের হাতে এই রাধাবল্লভী তৈরি করেছেন সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। এই রান্নার সঙ্গে মধুমালতীর যে পরিচয় আছে, আগে কতবার টিফিন কেরিয়ারে খাবার এনে সাজঘরে ভূরিভোজন করিয়েছেন নিয়োগী মশায়। বিশেষ করে অভিনয়ের প্রথম রজনীতে স্পেশাল খাওয়া-দাওয়া বাঁধা।

মধুমালতী আন্দাজ করছিল, সায়েবের সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই লিপিকা এসেছে। "ওপরে তোমার যদি কিছু দরকার থাকে, আগে সেরে এসো," লিপিকাকে সুযোগ দিতে চাইলো মধুমালতী।

মধুমালতী বাঙালী মেয়েদের তুলনায় বেশ লম্বা। তপ্ত সোনার মতো গায়ের রঙ যৌবন-অপরাহ্নেও মলিন হয় নি। ওর শান্ত অথচ বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে লিপিকা বললো, "আপনি থাকতে আমার আগে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আমার কত আগে থেকে আপনারা এই থিয়েটারে রয়েছেন।"

লিপিকা কি বুক থেকে কথা বলছে? না ঠোঁট থেকে? বহু অভিজ্ঞতার নায়িকা হয়েও মধুমালতী এখন বুঝতে পারছে না।

অভিনেত্রীর কোন্‌টা যে অভিনয় এবং কোন্‌টা প্রাণের কথা তা এক এক সময় বুঝতে কষ্ট হয় মধুমালতীর। লিপিকা যদি অভিনয় না করে থাকে তা হলে মেয়েটাকে এই বিচিত্র জগতের নির্মম সত্যটা জানিয়ে দেওয়া উচিত—থিয়েটারের এই হৃদয়হীন জগতে সিনিয়রিটির কোনো মূল্য নেই। বরং যারা আগে আসে, সময়ের স্রোতে ক্রমশ তারা সবার পিছনে চলে যায়—তাদের কোনো সম্মান থাকে না।

লিপিকার সুগঠিত তনুদেহের দিকে তাকালো মধুমালতী। ওর উদ্ধত যৌবন এখন পোশাকের শাসন মানছে না। মেয়েদের নিজস্ব সম্পদ দুটো রীতিমতো বিদ্রোহ করে বসে আছে! মধুমালতীর লোভ হচ্ছে, একবার লিপিকাকে মনে করিয়ে দেয়, নব বসন্তের ঐশ্বর্য একদিন অন্যদেরও ছিল। সেইসব গরবিনীরা একদিন সমান তেজে এই কোহিনূর থিয়েটারে নিজেদের অধিকার উপভোগ করেছে। তারপর সময়ের স্রোতে কোথায় সব হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু লিপিকা বেচারা নতুন, যৌবনের রাজ্যে তার নতুন অভিষেক হয়েছে। লিপিকা তাকে ভুল বুঝতে পারে।

মধুমালতীকে দেখে লিপিকা যে একটু অস্বস্তিতে পড়েছে এবং কোনো একটা ছুতো তুলে বীরেশ্বরের সঙ্গে দেখা না করেই সে যে পালাতে চায়, তা মধুমালতী বুঝতে পারছে। বীরেশ্বর রক্ষিত যখন এই থিয়েটারের মালিক, তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করবার অধিকার প্রত্যেকের আছে। কিন্তু লিপিকার এই লজ্জা-লজ্জা ভাবটা মধুমালতীর ভাল লাগছে না। লিপিকার ভাবভঙ্গীতে মনে হচ্ছে, সে যেন বে-বারে এই থিয়েটারে এসে হঠাৎ ধরা পড়ে গিয়েছে এমন একজনের কাছে, যাকে সে এড়িয়ে চলতে চাইছিল।

হঠাৎ অন্যরকম মনে হচ্ছে মধুমালতীর। তাহলে কি, স্বয়ং বীরেশ্বর রক্ষিত নিজেই লিপিকাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

"তোমার তো আগে থাকতেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকতে পারে।

শুধু শুধু ছেলেমানুষী করছো কেন?" মৃদু স্নেহমিশ্রিত বকুনি লাগালো মধুমালতী।

লিপিকা তবু স্বীকার করছে না। এবার মধুমালতীর মনে হলো, এমনও হতে পারে, লিপিকার সঙ্গে মালিকের অনেকক্ষণ সময় লাগবে। সেক্ষেত্রে লিপিকাকে এগিয়ে দেওয়াটা তার মোটেই উচিত হচ্ছে না।

কোহিনূর থিয়েটারের একতলায় দুই অভিনেত্রীর মধ্যে যখন আলাপ-আলোচনা চলেছে তখন ওপরের ঘরে বীরেশ্বর রক্ষিত তাঁর সহকারী অধর চাটুজ্যের সঙ্গে নিভৃত পরামর্শের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

আলোচনার বিষয় খুবই গোপনীয়, তাই এই বে-বারে অধরকে ডেকে পাঠিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতি, শনি অথবা রবিবারে এখানে বেজায় ভিড়। অধরের সঙ্গে অনেকক্ষণ রুদ্ধদ্বার আলোচনা হচ্ছে এই খবর রটলেই সাজঘরে আলোড়ন পড়ে যাবে; সঙ্গে সঙ্গে গুজব ছড়াবে বীরেশ্বর নিশ্চয় নতুন কোনো নাটকের কথা চিন্তা করছেন।

পয়সা কড়ি ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে নরহরির সঙ্গে প্রয়োজনীয় আলোচনাগুলো বীরেশ্বর সেরে ফেলেছেন। নরহরির একটা গুণ, মনিবের চোখের দিকে তাকায় না, বীরেশ্বরের হুকুম এক কথায় মেনে নেয়, কখনও কোনো প্রশ্ন করতে সাহস পায় না। ফিক করে হাসলেন বীরেশ্বর রক্ষিত। যে পূজোর যে মন্তর। এই নরহরিটাই হরেন নিয়োগীর আমলে বড় বড় কথা বলতো; নরম মাটি পেয়ে মনিবের মাথায় চেপে বসেছিল।

নরহরি জিজ্ঞেস করছিল 'কালের কালিমা' নাটকের পাবলিসিটি আরও বাড়াবে কিনা। বীরেশ্বর সোজাসুজি উত্তর দেন নি। শুধু বলেছেন, ভেবে দেখি। বেশী কথা বললেই, মনিবের মনের কথাটা নরহরি আন্দাজ করে নিতো।

নরহরি বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারা অর্জুন ঘরের মধ্যে ঢুকলো। বীরেশ্বর খোঁজ করলেন, "অধর এসেছে?"

অধর চাটুজ্যে একবার এসে ফিরে গিয়েছে শুনে মনে মনে চটে উঠলেন বীরেশ্বর। "অধরটার সাহস বেড়ে যাচ্ছে। আপিসে আসতে বীরেশ্বর আধঘণ্টা দেরি করেছেন, আর সেই ছুতোয় অধর কেটে পড়েছে। অধরকে একটু টাইট দিতে হবে, মনে করিয়ে দিতে হবে, তাকে এখান থেকে বিদায় করতে বীরেশ্বরের এক মিনিটও লাগবে না। অধর যদি ভেবে থাকে, যে কনট্রাক্ট অনুযায়ী তাকে তিন মাসের নোটিশ দিতে হবে তাহলে খুব ভুল করেছে।

বীরেশ্বর নিজের কোমরের ঘুনসিতে হাত দিয়ে চাবির রিংটা স্পর্শ করলেন। কোমর থেকে চাবি বার করে অর্জুনের হাতে দিয়ে বলতে হবে দু'নম্বর আলমারিটা খোলো। ওই আলমারিতে অধরের ফাইলটা রয়েছে। সেখানেই অধরের মৃত্যুবাণ অপেক্ষা করছে। প্রত্যেক কর্মচারীকে চাকরিতে ঢোকাবার সময় বীরেশ্বর একখানা রেজিগনেশন লেটারে সই করিয়ে রেখেছেন।

শ্রমিকসমস্যা সমাধানের এই আশ্চর্য পদ্ধতিটি বীরেশ্বরের নিজস্ব আবিষ্কার। চেম্বার অফ কমার্সের মোটা মাইনের এক্সপার্টদের মাথায় এসব প্র্যাকটিক্যাল বুদ্ধি আসবে না। চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় চম্বলের দস্যুসর্দারও মিইয়ে নরম হয়ে থাকে। তখন টেবিলের সামনে বসিয়ে হাতে যা কাগজ দেবে, তাতেই সুড়সুড় করে বাছাধন সই করবে। ওই সময় পদত্যাগ পত্রটা সই করানো থাকলে কাজ পাকা হয়ে রইলো।

যখন-খুশি তারিখ-টারিখগুলো বোঝাই করে, দুজন সাক্ষীর নাম বসিয়ে নিলেই কাজ হয়ে গেলো।

নরহরিকে আবার ডাকালেন বীরেশ্বর। বললেন, "অধরের কাছে খবর পাঠাও। আগামীকাল সন্ধ্যে সাড়ে-ছটার সময় আমার সঙ্গে দেখা করে যেন।"

ঘর খালি হতেই বেয়ারা অর্জুন এবার ফ্লাস্ক খুলে গেলাস হাতে সায়েবের সামনে এসে দাঁড়ালো।

বীরেশ্বর রক্ষিত এই সময় একটু বেলের শরবত খান। আপিসের হাজার লোকের সামনে খাওয়া-দাওয়া বীরেশ্বর পছন্দ করেন না, তাই অর্জুন ঘরের জানলা বন্ধ করে শরবতের গেলাস এগিয়ে দিলো। দুষ্ট লোকরা গুজব ছড়ায়, চামচা-পরিবেষ্টিত বীরেশ্বর এই সময় কোহিনূর থিয়েটারে আপিসঘরে বসে বোতলের পর বোতল মদ ওড়ান। থিয়েটার পাড়ার এই নাকি নিয়ম। মুখের মেক-আপ এবং বেঁটে-বাঁটকুল মদের বোতল ছাড়া নাট্যজগৎ নাকি অকল্পনীয়। কিন্তু কথাটা মোটেই সত্য নয়। কোহিনূর থিয়েটারের বাড়িতে বীরেশ্বর কখনও মদ স্পর্শ করেন নি।

শরবতের গেলাসে চুমুক দিয়ে বীরেশ্বর ভাবতে লাগলেন তাঁর পুরনো দিনের কথা। মদ! চা খাবার সংস্থান ছিল না যে-লোকটার সে খাবে মদ! এক মুহূর্ত থামলেন বীরেশ্বর। আজকাল সব কিছু নাটকের স্টাইলে ভাবতে ইচ্ছে করে বীরেশ্বর রক্ষিতের। আগে তাঁর এমন অভ্যাস ছিল না। অধর চাটুজ্যের পাল্লায় পড়ে এই রোগটা ধরেছে।

বীরেশ্বর রক্ষিতের মনে পড়লো, মদ তিনি নিয়মিত খান না, একথা সত্য। কিন্তু তা বলে কখনও যে মদ খান নি এমন নয়।

বীরেশ্বর রক্ষিত এই মুহূর্তে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখছেন। কোহিনূর থিয়েটারে গভীর রাতে গোপন শো আরম্ভ হয়েছে।

সেই শো'তে একখানা মাত্র টিকিট বিক্রি করা হয়েছে। সামনের সারিতে সেই টিকিটখানা পকেটে নিয়ে বসে আছেন বীরেশ্বর রক্ষিত। সামনের যবনিকা একটু পরেই উঠবে। প্রতীক্ষা সহ্য হচ্ছে না বীরেশ্বরের। এবার প্রেক্ষালয়ের আলোকমালা নিভলো এবং রঙ্গমঞ্চের আলো আঁধারির মধ্যে যে-লোকটা আবির্ভূত হলো তাঁকে যেন খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।

বীরেশ্বর রক্ষিত ফ্রন্ট সীটে বসে নিজের মাথা চুলকোলেন। কোথায় যেন এঁকে দেখেছেন তিনি! অবশ্যই দেখেছেন। বীরেশ্বর এবার থিয়েটারের ছাপানো প্রোগ্রাম পড়তে আরম্ভ করলেন। প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য: বৌবাজারের সারপেনটাইন লেনে একটা চায়ের দোকান। সময়: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষার্ধ। কয়েকজন মাইনর পার্শ্বচরিত্র বেঞ্চিতে বসে বসে রাজাউজির মারছে। বলছে, "যুদ্ধের দাপটে দেশটা উচ্ছন্নে গেলো। আদর্শ বলে, চরিত্র বলে, সত্য বলে, এই পোড়া দেশে আর কিছুই রইলো না।"

ওপাশে একটা বেঞ্চিতে রেসের ঘোড়া নিয়ে গুরুতর গবেষণা চলছে। লাকি স্টার এবং হ্যাপিবয়ের বংশ পরিচয় কী? আগামী শনিবার টার্ফ ক্লাবের মাঠে রোমিও জুলিয়েট এবং ডেসডিমনার মধ্যে কোন্ অশ্বিনীর সাফল্যসম্ভাবনা বেশী সে নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের জটিল আলোচনা জমে উঠেছে।

তারও পাশে আর একটা বেঞ্চিতে গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি পরে গলায় চাদর জড়িয়ে মুখ বেজার করে বসে আছেন এন সি মল্লিক—পুরো নাম নদিয়াচাঁদ মল্লিক। নেদো মল্লিক চায়ের দোকানের নিয়মিত খদ্দের নন। তাঁর নিত্য যাতায়াত শুঁড়ীর দোকানে। কিন্তু এখনও মদের দোকান খুলবার সময় হয় নি। ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন সগুম্ফ নেদো মল্লিক এবং গভরমেণ্টের আদ্যশ্রাদ্ধ করছেন। বলছেন, "ভাল একটা উকিল পেলে গভরমেণ্টের নামে হাইকোর্টে এক নম্বর ঠুকে দিতাম। চা-ও

নেশা, মদও নেশা। চায়ের দোকান ভোর চারটে থেকে খোলে, আর শালা এই মদের দোকান সাড়ে দশটার আগে খুলতে লাইসেন্স দেওয়া হয় না।"

এমন সময় যুবক বীরেশ্বর রক্ষিতের প্রবেশ। তখনকার বীরেশ্বরের ওজন এখনকার বীরেশ্বরের অর্ধেক। গায়ের রঙ ফর্সা হলেও, এখনকার মতো ঝকমক করছে না। এখন বীরেশ্বরের দেহে প্রত্যেকদিন আধ টিন খাঁটি ইটালিয়ান অলিভ অয়েল মালিশ করা হয়—তখন বীরেশ্বরের মাথায় সপ্তাহে একবার সরষের তেল জুটতো না।

বীরেশ্বর এসে নেদো মল্লিকের সামনে বসলো। এবং হাঁক দিয়ে একটা ডবল-হাফ চায়ের হুকুম করলো। বয়কে বললো, "একটু চিনি বেশী দিস, বাবা।"

বীরেশ্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে বয় কোনো উত্তর না-দিয়েই চলে গেলো।

নেদো মল্লিক তৎক্ষণ নুন ও মরিচ সহযোগে একটা ডবল ডিমের ওমলেট খেতে শুরু করেছেন। বীরেশ্বরের দিকে তাকিয়ে নেদো বললেন, "দাম যখন এক, তখন বেশ করবেন, চায়ে যত খুশী চিনি খাবেন।"

শুকনো মুখে বীরেশ্বর তাকালো নেদো মল্লিকের দিকে। চা এখনও আসে নি।

নেদো মল্লিক এবারে জিজ্ঞেস করলেন, "ইণ্ডিয়ানদের কোনো উন্নতি হচ্ছে না কেন বলুন তো?"

বীরেশ্বর রক্ষিতের মেজাজ ভাল নয়—কিছুদিন আগে বিয়ে করে সে এই সারপেনটাইন লেনে উঠে এসেছে। নানা সমস্যায় সে জর্জরিত। নেদোর প্রশ্নের কী উত্তর সে দেবে?

নেদো মল্লিক বললেন, "সায়েবদের এত উন্নতি কেন?—স্কচ হুইস্কি খায় বলে। জার্মানির এত দেমাক কেন?—বীয়ারের

জোরে। খাঁদানেকো জাপানীরা এমন তুলোরাম-খেলারাম দেখাচ্ছে কী করে ?—'সাকে' নামক ফাস্ট ক্লাস ড্রিংকসের ব্যাকিংএ। এই যুদ্ধে জার্মানরা শেষ পর্যন্ত হারবে। কেন জানেন ? অল সেড এণ্ড ডান, বীয়ারের তুলনায় স্কচ হুইস্কি এবং রাশিয়ান ভদকার তেজ অনেক বেশী। আমেরিকানরা এই যুদ্ধে ম্যাজিক দেখিয়ে ছাড়বে। কেন জানেন ? ব্যাটাদের সঙ্গে মিশে দেখেছি, কোনো রকম মালে ওদের অরুচি নেই—বীয়ার, হুইস্কি, ভদকা, জিন, সাকে, যা পায় তাই মায়ের নাম জপে চোঁক করে টেনে নেয়।"

বয় এসে নেদো মল্লিককে জিজ্ঞেস করলো, "চা দেবো ?" কিন্তু বীরেশ্বরের চায়ের দেখা নেই।

ডিমের ওমলেট শেষ করে নেদো মল্লিক জানিয়ে দিলেন তিনি চা খাবেন না, একটু পরেই মদের দোকান খুলবে। বীরেশ্বরের দিকে তাকিয়ে এবার নেদো মল্লিক বললেন, "আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি, একটা দেশের নাম করুন, যেখানকার লোক কেবল চা কিংবা শরবত খেয়ে ওয়ার্লডে কেষ্টবিষ্টু হয়েছে।"

বীরেশ্বর এই সময় বয়কে জিজ্ঞেস করলো, "হ্যাঁরে, আমার চা কী হলো ?"

বয় এবারেও কোনো উচ্চ-বাচ্য করলো না। নেদো মল্লিক এবার নতুন বন্ধুর হয়ে বলতে গেলেন, "তোরা কি কালা হয়ে গেলি ? বাবুর কথা শুনতে পাচ্ছিস না ?"

বয়টা এবার গম্ভীরমুখে বীরেশ্বরকে বললো, "কর্তা আপনাকে ডাকছেন।"

বীরেশ্বর এই ভয় করছিল। কাউন্টারে যেতেই মালিক বললো, বীরেশ্বরের অনেক দেনা হয়ে গিয়েছে। সে-সব শোধ না হলে, আর এক কাপ চাও খাওয়া চলবে না।

শুকনো মুখে বীরেশ্বরকে টেবিলে ফিরে আসতে দেখে নেদো মল্লিক জানতে চাইলেন, "কী হলো ?"

লজ্জায় অধোবদন বীরেশ্বর কোনো উত্তর দিতে পারলো না। শুধু সামনের দেওয়ালে কাঁচের ফ্রেমে টাঙানো নোটিশের দিকে সে তাকিয়ে রইলো, যেখানে লেখা আছে : "আজ নগদ, কাল ধার।"

নেদো মল্লিকও এবার তাকালেন সেই নোটিশের দিকে। এবং ফিসফিস করে বললেন, "একেবারে ডাহা মিথ্যে কথা লিখেছে। হোল দুনিয়াটা চলছে : আজ ধার কাল নগদ—এই পলিসির ওপর।"

রাগে, অপমানে প্রায়-উন্মাদ বীরেশ্বর রক্ষিত সেদিন দোকান থেকে বেরিয়ে এসেছিল এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সে এই অপমানের প্রতিশোধ নেবে।

কোহিনূর থিয়েটারের মালিক মিলিয়নেয়ার বীরেশ্বর রক্ষিত কয়েক মুহূর্তের জন্য বর্তমানে ফিরে এলেন। ভাবলেন, 'গল্প হলেও সত্যি এই প্রথম দৃশ্যটায় নাটকীয়তা কম নেই। শুধু সেদিনের বীরেশ্বর রক্ষিতের চেহারাটা বড্ড বোকা-বোকা ছিল। কোথায় যেন লোকটার প্রাণশক্তির অভাব রয়েছে। যেন ভিটামিনের অভাব—মায়ের পেটে যখন ছিল, তখন এক ফোঁটা প্রোটিন, ক্যালসিয়াম বা ভিটামিন জোটে নি।'

অন্যদিন এই সময় বীরেশ্বরের নির্দেশে অর্জুন আপিসঘরের দরজা খুলে দেয়। কিন্তু আজ অর্জুনকে হুকুম করতে ভুলে গেলেন বীরেশ্বর। অর্জুন ভাবলো, সায়েব নিশ্চয় কোনো গোপন কাজ করছেন।

বীরেশ্বর রক্ষিত আবার চোখ বুজলেন। দ্বিতীয় দৃশ্য শুরু হচ্ছে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে এক মদের দোকান। বিমর্ষবদনে দোকানের এক কোণে বসতে বসতে বীরেশ্বর রক্ষিত নেদো মল্লিককে বলছে : "আমি এলুম বটে, কিন্তু আমার সঙ্গে কোনো টাকাপয়সা নেই।"

নেদো মল্লিক এবার বীরেশ্বরের হাত ধরে চেয়ারে বসাতে বসাতে বলছেন : "টাকা পয়সা সঙ্গে করে কেউ এই পৃথিবীতে জন্মায় না।"

বেয়ারাকে টেবিলের কাছে আসবার নির্দেশ দিয়ে নেদো মল্লিক এবার বন্ধুকে প্রশ্ন করছেন : "মানুষ ল্যাংটা অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় কেন বলো তো? ভগবানের হাতে তো সমস্ত রিসোর্সেস রয়েছে। ইচ্ছে করলে সাজানো-গোছানো ডল পুতুলের মতো করেই তো তিনি মানুষকে পৃথিবীতে পাঠাতে পারতেন।"

বীরেশ্বর তখনও চুপচাপ রয়েছে। নেদো মল্লিক বললেন, "তুমি ভাই, গোমড়ামুখ ছাড়ো। অমাবস্যার আকাশে একটু চাঁদ উঠুক— আমি তো কথা দিয়েছি। এখানকার খরচাপাতি সব আমার। আমার গেস্ট হয়েই তো এখানে এসেছো। এখন, যে-কোশ্চেনটা করেছি তার উত্তর দাও।"

বীরেশ্বর জোর করে হেসে, মাথা চুলকে বললো, "ভগবান বড় উদাসীন। অসহায় অবস্থায় পৃথিবীতে এলে সাধারণ জীবের কি কষ্ট হয়, তা তিনি জানেন না।"

নেদো মল্লিক বললেন, "আমি যখন প্রচুর মাল টেনে বেহুঁশ হয়ে যাই, তখন ভদ্রলোক মাঝে মাঝে এইখানে আসেন। ঠিক তুমি যেখানে বসে আছো, ওইখানে বসেই আমার সঙ্গে গল্পগুজব করেন। তোমার অভিযোগটা ভগবানবাবুর কানে পৌঁছে দেবো'খন। কিন্তু উনি বলছিলেন, ল্যাংটা করে পাঠালে, হিসেবের সুবিধে হয়। একেবারে 'জিরো' থেকে হালখাতা খুলে নিজের কেরামতিতে কে কতখানি এগিয়েছে তার হিসেবটা সহজেই পাওয়া যায়।"

"সামান্য একটু যোগ-বিয়োগের সুবিধের জন্যে ভগবান পৃথিবীর মানুষদের এতো কষ্ট দিলেন?" বিরক্ত বীরেশ্বর এবার শুনিয়ে দিয়েছিল ভগবানের বন্ধু নেদো মল্লিককে।

নেদো মল্লিক বললেন, "কর্তা যে হিসেবে খুব কাঁচা!"

"তবে আর কি!" বীরেশ্বর কিছুতেই ভগবানের ওপর সন্তুষ্ট হতে পারছে না।

"রাগ কোরো না। ওইটেই তো মস্ত সুযোগ মানুষের। খোদকর্তা যখন হিসেব-টিসেব তেমন বোঝেন না, তখন প্রাণ-যা-চায় তাই করে নাও। তারপর গোঁজামিল দিয়ে হিসেব মেলাও, মালিক কোনো কোশ্চেন করবেন না।"

চা খেতে না পেয়ে অপমানিত বীরেশ্বর সেদিন মদ খেয়েছিল। সেই সঙ্গে এক প্লেট চীনে বাদাম-ভাজা সাবড়ে দিয়েছিল বীরেশ্বর রক্ষিত। নেদো মল্লিকের কাছে সে স্বীকার করেছিল, অনেকদিন কোনো কাজকর্ম নেই। সারপেণ্টাইন লেনের বাড়িভাড়া ছ'মাস বাকী। সংসারের আরও সব খবর দিয়েছিল বীরেশ্বর।

মদের গেলাসে চুমুক দিয়ে নেদো মল্লিক বলেছিলেন, "বাঃ, তুমি তো ব্রাদার, বেশ চালু মাল। চাল নেই, চুলো নেই, চাকরি নেই—তবু একটা রাঙা টুকটুকে মেয়েকে বে করে বসে আছো!"

লজ্জায় মাথা নিচু করে বসে আছে বীরেশ্বর রক্ষিত। নেদো মল্লিক বললেন, "কে বলে তোমার সাহস নেই? আমি বিভিন্ন সোর্স থেকে মাসে হাজার হাজার টাকা কামাই করছি—তবু আমি শালা বে তো দূরের কথা, বাড়িতে একটা ঝি রাখতে সাহস করলাম না। আর তুমি ধর্মের ষাঁড় উইদাউট এনি ক্যাশ, অগ্নিসাক্ষী রেখে একটা মেয়ের ভাত-কাপড়ের দায়িত্ব নিলে?"

বীরেশ্বর বাধ্য হয়ে বললো, "দেখুন, ঠিক ওই ধরনের সম্বন্ধ করে বিয়ে নয়। মলঙ্গা লেনে যে-বাড়িতে ভাড়া ছিলুম, তারই দোতলায় থাকতো শ্যামা। দুজনে জানাশোনা করে একটু মুশকিল হলো। মেয়েটা বললো, তোমাকে আমি ভালবাসি।"

"আর তুমি, যুবতী নারীর ডাকে সাড়া না দিয়ে পারলে না! মেয়েটাকে বাপের ঘর থেকে ভাগিয়ে, তিন আইনে বে করে, সোজা

এনে তুললে বৌবাজারের ১৮-এম সারপেনটাইন লেনে। বাহবা!
তা শিবঠাকুর (যিনি বীরেশ্বর তিনিই শিব), তোমার যদি এতই বুদ্ধি, এতই বীরত্ব তাহলে রোজগারে নামতে পারছো না কেন? এই যুদ্ধের বাজারেও যে-লোক রোজগার করতে পারে না, সে তো পুরুষমানুষই নয়।" এরপর নপুংসকদের নিয়ে একটা নোংরা খিস্তি শুনিয়ে সহায়সম্বলহীন বেকার বীরেশ্বরকে আরও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিলেন নেদো মল্লিক।

বেচারা বীরেশ্বর অকপটে নিজের অসহায়তা প্রকাশ করেছিল। তার কথাবার্তা শুনে নেদো মল্লিক বলেছিলেন, "তাহলে বোঝা যাচ্ছে, তোমার বুকে এখন দুটো আগুন জ্বলছে। এক তুমি বিয়ে-করা বউকে খাইয়ে-পরিয়ে সুখে রাখতে চাও, আর দু'নম্বর, সারপেনটাইন লেনে ওই চায়ের দোকানের মালিকের ওপর এক হাত নিতে চাও।"

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে অপমানিত বীরেশ্বর বললো, "দেখুন না। আমাকে যদি ধার না দিবি, তাহলে আধঘণ্টা বসিয়ে রেখে অপমান করার কী দরকার ছিল? সকালবেলায় মুখের নেশা—লোকে কুকুর বেড়ালকেও বঞ্চিত করে না। আজকের মতো এক কাপ চা দিয়ে বলতে পারতিস আর এসো না।"

নেদো মল্লিক ফোড়ন দিলেন, "তাহলে যে নাটক জমে উঠতো না। নদিয়াচাঁদ মল্লিকের সঙ্গে এই প্রথম দৃশ্য থেকে তুমি দ্বিতীয় দৃশ্যে আসতে পারতে না।" এই বলে হা-হা করে হাসতে লাগলেন নেদো মল্লিক।

স্টেজটা হঠাৎ ঘন অন্ধকার হয়ে আসছে। পটপট আলো নিভে যাচ্ছে। মায়াবী জাদুকরের মতো অদৃশ্য নেদো মল্লিক জিজ্ঞেস করছেন, "তোমার মনস্কামনা কি পূর্ণ করতে চাও?"

বীরেশ্বর বলছেন, "অবশ্যই!"

"বীরেশ্বর, তোমার পণ কী?"

সম্মোহিত বীরেশ্বর এখনও চুপচাপ। ডান হাতের আঙুল দিয়ে নেদো মল্লিক খোঁচা মারলেন, "বলো, পণ আমার জীবন সর্বস্ব।"

নাটকীয় কায়দায় নেদো মল্লিক নিজেই মন্তব্য করলেন, "জীবন তুচ্ছ, সকলেই দিতে পারে। আর কী পারো?"

বীরেশ্বর এখন হতবাক। নেদো মল্লিক বললেন, "তোমার মন, প্রাণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, পরিশ্রম আমি সব চাই।"

অস্পষ্ট অন্ধকারে বীরেশ্বরের আরও কাছে সরে এলেন নেদো মল্লিক। চাপা গলায় বললেন, "চায়ের দোকান তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে! কাল থেকে তুমি ওখানে বসবে। যত খুশী চা টোস্ট বিড়ি সিগ্রেট খাবে। ইচ্ছে করলে, বিকেলে গিয়ে পাঁউরুটি ও পাঁঠার ঘুগনি খাবে। প্রয়োজন হলে রাত্রে পরোটা আর মুরগীর মাংস অর্ডার করবে। তার বদলে তুমি ওখানকার লোকগুলোর ওপর নজর রাখবে। চোখকান খুলে রেখে ওদের কথাবার্তা শুনবে। পুলিসের খবর, ওখানে স্বদেশীরা ভিড় করে। ফেরার বিপ্লবী গণেশ মিত্তির ওই দোকানে আসে। সুভাষ বোসের সঙ্গে লোকটার নাকি যোগাযোগ আছে। এই নাও টাকা। এক ঢিলে দু'পাখি মারা হলো। বিয়ে-করা বউকে ডালভাত খাওয়াও, দু'এক মাসের বাড়ি ভাড়া শোধ করো, চায়ের দোকানের ওপর প্রতিশোধ নাও। আর মাঝে-মাঝে আমার সঙ্গে এই ওয়েলিংটনের বারে এসে দেখা করে যাও।"

বীরেশ্বর আনন্দে অভিভূত। "আপনাকে কী করে ধন্যবাদ দেবো জানি না।"

"ধন্যবাদ আমাকে কেন? ধন্যবাদ দাও হিটলারকে, তোজোকে, মুসোলিনীকে—যাঁরা প্যাঁচ কষে বৃটিশসিংহকে এই যুদ্ধে নামিয়েছে। ওঁদেরই দয়ায় আমরা অর্ডিনারি লোকরা টু-পাইসের মুখ দেখছি। প্যাঁচে পড়বার আগে ইংরেজ বেজায় কঞ্জুস ছিল। এখন হাত খুলেছে।"

এরপর হা-হা করে হেসেছিলেন নেদো মল্লিক। "একেবারে ফার্স্ট ক্লাস নাটকের মতো মনে হচ্ছে। শুরু থেকেই নাটকীয়তা —স্পীড—অ্যাকশন—সাসপেন্স সব পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে।"

ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চে নেদো মল্লিকের কথাগুলো ক্রমশ দূরে হারিয়ে যাচ্ছে। মঞ্চে আলো জ্বলে উঠলো—আর বিশিষ্ট দর্শক বীরেশ্বর রক্ষিত চারদিক তাকিয়ে দেখলেন। প্রেক্ষাগৃহে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই।

তৃতীয় দৃশ্যটা বেশ নাটকীয়ভাবে শুরু হলো। সারপেনটাইন লেনের চায়ের দোকানে বেঞ্চির ওপর আমীরী স্টাইলে পা তুলে দিয়েছে বীরেশ্বর। এই বীরেশ্বরের মুখ শুকনো নয়, দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার করে কামানো। বয়টা এসে বীরেশ্বরের কীর্তি দেখে তাজ্জব। তার দিকে একটা সিকি বকশিশ ঠেলে দিয়ে বীরেশ্বর স্টাইলের মাথায় হুকুম করছে, "তোর বাবুকে ডাক।"

ক্যাশ কাউন্টার থেকে সুড়সুড় করে ছুটে এসেছেন পরেশবাবু। বীরেশ্বর তার দিকে দুখানা দশ টাকার নোট ছুড়ে দিয়ে বলছে, "আপনার পাওনা যা আছে কেটে নিন।"

পরেশবাবু বলতে গেলেন, "একখানা নোটেই হয়ে যাবে। মোট পাওনা ন'টাকা দশ আনা।"

বীরেশ্বর হুকুম করলো, "ডবল আণ্ডা ফ্রাই, আর কড়া টোস্ট। বিকেলে চিকেনকারি ও পরটা যেন আলাদা করে তোলা থাকে।"

পরেশবাবু নিজেই আণ্ডা ফ্রাই আনতে ছুটলেন। বয়কে চড়া গলায় হুকুম করলেন, "গরম জল দিয়ে বীরুবাবুর কাপ দুবার ধুয়ে ফেল। তোরা যা ফাঁকিবাজ হয়েছিস না।"

বীরেশ্বর এরপর নাটকীয়তার প্রয়োজনে খোদ পরেশবাবুকেই মাখন টোস্ট খাইয়ে দিয়েছে। পরের পয়সায় কেনা নিজের দোকানের টোস্টে কামড় দিতে-দিতে পরেশবাবু বলেছেন, "কিছু মনে করবেন না, স্যার। ধারে বহু পয়সা লোকসান

দিয়েছি। কিন্তু আমার অপরাধ হয়েছে; আমি এখনও লোক চিনি নি।”

তাতো বটেই। তাতো বটেই। বীরেশ্বর রক্ষিতকে চিনতে এখনও তোমার ঢের দেরি—মায়ের গর্ভে তোমাকে আবার দশ মাস কাটিয়ে আসতে হবে।

বীরেশ্বর যে কোনো ব্যবসা করছে এবং টাকা-পয়সা এবার থেকে অঢেল পাবেন তা দোকানের অনেকেই বুঝে নিয়েছে।

সকালে দুপুরে বিকেলে সন্ধ্যায় এই চায়ের দোকানে বসে বসে চায়ের চুমুকের আড়ালে স্বদেশীদের অনেক খবরাখবর সংগ্রহ করছে বীরেশ্বর রক্ষিত। কানটা খুব সজাগ রাখতে হয়। আর সেই সঙ্গে ডায়ালগ মনে রাখবার ট্রেনিং। এই শিক্ষা বীরেশ্বরের এক সময় ভালই হয়েছিল, তখন শখের থিয়েটারে রাজা সাজতো বীরেশ্বর রক্ষিত। ডায়ালগ একবার শুনলেই তার মনে গেঁথে যায়।

এই দৃশ্যেই গণেশ মিত্তির উপস্থিত হলেন যাঁর মাথার ওপর সরকারের দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঝুলছে।

গণেশ মিত্তিরের খুব কাছে বসেই বীরেশ্বর মুরগীর মাথা চিবোচ্ছিল। তরুণ গণেশ মিত্তিরের মাথাটা খুব ভালভাবে অনেকক্ষণ ধরে দেখেছিল বীরেশ্বর রক্ষিত। অনেক কোঁকড়ানো চুল ছাড়া বিপ্লবী গণেশ মিত্তিরের মাথার আর কোনো বিশেষত্ব খুঁজে পায় নি বীরেশ্বর রক্ষিত। গভরমেণ্ট কী বোকা, বীরেশ্বর ভেবেছিল। দেশে হাজার হাজার লাখ লাখ মাথা কত শস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। সে সব ছেড়ে গণেশ মিত্তিরের ওই মুড়োটুকুর জন্যে সরকার বাহাদুর দশ হাজার টাকা খরচ করতে চাইছেন।

নাট্যালয়ের প্রথম সারিতে বসে আজকের বীরেশ্বর তৃতীয় অঙ্কের শেষে একটা সিগারেট ধরালেন। নাট্যকার অধর চাটুজ্যের একটা কথা মনে পড়ে গেল। “মেয়েমানুষ কোথায়? মহিলা চরিত্র নামাতে দেরি হয়েছে কি নাটকের সর্বনাশ।”

আবার চোখ বুজলেন বীরেশ্বর। নতুন দৃশ্য শুরু হলো। ধর্মতলা স্ট্রীটের মদের দোকানে নেদো মল্লিকের সঙ্গে দেখা করতে যাবার পথে সারপেনটাইন লেনে বীরেশ্বরের শয়নঘর। শুধু শয়ন নয়, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, ড্রইং রুম, স্টাডি, পুজোর ঘর সব বলতে এই এক ঘর। ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে নব বিবাহিতা যুবতী শ্যামা, যার ভাল নাম প্রমদা।

বীরেশ্বর তাকিয়ে দেখলো তার প্রিয়াকে—তন্বী ও গৌরী, শিখরিদশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী।

বীরেশ্বর একটু দ্বিধায় দুলছিল। এতো বড়ো কাজে যাবার আগে একটা কিছু করা প্রয়োজন। অনেকদিন আগে হলে বীরেশ্বর মা-কালীর সামনে একটা নমস্কার ঠুকে দিতো। কিন্তু এখন ঠাকুর-দেবতার ওপর ভরসা নেই তার। তার বদলে বীরেশ্বর সুন্দরী শ্যামাকে কাছে টেনে নিলো। বধূর মুখে আচমকা একটা প্রমাণ সাইজের চুম্বন এঁকে দিলো বীরেশ্বর। বললো, "আজ একটা বড় কাজে যাচ্ছি, শ্যামা। দেখি তোমার কত পয়।"

ঘরের দরজা সামান্য খোলা ছিল। ভয় হলো শ্যামার। বাড়িওলার মুখরা পিসিমা এই দৃশ্য দেখতে পেয়ে থাকলে সমস্ত পাড়া রাষ্ট্র করবে—"ভাড়া দেবার মুরোদ নেই, অথচ দুপুরবেলায় কাজে না বেরিয়ে বউকে চুমো খাওয়া চাই।"

"কী কাজে যাচ্ছো? ভাল কাজে তো?" সরল মনে জিজ্ঞেস করেছিল শ্যামা।

বীরেশ্বর ঘর থেকে বেরোবার সময় স্ত্রীকে আশ্বস্ত করেছিল। "আমি না বীরেশ্বর? শিব কখনও ভাল ছাড়া মন্দ কাজ করে?"

"দেখি, দেখি তোমার হাতখানা দেখি?" নেদো মল্লিক যে বীরেশ্বরের কাছে এতো খবর পাবেন তা কল্পনাও করেন নি।

"আমি শালা চায়ের দোকানে তিন সপ্তাহ ওত পেতে রইলাম,

অথচ গণেশের ইঁদুরটাকেও দেখতে পেলাম না—তুমি বীরেশ্বর, প্রথম দিনেই সিদ্ধিদাতাকে পকেটে পুরলে।”

হুইস্কির অর্ডার দিতে যাচ্ছিলেন নেদো মল্লিক। বিমর্ষ বীরেশ্বর বললো, “মদ খাওয়ার অভ্যাস নেই।”

হা-হা করে হেসে উঠলেন নেদো মল্লিক। “মদ খাওয়ার অভ্যেস নিয়ে কেউ পেট থেকে পড়ে না—অভ্যেস করতে হয়।”

বীরেশ্বর এই অভ্যাস করতে চায় না। নেদো মল্লিক বললেন, “ঠিক হ্যায়, অভ্যেস করতে হবে না—আজ শুধু সেলিব্রেট করো।”

এক পেগ পেটে পড়তেই অনভ্যস্ত বীরেশ্বর অনর্গল বকতে আরম্ভ করলো। “আমার কান্না আসছে, নেদোদা। পেটের দায়ে কোথায় নেমে এলাম? বেশ্যার অধম আমি—টিকটিকির দালাল।”

নিমপাতা খাওয়ার সময় মুখের যে রকম অবস্থা হয়, সেই রকম মুখ বিকৃত করে নেদো মল্লিক বললেন, “দালাল? ছিঃ, ওই অশ্লীল কথাটা কখনও মুখে এনো না। খবরের কাগজের রিপোর্টারদের কী কাজ?”

“খবর যোগাড় করা,” বীরেশ্বর উত্তর দিলো।

“আমাদেরও রিপোর্টারের কাজ। আমরাও হলাম কিনা সরকারের ‘নিজস্ব প্রতিনিধি’।”

গণেশ মিত্র সম্বন্ধে কিছুটা খবর বীরেশ্বর চেপে রেখেছিল। এবার সে ফিসফিস করে জানালো, “গণেশবাবু আবার আসবেন।”

“অ্যাঁ।” লটারির ফার্স্ট প্রাইজ পেলেও নেদো মল্লিক এত খুশী হতেন কিনা সন্দেহ।

এইবার একটু নার্ভাস বোধ করছে বীরেশ্বর। সে সোজাসুজি বললো, “আমার ভয় লাগছে। ওরা যদি আমাকে সন্দেহ করে? ওদের পকেটেও তো রিভলবার থাকে। আমার নিউলি ম্যারেড ওয়াইফ—বাপমায়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে, শুধু আমার মুখ চেয়ে বেচারী

ঘর ছেড়ে চলে এসেছে।" বীরেশ্বর এবার হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো।

নেদো মল্লিক ভরসা দিলেন "কিসসু চিন্তা নেই—তুমি, আমি আর আই-বি'র সায়েব ছাড়া কেউ জানতে পারবে না। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এমনভাবে ব্যাপারটা ম্যানেজ করবো তোমার মনে হবে, নাটক দেখছো।"

কোহিনূর থিয়েটারের মালিক বীরেশ্বর রক্ষিত এবার নিজের খেয়ালেই হাসলেন। নাটক কথাটা তাঁর জীবনে কেমন ঘুরে ফিরে এসেছে। চোখের জল—ধর্মতলার ওই বারেই বোধহয় তিনি জীবনের শেষ জেনুইন চোখের জল ফেলেছিলেন। শ্যামার জন্যে তখন তিনি সত্যিই ভাবতেন। মেয়েটা প্রেমের জন্যে, স্রেফ বীরেশ্বর রক্ষিতের জন্যে, সমস্ত কিছু ত্যাগ করে একবস্ত্রে পথে বেরিয়ে এসেছিল।

বেয়ারা অর্জুন যেন একবার উঁকি মেরে গেলো। আপিসঘরের দরজা খুলে দেবে কিনা জানতে চাইছে বোধ হয়। কিন্তু বীরেশ্বর সেদিকে মন দিলেন না তাঁর জীবন-নাটকের নতুন দৃশ্য শুরু হচ্ছে।

পঞ্চম দৃশ্যটা সারপেনটাইন লেনের চায়ের দোকানে। বিপ্লবীদের সন্দেহ এড়ানোর জন্যে অন্যদিনের মতো নির্দিষ্ট সময়ে বীরেশ্বর রক্ষিত নিজেও সেখানে বসে আছে। দু'খানা মোগলাই পরটা ও ফুলপ্লেট ফাউলকারি খেয়েও আশ মিটলো না বীরেশ্বরের। আজ তো নাটকের ক্লাইম্যাক্স—সুতরাং আরও একটা পরটা এবং হাফ প্লেট স্পেশাল লিভারকারি অর্ডার দিলো। পরেশবাবু খাতির করে একখানা চিকেন ঠ্যাং বোনাস দিলেন এবং সেই সঙ্গে বেশ খানিকটা বাড়তি ঝোল।

ইতিমধ্যে গণেশ মিত্তির সন্তর্পণে রেস্তোরাঁয় ঢুকলেন। "আসুন, আসুন," চাপা গলায় পরেশবাবু তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন।

পরেশবাবুর দোকানের কাজে কিন্তু কোনো বাধা পড়লো না। বীরেশ্বরের প্লেটে ঝোল ঢালতে ঢালতে পরেশবাবু বললেন, "এই জুস যতখানি খাবেন ততখানি রক্ত হবে। শ্বশুরবাড়ি ছাড়া আর কোথাও এত আদর-যত্ন পাবেন না।"

"দাঁড়াও শালা, দেখাচ্ছি তোমার শ্বশুরবাড়ি!" হঠাৎ কে যেন চিৎকার করে উঠলো। সাদা কাপড়ে পুলিসের লোকরা ততক্ষণ মহামূল্যবান শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বোমা ফাটলো, আলো নিভলো, কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি হলো। কিন্তু বিপ্লবী গণেশ মিত্তির অ্যারেস্টেড। দোকানের মালিক পরেশবাবু হতভম্ব, এই পরিস্থিতির জন্যে তিনি তৈরি ছিলেন না।

পুলিসের লোকরা এবার ছুটে এসে বীরেশ্বর রক্ষিতকেও পাকড়াও করলো। সবাইকে শুনিয়ে কর্কশ ভাষায় বললো, "চলো শালা, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে মুরগীর ঝোল খাবে।"

বীরেশ্বর সেদিন কী আশ্চর্য অভিনয় করেছিল। কী রকম কাঁদ-কাঁদ অবস্থায় বলেছিল, "আমাকে কেন? আমি নিরীহ লোক, এখানে মাঝে-মাঝে খেতে আসি।"

বীরেশ্বরের সেই অসহায় অবস্থা দেখে গণেশ মিত্র পর্যন্ত বিগলিত হয়েছিলেন। পুলিসী অত্যাচারের মধ্যেই বীরেশ্বরকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন, "আমাকে ধরেছেন ধরুন। কিন্তু এই নিরীহ বেচারাকে কেন? ভদ্রলোক এক কোণে বসে খাচ্ছিলেন।"

পুলিসের রুলের কোঁতকা খেয়ে গণেশ মিত্র চাপা আর্তনাদ করে উঠেছিলেন।

দু'সপ্তাহ পরে বীরেশ্বর যখন পুলিশের লক-আপ থেকে বাড়ি ফিরে এসেছিল তখন তার মুখে বড় বড় দাড়ি গজিয়েছে। পরেশবাবুর চায়ের দোকানে সেই যে তালা পড়েছে আর খোলে

নি। বেচারা শ্যামা এই ক'দিনে ভেবে ভেবে কেঁদে কেঁদে অর্ধেক হয়ে গিয়েছে।

বীরেশ্বর এখন সাধারণ মানুষের চোখে রীতিমত হিরো। শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে তারা দূর থেকে ওই বেপরোয়া বিদ্রোহীকে লক্ষ্য করছে।

হাজতবাসের সময় বীরেশ্বর মাঝে মাঝে ভেবেছে শ্যামার কিভাবে চলছে। কান্না থামিয়ে চোখ দুটো বড় বড় করে শ্যামা বললো, "তুমি যে দেশের জন্যে কাজ করো, আগে তো কখনও আমাকে বলো নি।"

বীরেশ্বর মুহূর্তের জন্যে বিপদে পড়ে গেলো। কিন্তু পরক্ষণেই গৃহিণীকে সুন্দর ডায়ালগ শুনিয়ে দিলো, "সব জিনিস কী বলা যায়, শ্যামা ?"

শ্যামার কাছেই বীরেশ্বর খবর পেলো, বহু চেষ্টা করেও সে বীরেশ্বরের হদিস করতে পারে নি। কিন্তু তার খাওয়া-পরার কোনো কষ্ট হয় নি। পাড়ার ছেলেরা তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে সব কিছু দিয়েছে। অমন যে বাড়িওয়ালার মুখরা পিসীমা, তিনিও পাল্টে গেছেন। নিজে দেখা করে বলেছেন, "তুই বাড়ি ভাড়ার জন্যে ভাবিস না, মা। আমি ভাবতাম, তুই বুঝি একটা ধর্মের ষাঁড়কে বিয়ে করেছিস কিন্তু ওমা! এ যে দেখছি সাক্ষাৎ পুরুষ সিংহ!"

বীরেশ্বর ফিরে এসেছে, তাতে সকলের কী আনন্দ। পাড়ার ছেলেরা এসেছিল। বীরেশ্বর গম্ভীরভাবে বলেছে, "আমার সঙ্গে তোমরা সম্পর্ক রেখো না—বিপদে পড়ে যেতে পারো।"

দীর্ঘ বিরহের পর রাতের আড়ালে শ্যামার অধরে বীরেশ্বর যখন চুম্বন এঁকে দেবার প্রস্তাব করলো তখন শ্যামা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কারুর ক্ষতি করে নিজের মুক্তি কেনো নি তো? কারুর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে বলো নি তো?"

বীরেশ্বর ইতিমধ্যে শ্যামাকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছেন,

চুম্বনের প্রত্যাশায় নিজের ঠোঁট স্ত্রীর ঠোঁটের কাছে এগিয়ে এনেছেন। এমন নাটকীয় মুহূর্তে চমৎকার একটা সংলাপ বলেছিল বীরেশ্বর। আলিঙ্গন আরও সুদৃঢ় করে, শ্যামার অনাবৃত বুকের কাছে নিজের মুখটি এনে বীরেশ্বর জিজ্ঞেস করেছিল, "শ্যামা, আমার মুখ দেখে কি তাই মনে হয়?"

চমৎকার! বীরেশ্বর রক্ষিতের আপাতসরল চাহনি দেখে তার অনভিজ্ঞা স্ত্রী কিছুই বুঝতে পারলো না। বরং শ্রদ্ধামিশ্রিত আবেগে বীর স্বামীর অধরে পবিত্র চুম্বন এঁকে দিলো।

সারপেনটাইন লেনের বাড়ি পাল্টেছিল বীরেশ্বর। চোখের জল ফেলতে ফেলতে পাড়ার ছেলেরা তাকে বিদায় দিয়েছিল।

ধর্মতলার প্রায় জনহীন বারে নেদো মল্লিক জিজ্ঞেস করলেন, "পুরস্কারের দশ হাজার টাকা কেমন করে হজম করবে, বীরেশ্বর? নেদোর নেই বউ-এর ভয়, কিন্তু তুমি বাছাধন বেটার-হাফ্‌কে কী বোঝাবে?"

বীরেশ্বর সত্যিই বিপদে পড়ে গিয়েছে। শ্যামার সন্দেহ উদ্রেক না-করে এই অবস্থায় টাকাটা কিভাবে হজম করবে সে বুঝতে পারছে না।

বীরেশ্বরের মুখ দেখে নেদো বললেন, "এর আগেও কত লোককে পুলিশের টাকা দিয়েছি। কিন্তু তাদের এই রকম আদর্শবতী বউয়ের সমস্যা ছিল না।"

একটু ভেবে নেদো মল্লিক বলেছিলেন, "কুছ পরোয়া নেই— তুমি আমার সঙ্গে ক'দিন শেয়ার মার্কেটে যাতায়াত করো। বউকে বলো, তোমার জীবনখাতার পুরনো পাতা উল্টে এবার একটা নতুন চ্যাপ্টার শুরু করতে চাও। বিপ্লবী বীরেশ্বর এবার ব্যবসায়ে মন দেবে।"

"ড্রামা, ড্রামা, ড্রামা"– কোহিনুর থিয়েটারের মালিক বীরেশ্বর

স্বগতোক্তি করলেন, "কী সুন্দরভাবে পরবর্তী অঙ্ক শুরু হলো।"

মাত্র কয়েকদিনে শেয়ার মার্কেটের বেচাকেনায় দশ হাজার টাকা 'লাভ' করলো বীরেশ্বর রক্ষিত।

স্বামীর গরবে এখন গরবিনী শ্যামা। তার স্বাস্থ্য আরও উজ্জ্বল হয়েছে। সে জিজ্ঞেস করে, "শেয়ার বাজারে তুমি কী করো ?"

"খুউব সোজা !" বীরেশ্বর উত্তর দেয়। "কম দামে কিনি, আর বেশী দামে বেচি—এইটাই তো সব বিজনেসের গোড়ার কথা।"

শ্যামা বলে, "যেদিন তোমাকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেলো, সেদিন আমার যা অবস্থা হয়েছিল! রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখছি, তোমাকে আর গণেশ মিত্রকে চোখ বাঁধা অবস্থায় রাতের অন্ধকারে ওরা কোনো অজানা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। ওদের হাতে গুলি বোঝাই বন্দুক। আমি দেখলাম, একটা ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে গণেশ মিত্রকে ওরা বেঁধে ফেললো। তারপর ওরা তোমার দিকে এগোচ্ছে · এমন সময় আমার ঘুম ভেঙে গেলো।"

শেয়ার বাজারের দু'একটা দৃশ্য বীরেশ্বর এখন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। নেদো মল্লিককে নমস্কার। তাঁর হাত ধরেই লায়ন্স রেঞ্জের বেচু-কিনুর জগতে হাজির হয়েছিলেন বীরেশ্বর রক্ষিত। নেদো মল্লিক বলেছিলেন, "এই শেয়ার বাজারটাই হলো আমার পৈত্রিক লাইন। কয়েকটা বড় চোট খেয়ে সামলাতে না পেরে, এই পুলিস লাইনে জড়িয়ে পড়েছিলুম। এখন আবার পুরো দমে কাজ আরম্ভ করেছি।"

লায়ন্স রেঞ্জের রাস্তায় মাটির ভাঁড়ে বীরেশ্বরকে বেদানার রস খাওয়াতে খাওয়াতে স্টক এক্সচেঞ্জের হলদে বাড়িটা দেখিয়ে নেদো মল্লিক বলেছিলেন, "বউ-এর ভাগ্য থাকলে, এখানে বেচু-কিনু থেকেও টু-পাইস কামাতে পারবে।"

খেয়ালী নেদো মল্লিক হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিলেন, "লাইফে কতটা উন্নতি করতে চাও, ব্রাদার।"

একগাল হেসে বীরেশ্বর বলেছিল, "যতখানি সম্ভব।"

ফিক করে হেসে নেদো বলেছিলেন, "তাহলে ঠিক জায়গায় এসেছো। এখানে রাজা ফকির হয়, আবার ফকির রাজা হয়। বুল ও বেয়ার—ষাঁড় ও ভাল্লুকের মধ্যে ঠাণ্ডা-গরম, গরম-ঠাণ্ডা লড়াই লেগে রয়েছে।"

বীরেশ্বর রক্ষিত বলেছিল, "আপনি শুধু রাস্তাটা দেখিয়ে দিন—তারপর আমি ভেল্কি খেলবো।"

নেদো মল্লিক হেসে বলেছিলেন, "তা কিছু আশ্চর্য নয়—যেভাবে লাক তোমাকে সারপেনটাইন লেনে ফেভার করলো! মাছের তেলে এখন মাছ ভাজা শুরু করো এই শেয়ার বাজারে। জয় বাবা ইণ্ডিয়ান আয়রন!"

বীরেশ্বরের বেদানা রসের ভাঁড়টা খালি হতেই নেদো মল্লিক কচি খিরার অর্ডার দিলেন। নিজেও খিরা খেলেন। বললেন, "এই রকম স্পেশাল সাইজের দুগ্ধপোষ্য কচি খিরা লায়ন্স রেঞ্জ ছাড়া ওয়ার্লডের কোথাও পাবে না।"

বেদানা রস নেদো মল্লিক মুখে তোলেন নি। যারা ড্রিংক করে তারা সাত সকালে মিষ্টি রসের ধারে-কাছে যাবে না। কিন্তু কচ কচ করে শসা চিবোতে লাগলেন। লায়ন্স রেঞ্জের বাড়িগুলো দেখিয়ে নেদো বললেন, "নামে শেয়ার বাজার—আসলে স্রেফ জুয়ার বাজার। জুয়াড়ির ভাগ্য যদি থাকে তোমার, টু-পাইস করে নেবে। দেখি তোমার ভাগ্যখানা।" সেদিন নাগরা জুতো পরেছিলেন নেদো মল্লিক। আচমকা ডানপায়ের জুতোটা উপরের দিকে ছুড়ে দিলেন। দ্রুত জিজ্ঞেস করলেন, "হাজার টাকা বাজী—বলো জুতো চিৎ হয়ে মাটিতে পড়বে, না উপুড় হবে।"

বীরেশ্বর তাজ্জব। মাত্র মুহূর্তের সময় পেয়েছিল সে। নাগরা জুতো তখন পাক খেয়ে উপরে ওঠা শেষ করে নিচে নামতে আরম্ভ করেছে। বীরেশ্বর একটুও ব্যস্ত হলো না। পয়মন্ত বউ-এর ওপর তার বিশ্বাস আছে। আজ সকালেও শ্যামাকে চুমু খেয়ে বেরিয়েছে। বীরেশ্বর শান্তভাবে বললো, "চিৎ।"

ওমা! সত্যিই নাগরা জুতো চিৎ হয়ে পড়েছে। পকেট থেকে হাজার টাকা বার করে, নেদো মল্লিক হঠাৎ বীরেশ্বরের হাত ধরে তার নাড়ি পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। কোনো প্রকারের উত্তেজনার লক্ষণ নেই বীরেশ্বরের নাড়িতে। বিস্মিত নেদো মল্লিক তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "বীরেশ্বর, তুমি রাজা হবে! নমস্কার তোমাকে। জয় বাবা ইণ্ডিয়ান আয়রন।"

রাজা! বীরেশ্বর রক্ষিত মাথা চুলকোলেন—রাজা তিনি তো হয়েইছেন, কিন্তু রাজার ওপর কী আছে? শেয়ার মার্কেটের ঠাণ্ডা-গরমে, বেঙ্গল কোল, অ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট, রূপাচেরা টি. বি-আই-সি, বার্ন, ব্রেথওয়েট, জেশপ শেয়ারের উঠতি-পড়তিতে বীরেশ্বর রক্ষিত নিজের ভাগ্য ফিরিয়ে নিয়েছেন। এখন বীরেশ্বর ফিনলের 'সাচ্চা হীরা' আদ্দির পাঞ্জাবি এবং মফতলালের 'সেনগুপ্ত' ধুতি দিনে দু'বার পাল্টান। গলায় সোনার হার ঝুলিয়েছেন বীরেশ্বর, মণিবন্ধে সোনার ক্রনোমিটার ঘড়ি। বীরেশ্বরের চার আঙুলে এখন চারটে দামী পাথরের আংটি।

স্বাধীনতা এলেই সায়েব কোম্পানিগুলোর সর্বনাশ হবে যারা ভেবেছিল বীরেশ্বর তাদের দলে নন। সময় বুঝে তিনি জলের দামে ভাল ভাল শেয়ার কিনেছেন—তারপর তিনগুণ দামে সেইসব শেয়ার বেচেছেন। স্বাধীনতার পরে বিপ্লবী গণেশ মিত্তিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন বীরেশ্বর। "মনে আছে, স্যর? সারপেনটাইন লেনে আপনার সঙ্গে এক রাত্রে পুলিসের হাতে অ্যারেসটেড হয়েছিলাম।"

গোপন আদালতে গণেশ মিত্রের মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল। দিল্লীতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত আরও কয়েকদিন দেরি হলে সেই দণ্ডাজ্ঞা কার্যকরী হতো। মৃত্যুর হাত থেকে সামান্যর জন্যে বেঁচে গিয়েছিলেন গণেশ মিত্র। কিন্তু শরীরের ওপর পুলিসী অত্যাচার বন্ধ হয় নি। জেলখানার যন্ত্রণায় ভগ্নস্বাস্থ্য গণেশ মিত্র এখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না। গণেশ মিত্র ক্ষীণকণ্ঠে বীরেশ্বরকে বলেছিলেন, "কে যে সেদিন আমাদের ধরিয়ে দিলো। আমার মনে হয় চায়ের দোকানের মালিকই লোভ সামলাতে পারে নি। আমার দলের ছেলেরা শেষ পর্যন্ত ওকে খুন করে অবশ্য প্রতিশোধ নিয়েছে।"

গণেশ মিত্র বললেন, "সেদিন গুলি চালিয়ে আমি পালাতে পারতাম। কিন্তু আপনি এমন পজিসনে ছিলেন, ভয় হলো গুলি আপনার গায়ে লাগতে পারে। নেতাজী বলতেন, কখনও নিরপরাধ অসহায় মানুষের ক্ষতি কোরো না।"

সংসার, সম্পদ, সম্মান কোনো কিছুতেই লোভ নেই দেশের জন্য নিবেদিতপ্রাণ চিরকুমার গণেশ মিত্রের। বীরেশ্বর এখন ব্যবসা করছেন জেনে মৃত্যুপথযাত্রী গণেশ মিত্রের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বীরেশ্বরকে তিনি আশীর্বাদ করেছিলেন, "এখন তো দেশ স্বাধীন। ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য দিয়েই দেশ গড়ার কাজে লেগে যান।"

বিপ্লবী গণেশ মিত্রের সঙ্গে একখানা ছবি তুলেছিলেন বীরেশ্বর রক্ষিত। তারপর ওই ছবি দেখিয়ে কয়েক বছরের মধ্যে কিছু সিমেণ্টের পারমিট যোগাড় করেছিলেন 'নির্যাতিত দেশকর্মী' বীরেশ্বর রক্ষিত। কয়েক বছরের মধ্যে বীরেশ্বর সত্যি রাজা হয়েছেন—সকালে সিমেণ্ট, দুপুরে শেয়ার-বাজার, বিকেলে আবার সিমেণ্ট নিয়ে তিনি মাতামাতি করেন।

বীরেশ্বর রক্ষিত রাজা হয়েছেন এবং তাঁর নিজের বউকে রাণী করেছেন। বীরেশ্বর রক্ষিতের ধারণা শ্যামার সৌভাগ্যেই সারপেন-

টাইন লেনের বীরেশ্বর, ফিয়ার্স লেন ঘুরে এখন সানি পার্কে বাড়ির মালিক হয়েছেন। যখনই বীরেশ্বর বড় কোনো কাজে বেরোন, যখনই শেয়ার মার্কেটে বড় কোনো ঝুঁকি নেন্ তখনই বেরুবার আগে শ্যামাকে তিনি চুমু খান। লোকে যাই বলুক, বীরেশ্বর দেখেছেন—এইভাবে হাতে হাতে সুফল পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিতে কখনও কোনো কাজে তাঁকে বিফল মনোরথ হতে হয় নি।

সারপেনটাইন লেন থেকে সানি পার্ক—কী চমৎকার! বীরেশ্বর ভাবলেন, এইখানেই নাটকটা শেষ হলে কী সুন্দর হতো। রূপকথা হলে, এইখানেই লেখা হতো—তারপর বীরেশ্বর ও শ্যামা রাজরাণী হয়ে সুখে দিনযাপন শুরু করলো এবং পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ঘরসংসার করতে লাগলো। কিন্তু জীবনের নাটক তো রূপকথার মতো অতো সহজে শেষ হয়ে যায় না।

নেদো মল্লিক ইতিমধ্যে একদিন রাজ-দর্শনে এলেন। বললেন, "বীরেশ্বর, সারা জন্ম শুধু খেটেই মরবে? সাধ-আহ্লাদ যা আছে তা পুরিয়ে নেবে না?" বীরেশ্বর হেসেছিলেন। টাকার লোভ তাঁর বেড়েছে। আরও অনেক টাকা তিনি রোজগার করতে চান। সেই সঙ্গে আরও অন্য কিছুর জন্যে ইদানীং মনটা চনমন করে ওঠে। কিন্তু কুসুমকুমারীর অ্যাডভেঞ্চারে তিনি বেশ ধাক্কা খেয়েছেন।

নেদো মল্লিক বললেন, "অনেক দিন হৈ-চৈ হয় নি। কোহিনূর থিয়েটারে রাজা-রাণী অভিনয় হচ্ছে, চলো দু'জনে দেখে আসি।"

অতীতের নাটকটা যখন বেশ জমে উঠছিল তখন কোহিনূর থিয়েটারের মালিক বীরেশ্বর আচমকা বর্তমানে ফিরে এলেন। আকাট গণ্ডের মতো বেয়ারা অর্জুন এসে বললো কর্পোরেশন আপিস থেকে একজন লোক দেখা করতে এসেছে।

বিরক্ত হলেন বীরেশ্বর। এসব লোক কেন আসে তাঁর জানা আছে। কোনো একটা ছুতো ধরে দেখা করে ফ্রি পাস চাইবে। বীরেশ্বর বললেন, "নরহরিবাবুর কাছে নিয়ে যাও—আমি ব্যস্ত আছি।"

অর্জুন এবার বীরেশ্বরের হাতে একখানা খাম দিলো। খামের ওপর ওই গোল-গোল মেয়েলী হাতের লেখা বীরেশ্বরের চেনা। মধুমালতী লিখেছে—শ্রীযুক্তবাবু বীরেশ্বর রক্ষিত, শ্রদ্ধাস্পদেষু।

খামটা বীরেশ্বর খুলতে যাচ্ছেন, এমন সময় অর্জুন খবর দিলো আর এক মেমসায়েব এসেছিলেন।

"কে লিপিকা?" আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন নাট্যকার ও নির্দেশক বীরেশ্বর রক্ষিত।

লিপিকার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় থিয়েটারের মালিক বলে নিজেকে প্রচার করতে ইচ্ছে হয় না বীরেশ্বরের। নাট্যকার ও নির্দেশক বীরেশ্বরের ওপর তখন তিনি আলোর ফোকাস ফেলতে চান।

মালিক ও নাট্যকারের এই দ্বৈতভূমিকার একটা ইতিহাস আছে। মালিক হবার কিছুদিন পরেই বীরেশ্বর লক্ষ্য করেছেন, গাঁটের কড়ি খরচ করে, হাজার হাজার টাকার রিস্ক নিয়ে যিনি থিয়েটার কোম্পানি চালাচ্ছেন, জনগণের হৃদয়াসনে তাঁর কোনো স্থান নেই। পাবলিক মাতামাতি করে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে। আর অভিনেত্রীগুলো লেখক দেখলেই মোমবাতির মতো বিনয়ে বিগলিত হয়। ঔপন্যাসিক নগেন পাল সেবার নাটক দেখতে এলেন। শীর্ণ, বাতে পঙ্গু,

শ্যামবর্ণের নগেন পাল অভিনয় দেখছেন খবর পেয়ে সেদিন গ্রীনরুমে নট-নটীদের মধ্যে কী উত্তেজনা। লাঠির ওপর ভর করে নগেন পাল বিরতির সময় গ্রীনরুমে সকলের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। অমন যে গর্বিতা, গম্ভীর, সুন্দরী লিপিকা সেও কেমন কিশোরী বালিকার মতো সাহিত্যিকের দিকে এগিয়ে এল এবং পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করে মাথায় পদধূলি গ্রহণ করলো। সাহিত্য সম্রাট ও সুন্দরীর সেই সাক্ষাৎকার বীরেশ্বরের হৃদয়ে হিংসার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

সাহিত্য সম্রাট নগেন পাল মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। মোটা চশমার কাঁচের মধ্য দিয়ে উদ্ভিন্নযৌবনা লিপিকার দিকে তাকিয়ে নগেন পাল বলেছিলেন, "তোমার নৃত্য সুন্দর হচ্ছে। বিজয়িনী হও, এই আশীর্বাদ করি।"

ব্লাউজের বুকের কাছ থেকে অটোগ্রাফের খাতা বার করেছিল লিপিকা এবং সেখানে স্বাক্ষর দিয়ে সাহিত্যসম্রাট আবার লিখেছিলেন—বিজয়িনী হও।

বীরেশ্বর রক্ষিত নিজের চোখে সেই দৃশ্য দেখেছিলেন। রাত্রে সেদিন বীরেশ্বর স্বপ্ন দেখলেন, পোষ না-মানা টাট্টু ঘোড়ার মতো বেপরোয়া লিপিকা হঠাৎ শান্ত হয়ে তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। খুব কাছে এগিয়ে এসে সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করছে, "আপনিই লেখক, নাট্যকার, নির্দেশক বীরেশ্বর রক্ষিত!" ব্লাউজের ফাঁক থেকে ছোট্ট স্বাক্ষরের খাতাটা বার করে নিজের হাতে নায়ক বীরেশ্বরের দিকে এগিয়ে দিয়ে মিষ্টি গলায় অনুরোধ করছে, "আমাকে কিছু লিখে দিন—এমন কিছু যা চিরকাল আমার জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে।"

বীরেশ্বরও লিপিকার হাতের স্পর্শসুখ অনুভব করার পর সস্নেহে অটোগ্রাফ খাতায় লিখতে যাচ্ছিলেন, বিজয়িনী হও। হঠাৎ সেই সময় স্বপ্ন ভেঙে গেলো।

লিপিকা যেন স্বপ্নেও সহজে ধরা দিতে চায় না। আজ লিপিকা নিজেই দেখা করতে এসেছে শুনে খুব ভাল লাগছে বীরেশ্বরের। কিন্তু—কোথায় লিপিকা?

অর্জুন ঘুরে এসে বললো, "কই দেখছি না তো।" দুই মেমসাহেব প্রায় একই সঙ্গে এসেছিলেন কোহিনূরে। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে সায়েব কোনো 'পলাট' ভাবছেন আন্দাজ করে অর্জুন তখন বীরেশ্বরকে জ্বালাতন করে নি।

লিপিকা কোনো চিঠি না রেখেই চলে গিয়েছে। আর বড়দিদি বুকিং অফিস থেকে খাম চেয়ে নিয়ে, একটুকরো চিঠি লিখে ভিজে ঠোঁটে সেই খাম বন্ধ করে অর্জুনের হাতে রেখে গিয়েছেন।

"ইডিয়েট কোথাকার!" ভীষণ রেগে উঠলেন বীরেশ্বর রক্ষিত। লিপিকা এল, অথচ তাকে কেউ ডেকে দিলো না। কী কুক্ষণে যে দরজাটা তিনি ভেজিয়ে রেখেছিলেন।

লিপিকা। লিপিকা। তুমি এলে, অথচ দেখা না করেই চলে গেলে। বীরেশ্বরের মনটা ছটফট করছে।

বীরেশ্বরের ফোন বাজছে। কে এই সময় ফোন করতে পারে, তা বীরেশ্বর জানেন। গম্ভীর মুখে বীরেশ্বর ফোন তুলে নিলেন। ওপাশে শ্যামা, যার ভাল নাম প্রমদা কে রেখেছিল ভগবান জানেন। প্রমোদের নামগন্ধ অবশিষ্ট নেই এই মেয়েমানুষটির মধ্যে।

ঘরসংসার ভাঙিয়ে এই রমণীটিকে একদিন তিনি বার করে এনেছিলেন ভাবতে অবাক লাগে বীরেশ্বরের। কেন আমি বাহির হলেম কেউ তা জানে না। টেলিফোনের অপরপ্রান্তে সানি পার্কের সুসজ্জিত অট্টালিকায় দোতলার এক কোণে পঁয়তাল্লিশ বছরের শ্যামাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন বীরেশ্বর রক্ষিত। স্বামীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আকারে বিপুলা হয় নি শ্যামা। কিন্তু ওর শরীরে নমনীয়তার অভাব লক্ষ্য করেন বীরেশ্বর। শ্যামার তন্বীদেহের সর্বত্র

যেন রুক্ষতা ছড়িয়ে আছে। অথচ রমণী অঙ্গের ঈষদুষ্ণ কোমলতা ছাড়া আজকাল বীরেশ্বরের কিছুই ভাল লাগে না।

শ্যামাকে এক এক সময় প্রচণ্ড অকৃতজ্ঞ মনে হয় বীরেশ্বরের। মলঙ্গা লেনের যে-বাড়িতে ওর জন্ম, যে-বাড়ির সিঁড়ির কাছে বীরেশ্বরের সঙ্গে ওর প্রথম দৃষ্টিবিনিময়, সে-বাড়িটা একদিন পাবলিককে দেখিয়ে আনবেন বীরেশ্বর। সেখান থেকে বেরিয়ে ভায়া সারপেনটাইন লেন এবং ফিয়ার্স লেন আজ শ্যামা যে সানি পার্কে পৌঁছেছে তার জন্যে মুখে হাসি সব সময় লেগে থাকা উচিত ছিল।

কিন্তু শ্যামাকে জিজ্ঞেস করুন, সে নির্দ্বিধায় বলবে, সারপেনটাইন লেনের সেই এক-কামরা ভাড়াটে বাড়িতে—যেখানে কলপায়খানা বারোয়ারি, যেখানে আলাদা কোনো রান্নাঘর ছিল না—সেখানেই সবচেয়ে সুখী ছিল সে। বীরেশ্বর ভাবলেন, বড়লোকের বউদের এও এক ধরনের বিলাসিতা—তারা মাঝে মাঝে অতীতের অভাব-অনটনকে ঘিরে কল্পলোকের স্বর্গ তৈরি করতে ভালবাসে।

শ্যামাকে একদিন বীরেশ্বর জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন কোন্‌টা?"

বীরেশ্বর আন্দাজ করেছিলেন শ্যামা বলবে, ১৫ই ফাল্গুন, যেদিন বীরেশ্বরের হাত ধরে শ্যামা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু শ্যামা উত্তর দিলো, "২১শে জানুয়ারি, যেদিন বিপ্লবী গণেশ মিত্রের সঙ্গে ওরা তোমাকে ধরে নিয়ে গেলো। সমস্ত রাত কেঁদেছি, অজানা ভয়ে শিউরে উঠেছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গর্বে বুকটা ভরে উঠলো, বুঝতে পারলাম, মানুষ চিনতে আমার ভুল হয় নি, আমি যার-তার হাত ধরে বাবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি নি।"

রোমাঞ্চকর সেই রাত্রের গল্প খোকনকে শ্যামা কতবার যে শুনিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আগুনের মতো তেজস্বী গণেশ মিত্র পুলিসের কাল গাড়িতে চড়েও আপনমনে আবৃত্তি

করেছিলেন—"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী, ভয় নাই ওরে ভয় নাই, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

"অল রাবিশ", বীরেশ্বর আপন মনে মন্তব্য করলেন। "ক্ষয় নাই যদি, তাহলে গণেশ মিত্তিরের সহকর্মী পুরন্দর সিং কেন পুলিসের গুলিতে নিহত হলো? গণেশ মিত্তির নিজে কেন কারাগারের অন্ধকারে ক্ষয় রোগের শিকার হলেন?" সেই ক্ষয় রোগেই শেষ পর্যন্ত নিঃশেষিত হলেন গণেশ মিত্তির। তাও কি আনন্দ—"স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে মরতে পারছি, এর থেকে কী আনন্দ হতে পারে?" বলেছিলেন মৃত্যুপথযাত্রী গণেশ মিত্র। ভাগ্যে মৃত্যুর আগে ওঁর সঙ্গে নিজের ছবিটা তুলতে পেরেছিলেন বীরেশ্বর রক্ষিত।

শ্যামা ও পুত্র খোকনের কাছে বীরেশ্বরের সেই ছবিটা সবচেয়ে প্রিয়। স্টেনলেস স্টিল ফ্রেমের মধ্যে ঢুকিয়ে ছবিটাকে ড্রেসিং টেবিলের ওপর সযত্নে রেখে দিয়েছে শ্যামা।

টেলিফোনে শ্যামা শান্ত অথচ শীতলভাবে জিজ্ঞেস করলো, "এখন কী করছো?"

"কাজ।" ক'টা জবাব দিলেন বীরেশ্বর। তাঁর এই কাজের মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা শ্যাম কোনোদিন করে নি। এই ব্যাপারে স্বামীকে অপার স্বাধীনতা দিয়েছে সে। শ্যামা বড় শান্ত—বিশেষ কোনো দাবি করে না। শ্যামা একটু মুখরা এবং 'পজেসিভ' হলে বীরেশ্বর বোধ হয় অন্য রকম হতেন।

"বেলের শরবতটা খেতে ভোলো নি তো?" শ্যামা এবার মনে করিয়ে দিলো।

"অনেকক্ষণ খেয়েছি", আবার কাটা উত্তর দিলেন বীরেশ্বর।

শ্যামা বললো, "আমেদাবাদ থেকে খোকার খবর এসেছে। আমেদাবাদ ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল রিসার্চ ওকে আরও এক বছরের রিসার্চ স্কলারশিপ দিচ্ছে। তুমি কী বলো?"

বীরেশ্বরের মতামত শ্যামা এবং খোকন কারও অজানা নয়। তিনি চান ছেলে ক্রমশ সিমেণ্টের ব্যবসায় ঢুকে পড়ুক। বীরেশ্বর বললেন, "যতই ডিগ্রি যোগাড় করুক, কোনো চাকরি থেকেই ও দিনে হাজার টাকা মাইনে পাবে না। বীরেশ্বর (সিমেণ্ট) প্রাইভেট লিমিটেড-এ এখনও সে সুযোগ রয়েছে।"

"আমি কী বলবো বলো? ওতো কারুর কথা শুনতে চায় না," দুঃখের সঙ্গে উত্তর দিলো শ্যামা।

যদিও একমাত্র সন্তান—তবু, বীরেশ্বর রক্ষিত এই মুহূর্তে খোকন সম্বন্ধে চিন্তা করার মেজাজ পাচ্ছেন না।

একটু থেমে হঠাৎ শ্যামা জিজ্ঞেস করলো, "আজকের তারিখটা মনে আছে?"

স্ত্রীর কথায় বীরেশ্বরের মনে পড়ে গেলো, এই দিনেই ব্রিটিশ আমলে সারপেনটাইন লেনে তিনি পুলিসের হাতে ধরা পড়েছিলেন।

"হুঁ", টেলিফোনের মাধ্যমে বীরেশ্বর একটা চাঁচাছোলা শব্দ করলেন, যেন পরাধীন আমলের সেই স্বদেশী ব্যাপারটা এমন কিছু নয়।

উত্তরটা যে স্ত্রীর মনঃপূত হবে না তা বীরেশ্বর জানেন। এবার সামান্য দ্বিধার পর শ্যামা সলজ্জভাবে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি ফিরছো তো?"

বীরেশ্বর কিছুই এখনও ঠিক করেন নি। গম্ভীরভাবেই বললেন. "দেখি। অযথা চিন্তা কোরো না।"

টেলিফোন নামিয়ে দিয়ে উপরের এবং নিচের চোয়াল চেপে ধরলেন বীরেশ্বর রক্ষিত। হাতের খামটা ছিঁড়ে ফেলে এবার মধুমালতীর চিঠিটা বার করলেন। সুন্দর হস্তাক্ষরে মধুমালতী লিখেছে, "শ্রীচরণকমলেষু, আজ আসছেন তো? ইতি"

বেশ বিপদে পড়া গেল! শ্যামা রক্ষিত ও মধুমালতী গুপ্তা দুই

নারী একই দিনে, একই সময়ে বীরেশ্বরের উপস্থিতি কামনা করছে। নাটকে এবং সাহিত্যে একেই বলে প্রেমের ত্রিকোণ খেলা। ত্রিকোণ নয় চতুষ্কোণ—লিপিকার মিষ্টি মুখটা মনে পড়তেই বীরেশ্বর নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। এই মুহূর্তে অবচেতন মনে লিপিকার সান্নিধ্যই কামনা করছেন বীরেশ্বর। লিপিকা কেন এসেছিল কে জানে। সেতো কোনোদিন এর আগে বীরেশ্বরের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করে নি।

বীরেশ্বর এবার হাতের চিঠিটার দিকে তাকালেন। মধুমালতী আজকেই বাড়িতে যাবার নিমন্ত্রণ জানালো কেন? ওহো! একুশে জানুয়ারিটা যে ওখানেও মূল্যবান হয়ে আছে। কী আশ্চর্য! ইংরিজী বছরের প্রথম মাসটা ঘুরে ফি'র বীরেশ্বর রক্ষিতের জীবনে কী রকম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

বীরেশ্বর রক্ষিতের কথা তো অনেকক্ষণ ধরে শুনছেন। এবার অনুগ্রহ করে আমাকে সময় দেবেন একটু? আমার নাম মধুমালতী গুপ্ত।

আপনারা অনেকেই হয়তো আমাকে দেখেছেন। না-দেখলেও পরিচয়ের কোনো অসুবিধে নেই। বৃহস্পতি, শনি, রবি এবং যে-কোনো ছুটির দিনে কোহিনূর থিয়েটারের কাউণ্টার থেকে দু' টাকা থেকে বার টাকা পর্যন্ত যে-কোনো দামের একখানা টিকিট কেটে নির্দিষ্ট সময়ে হলে ঢুকলেই স্টেজে আমাকে দেখতে পাবেন। কোহিনূরের বর্তমান নাটকে আমিই হিরোইনের পার্ট করছি। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে আমার নামই বড় করে ছাপা হয়েছে অনেক দিন।

এই নাটকে আমি আদর্শবাদী নায়ক সুরজিতের অধ্যাপিকা স্ত্রী। সমাজের যা-কিছু অন্যায়, যা-কিছু অন্ধকার, তাই আমি প্রসন্ন হৃদয়ে দূর করতে চাই। সুরজিতের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর আমার সঙ্গে একটা প্রেমের দৃশ্য আছে। সেই লাভ সিনটা আমি খুব মন দিয়ে করি। আমার ধারণা ছিল, অভিনব ওই লাভ সিনটা দেখবার জন্যেই দর্শকদের চাপে কোহিনূর থিয়েটারের হল ভেঙে পড়ে। গতকাল আচমকা শুনলাম ম্যানেজার নরহরি কাউকে বলছে, আমার জন্যে মোটেই ভিড় হয় না। টিকিট বিক্রি হয় লিপিকার জন্যে—পাশ্চাত্ত্য নৃত্য-পটীয়সী লিপিকা সেনের জন্যে।

লিপিকার পার্টখানাও আপনাদের দেখতে অনুরোধ করি। নাটকের এক নাটকীয় অংশে আমি একটু মন-মরা হয়ে আছি। আমার জন্মদিনে আমাকে খুশী করবার জন্যে আমার ধনপতি স্বামী বাড়িতে একটু আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন। লিপিকা সেন সেইপার্টিতে ক্যাবারে নাচ নাচবে।

নারী অঙ্গের নানা ভঙ্গি দেখিয়ে লিপিকা অনেকগুলো হাত-তালি পায়—সেই সঙ্গে হলের বিভিন্ন জায়গা থেকে একই সঙ্গে সিটি বেজে ওঠে, চাপা অথচ নোংরা উত্তেজনা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু লিপিকার নাচ শেষ হবার পরেও অনেকক্ষণ নাটক থাকে। তখন আমিই সব। সুরজিতের সঙ্গে তার অধ্যাপিকা স্ত্রীর অনেক ঘটনা ঘটে, জীবন সম্বন্ধে কিছু গভীর উপলব্ধির সুযোগ দর্শকরা পেয়ে যান। বিনোদমাসীমা বলেছিলেন, রঙ্গমঞ্চ সস্তা আমোদের জায়গা নয়, এখানে বিশ্বরূপের প্রতিফলন হওয়া চাই।

তবু, আজও একটু আগে কোহিনূর থিয়েটারে শুনে এলাম—টিকিট বিক্রি যা হয় তা লিপিকা সেনের জন্যে। বক্স আপিস নাকি এখন তারই ব্রেসিয়ারে বাঁধা। (মাফ করবেন, আঁচল কথাটা ব্যবহার করবো ভেবেছিলাম, কিন্তু লিপিকা প্রায় বিবস্ত্রা হয়ে

স্টেজে হাজির হয়। তার আঁচল থাকে না।) শখ করে বীরেশ্বরবাবু খবরের কাগজের আধ-পাতা জুড়ে নৃত্যপটীয়সী লিপিকার নিম্নাঙ্গের ছবি বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন না!

আমি ভেবেছিলুম, নরহরিবাবুকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠাই এবং বীরেশ্বরবাবুর কাছে টেনে নিয়ে যাই। ওঁকে জিজ্ঞেস করি, কামনা-বাসনা নাটকের প্রথম পঞ্চাশ অভিনয় রজনীতে লিপিকা তো কোনো অংশ গ্রহণ করে নি। তখন কেন হাউসফুল হয়েছিল? মধুমালতীর অভিনয় নিয়ে শহরের সব কাগজে এখনও কেন সমালোচকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছাপা হয়?

হয়তো ভাবছেন, আমি খুব হিংসুটে, অপর এক নারীর সৌভাগ্য সহ্য করতে পারছি না—প্রথম সুযোগেই পাবলিক থিয়েটারের নোংরামি নিয়ে প্রকাশ্যে মাতামাতি করছি। বিশ্বাস করুন, এসব কিছুই ইচ্ছে নেই আমার। নীরবে চোখের জল ফেলতে ফেলতে থিয়েটারের নোংরামি আমি যত দেখেছি—তার থেকে বেশী বোধ হয় বাংলা নাট্যমঞ্চের এই একশ বছরের ইতিহাসে মাত্র আর একজন সহ্য করেছেন। আমি বিনোদিনী দাসীর কথা বলছি। নটী বিনোদিনীর অসহায় জীবনের শেষ অঙ্কে আমার সঙ্গে তাঁর খুব ভাব হয়েছিল। কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে যে-বাড়িতে বিনোদিনীর জন্ম—এখন সেখানে জয় মা কালি বোর্ডিং-হাউস—সে বাড়িটাও নিজের হাতে তিনি আমাকে দেখিয়েছেন। উত্তর কলকাতার রাজাবাগানে তাঁর শেষজীবনের আশ্রয়স্থলের পাশেই থাকতাম আমি। অকালে মরে-যাওয়া মেয়ে শকুন্তলা সম্পর্কে নিজের লেখা কবিতা আমি বিনোদিনীর নিজের মুখে শুনেছি। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা—থিয়েটারের দামী টিকিট কেটেও এই বিনোদিনীকে কেউ কোনো দিন দেখতে পায় নি।

আমার তখন কতই বা বয়েস? বার কি তেরো? বিগত-যৌবনা এবং থিয়েটারে সম্পূর্ণ বিস্মৃত বিনোদিনী তখন মৃত্যু-

পথযাত্রী। আমি থিয়েটারে ঢুকেছি শুনে বিনোদিনী বলেছিলেন, "মর ছুঁড়ী। নরকে যাবার আর জায়গা পেলি নে ?"

স্বর্গ নরক কোনো কিছুই সেই বয়সে আমার পরিচিত নয়। সত্যিকথা বলতে কি নরকের মধ্যেই আমার জন্ম—আমার মা সুহাসিনীও এই সিনেমা-থিয়েটার লাইনে ছিলেন। বিনোদমাসীর কথায় রেগে গিয়ে আমার মা বলেছিলেন, "ওই ডাইনী বুড়ীর বাড়িতে তুই একদম যাবি না। যখন বয়েস ছিল, তখন সারা কলকেতা শহরকে কড়ে আঙুলে নাচিয়েছে, এখন বাহাত্তর বছর বয়সে মাগী, মা সারদামণির পাটে নামতে চায় !"

নটী বিনোদিনীর মৃত্যুদিনটা আজও আমার মনে আছে। বাহাত্তর নয়, আটাত্তর বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন বিনোদিনী দাসী। ১৯৪১ সালের কোনো একটা তারিখ হবে, আমার ঠিক মনে নেই। আমি দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম ; আমার চোখের সামনেই নিরাভরণ খাটে চড়ে, সকলের অলক্ষ্যে প্রায় নিঃশব্দে রঙ্গরঙ্গালয়ের মুকুটহীন সম্রাজ্ঞী নিমতলা ঘাটে চলে গেলেন। একদিন যাঁর কৃপাদৃষ্টির জন্যে কলকাতার রূপমুগ্ধ ধনপতিরা লক্ষমুদ্রা ব্যয় করতে রাজী ছিলেন, সেদিন রাজপথের কেউ তাঁর দিকে তাকিয়েও দেখলো না।

আমার সম্বন্ধে বিনোদিনী বলেছিলেন, "সুহাসিনী জেনে-শুনে মেয়েটার সব্বোনাশ করলো। এর থেকে মালতীকে কলসী ও দড়ি কিনে দিলো না কেন ? কচি মেয়েটা কাশী মিত্তিরের বাঁধানো ঘাট দিয়ে হেঁটে গিয়ে গঙ্গায় ডুবে মরতো।"

আমি তখন ওসব কথার তাৎপর্য কিছুই বুঝি নি। মাঝে মাঝে রূপবাণী সিনেমার পাশের রাস্তা রাজাবাগানে বিনোদমাসীর নিজের বাড়ির ছাদে উঠে খেলা করতাম। আমারও মাসী, আবার ডাকসাইটে অভিনেত্রী তারাসুন্দরী যখন আসতেন, তিনিও ডাকতেন মাসী। বিনোদমাসীর ঘরে গিয়েছি কতবার। শোবার

ঘরে উঁচু পালঙ্ক, তাতে মই লাগানো। অনেক ফটো ও রঙীন ছবিও ঝুলতো দেওয়াল থেকে। সে-বয়সেও আপন মনে অর্গান বাজিয়ে গান গাইতেন। রং আমার থেকে অনেক কালই ছিল। গহনা পরতেন কানে, গলায়, হাতে, কোমরে। সর্বদা চটি পরতেন। বাড়িতে পুজোপাঠ লেগেই ছিল। রাগ হলে হাঁক দিয়ে গাল পাড়তেন। আমাকেও একদিন বলেছিলেন, "দেখিস ছুঁড়ী, থিয়েটারে জড়িয়ে পড়ে জীবনটা নষ্ট করিস না।"

জালে জড়িয়ে পড়ে জীবনটা নষ্ট করলাম কিনা তার হিসেব-নিকেশ শেষ হতে এখনও কিছুদিন লাগবে। ওসব হিসেবপত্তরে এখন আমার মন বসছে না। এখন আমি ওঁর জন্যে অপেক্ষা করছি।

রাজাবাগান থেকে বেরিয়ে, অভিজ্ঞতার অনেক নোংরা নর্দমা এবং বাঁকাচোরা গলি পেরিয়ে এখন আমি বাগবাজারের এই কেষ্টদাস কুণ্ডু স্ট্রীটে হাজির হয়েছি। ট্রামরাস্তা থেকে বেরিয়ে আমাদের রাস্তাটা ক্রমশ সরু হয়ে গিয়েছে, কিন্তু একখানা মোটর ঢোকবার মতো ব্যবস্থা আছে।

ঘড়িতে এখন রাত দশটা। কি আশ্চর্য এই দেহসর্বস্ব জীবন! যিনি একদিন শুধু আমাকে দূর থেকে চোখের দেখা দেখবার জন্যে দিনের পর দিন থিয়েটারের টিকিট কেটে সামনের সারিতে বসে থাকতেন, আমার সঙ্গে একবার একান্তে কথা বলবার জন্যে ধনুর্ভাঙা পণ করে বসেছিলেন, আজ তাঁর কোনো উৎসাহ নেই—এই রাত্রে আমিই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছি। আমি তাঁকে চিঠি লিখেছি—কিন্তু তিনি এখনও কোনো খবরও পাঠান নি।

আমার মা তখনও বেঁচেছিলেন, বীরেশ্বরবাবুকে দেখে প্রথম দিনেই তিনি বলেছিলেন, "মধু, লোকটা ভাল হবে মনে হচ্ছে না। মেয়েমানুষের গতর যতক্ষণ আছে ততক্ষণ মৌমাছির অভাব হয় না। সময় থাকতে থাকতে গুছিয়ে নে তুই—এমন মানুষ দেখ যে

তোকে বিনোদমাসীর ছোটকর্তা সিংহীমহাশয়ের মতো অসুখে-বিসুখে বিপদে-আপদে ত্যাগ করবে না।"

আমি কোনো উত্তর দিই নি! আমি তখন অন্য স্বপ্নে মশগুল। যাত্রা-থিয়েটারের অভিনেত্রীদের কত রকমের খেয়াল থাকে। বিনোদিনী মাসীর 'আমার কথা' আমি মন দিয়ে পড়েছি—কত সহজে নিজেকে পতিতা বারাঙ্গনা ইত্যাদি বলে বর্ণনা করে অভিনেত্রী বিনোদিনীকে তিনি নিচু করেছেন। বিনোদিনী মাসীর পরে দীর্ঘ দিন ধরে বাংলা স্টেজের ওপর দিয়ে কত মানুষের বিচিত্র শোভাযাত্রা পেরিয়ে গেলো। বারাঙ্গনা, পতিতা ইত্যাদি কথায় এখন মানায় না—আমার গা ঘিনঘিন করে ওঠে।

এই যে রাত দশটার সময় আলো জ্বেলে আমি বীরেশ্বরবাবুর জন্যে বসে আছি তা অর্থের জন্যে নয়। ওঁর জন্যে রান্নাও করে রাখতে বলেছি অমূল্যদিকে। আমি নিজেও ফুলকপির বাটি-চচ্চড়ি রেঁধেছি—আমার এই রান্নাটা উনি পছন্দ করেন। অথচ দেখুন, আমি জানিই না, কেষ্ট দাস কুণ্ডু স্ট্রীটে আজ তাঁর পায়ের ধুলো পড়বে কিনা।

আমি তখন থিয়েটার পাড়ায় কিছুটা নাম করেছি। বড় পার্টের লোভে রঙমহল, স্টার, মিনার্ভা এবং আরও কয়েকটা রঙ্গালয় ঘুরে আমি যোগ দিয়েছি আজকের কোহিনূরে। কী পবিত্র নাম এই কোহিনূর। সে-যুগের অনন্য কীর্তিমানরা একদিন এই স্টেজে অভিনয় করে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন। নাট্যকার অধর চাটুজ্যে আমাকে অন্য থিয়েটার থেকে ভাঙিয়ে এখানে এনেছিলেন। ওখানে যা মাইনে পেতাম, তার থেকে পঁচিশ টাকা কমেই আমি কোহিনূরে চলে এসেছিলাম। প্রথম পরিচয়ের পরেই অধর চাটুজ্যে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "মধু, তুই কী চাস? টাকার বাণ্ডিল, না অভিনয়ে সুনাম?"

অধরবাবুর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। ওঁর কাছে

অভিনয়জগতের অনেক কিছু শিখেছি। এক বইতে আমার ডবল রোল ছিল—আমি একবার ভদ্রঘরের বধূ, আর একবার বারাঙ্গনা। পতিতাজীবনের অনেক কিছু আমি নিজের চোখে দেখেছি; আর ভদ্রঘরের বধূ হবার স্বপ্নই তো আমার চোখে সারক্ষণ লেগেছিল। অধরবাবু আমাকে কত সহজে দু'জনের পার্থক্য বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, "কুলললনাদের মুখে হাসি থাকবে, কিন্তু বাইরের লোক তা জানতে পারবে না। বারাঙ্গনার কাছে হাসি হচ্ছে কামদেবের ধনু—এই অস্ত্র ভরসা করে বারবার তাকে পুরুষমৃগয়ায় বার হতে হবে।" অধরবাবুর উপদেশ মতো আয়নার সামনে আমি এক সপ্তাহ বিভিন্ন হাসির মহড়া দিয়েছিলাম।

যা হোক, অধরবাবু যখন জিজ্ঞেস করলেন, তুই কী চাস, আমি বললাম, "টাকার বাণ্ডিল তো অন্য পথেও রোজগার করা যায়। থিয়েটারপাড়ার কত মেয়েই তো অভিনয়ের অ-আ-ক-খ না শিখেও শুধু দেহ খাটিয়ে বাবুদের কৃপায় বাড়ি-গাড়ির মালিক হয়েছে। টাকায় রুচি নেই আমার, আমি অভিনয়ের সুযোগ চাই।"

অধর চাটুজ্যে আমাকে তখন হরেন নিয়োগীর কোহিনূর থিয়েটারে নিয়ে এলেন। অধর চাটুজ্যে চুপি চুপি বললেন, "দেখ্ না, আরও কী কী হয়। বিরাট-বিরাট স্বপ্ন আছে এই হরেন নিয়োগীর চোখে। অতি অমায়িক এবং সাত্ত্বিক লোক। মদ, মেয়েমানুষ কিছুর দোষ নেই ভদ্রলোকের। শিশির ভাদুড়িও আমাদের দলে যোগ দিলেন বলে।"

ভাদুড়ি মশায়ের নাম শুনে আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। কতবার তাঁর অভিনয় দেখে সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়েছে। বাড়ি ফিরে এসে সারারাত ঘুমোতে পারি নি। বিনোদমাসীর কাছে শুনেছি, গিরিশ ঘোষের ঐ ঐশ্বরিক ক্ষমতা ছিল। থিয়েটার ছাড়বার পঞ্চাশ বছর পরেও গিরিশ ঘোষের কথা বলতে গিয়ে বিনোদমাসীমা শ্রদ্ধা-ভক্তিতে কেমন হয়ে

যেতেন। আমিও ভাদুড়ি মশায়ের সঙ্গে অভিনয় করবো, এই আহ্লাদেই সাত-পাঁচ না ভেবে চলে এলাম কোহিনূর থিয়েটারে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। শিশির ভাদুড়ি শেষ পর্যন্ত এখানে এলেন না। উনি আসছেন আসছেন করতে করতে একটা বছর কেটে গেল। নাট্যাচার্যের খুব কাছে আসবার সৌভাগ্য না হলেও কোহিনূর থিয়েটারে বড় পার্টের সুযোগ পেলুম। অধরবাবুর লেখা নতুন নাটকে, আমাকে অথর-ব্যাকিং চরিত্র দেওয়া হলো।

অথর-ব্যাকিং জানেন তো? সংসারে সংখ্যাহীন লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার মধ্যে ঈশ্বর যেমন মাত্র কয়েকজনকে সামনের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন, তেমনি নাট্যকার—যিনি নাটকের সমস্ত চরিত্রের ঈশ্বর—তিনি মাত্র কয়েকজনের ভালবাসায় পড়ে যান। প্রকাশ্যে এবং গোপনে দু'একটি চরিত্রের ওপরেই তিনি সমস্ত ভালবাসা উজাড় করে দেন, অলক্ষ্যে সর্বদা তাদের পিছনে থাকেন।

অধর আমার গুরুর মতন। সেসময় তিনি বলতেন, "মধু, তুই দু'চারখানা বই পড়। বড় বড় লেখকের উপন্যাস পড়লে তোর বিশ্বরূপ দর্শন হবে। তারপর মানুষকে দেখ—তারা কিভাবে হাঁটে, চলে, হাসে, কাঁদে সব লক্ষ্য কর—এবং মনে রাখ।"

আমি বলতাম, "অধরদা, তুমি পথ দেখিয়ে দাও।"

নাট্যজগতের নেশায় পাগল অধর ভাবে বিভোর হয়ে চোখ বুজে বলতেন, "নাট্যচরিত্রের সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যাবি। তোর যেন আলাদা অস্তিত্ব নেই। শুধু স্টেজে নয়, বাইরে এসেও ভাববি, তুই নিজেই ওই চরিত্র। জানিস তো, বিনোদিনী দাসী স্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা নাটকে চৈতন্যের অভিনয় করতে করতে গ্রীনরুমে এসে ভাবের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে যেতেন?"

এত জানেন অধরবাবু, তবু বেচারা কখনও খ্যাতনামা হতে পারলেন না। সাফল্যের কথা তুললে অধর আজও হাসেন।

বলেন, "মায়ের ইচ্ছে নয়। ভাগ্যলক্ষ্মীর রাঙা চরণ সবাই কী স্পর্শ করতে পারে?" এরপর দুঃখ ভুলবার জন্যে অধর চাটুজ্যে গুনগুন করে গান ধরতেন :

"কত রঙ্গ জানো তুমি কালী গো!
কারও দুধে চিনি দাও মা, কারও শাকে বালি গো।"

অধরবাবুর লেখা পরপর কয়েকটা বইতে আমি প্রাণ ঢেলে অভিনয় করলাম।

অনেক প্রার্থনার পরে ঈশ্বরের আশীর্বাদে মধুমালতী এবার নায়িকা হয়ে উঠছে, বুঝলাম। থিয়েটারের মালিক হরেন নিয়োগী অতিশয় ভদ্রলোক। তিনি নিজে থেকে আমার মাইনে পঁচিশ টাকা বাড়িয়ে দিলেন। আপিসঘরে আমাকে ডেকে বললেন, "মধু, আমার স্ত্রী বলছিল, যার যা প্রাপ্য তাকে তা না দেওয়া এক ধরনের চুরি।"

আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়েছিলাম। আশীর্বাদ করে হরেনবাবু বলেছিলেন, "এ-লাইনে আমি বড়লোক হতে চাই না। আমি চাই তোমাদের সকলের খুব নাম হোক। অলীক কুনাট্যরঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে—নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।"

অধর চাটুজ্যে আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন। তিনি বললেন, "মধু এবার তোকে মনে রেখেই নতুন নাটক লিখছি—রাজা-রাণী। তুই এখন থেকে তৈরি হ। রাজনটী রাগমালার অভিনয় তোকে করতে হবে।"

সেকালের কাহিনী। নবদ্বীপের টোল থেকে অধরবাবু আমার শিক্ষার জন্যে পণ্ডিত নিয়ে এলেন। বললেন, "শিখছিস যখন তখন একেবারে গোড়া থেকে শেখ।"

কত মন দিয়ে শিখেছিলাম তখন। ওই যে আয়নাটা রয়েছে, ওখানেই আমি পাঠ নিতাম। অধর বলতেন, "তাহলেই বুঝছিস—হাসি কত রকমের হয়। দেখা তো একটা স্মিতহাস্য।"

আমার মুখের ভাব দেখে অধর সস্নেহে বলতেন, "হলো না।

ওই যে পণ্ডিতমশায় পড়ালেন, যে-হাস্যে নয়ন সামান্য বিকশিত এবং অধর অল্প স্পন্দিত তার নাম স্মিতহাস্য। তোর হাসিতে দন্তশ্রেণী সামান্য দেখা গেলো, ওর নাম তো হসিত।"

শতসহস্রবার চেষ্টা করে আমি শিখেছি, কেমন করে হাসির সঙ্গে মনোহর স্বর বার করতে হয়, যার নাম বিহসিত। বিহসিত থেকে মুহূর্তে আমি অপহসিত দেখাতে পারি। এই দেখুন : প্রিয় দর্শনে আমি হাসছি। আমার ঘাড় ও মাথা কম্পিত হচ্ছে। এই দেখুন, মুহূর্ত মধ্যে আমি অপহসিতা—আমার নয়ন অশ্রুপূর্ণ।

রাজনটী রাগমালা যখন রাজা-রাণী নাটকে নামলো তখন পুরুষের মনোহরণের নানা রহস্য তার আয়ত্তে। লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিকৃত—পুরুষ আকর্ষণের এই দশটা স্বভাবজ ভাব আমি বহুদিনের সাধনায় আয়ত্ত করেছি।

নাটকের তৃতীয় দৃশ্য অধরবাবু বিভ্রম দিয়ে শুরু করেছিলেন। অধরবাবু আমাকে বুঝিয়েছিলেন—"প্রিয়সমাগমে প্রথমেই স্ত্রীলোকের বাক্যে এবং ব্যবহারে যে শৃঙ্গারভাব প্রকট হয়, তাই ফুটিয়ে তুলবি। অত্যন্ত আসক্তির জন্যে তোর ব্যবহারে যুগপৎ ক্রোধ ও হর্ষ ফুটে উঠবে। কেশ-বিন্যাসের জন্যে সখীর কাছে কুসুম চাইবি এবং পাওয়া মাত্র তা বর্জন করবি।"

এই অভিনয়ই আমার এবং হরেন নিয়োগীর কাল হলো। শুনলাম, "একজন লোক প্রায় প্রতি শোতে আমার অভিনয় দেখতে আসে।"

হলের কর্মচারী রামু ছুতো করে একদিন দুটো লোককে আমার গ্রীনরুমে এনেছিল। আমি নাকি ওদের ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ওদের তখন বিদায় করতে পারলে বাঁচি। আমি তখন ক্লান্ত, বিরতির ঠিক পরেই রাজনটী রাগমালার কয়েকটা শক্ত কাজ ছিল, সেইগুলো মনে মনে ভাঁজছি।

থিয়েটারে তখন মন্দ ভিড় হচ্ছে না। কিন্তু আদর্শবাদী হরেন নিয়োগী প্রায়ই জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা অবশ্যই আর্ট সৃষ্টি করো। আর্টের ওপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে দেশের জন্যে কী করছি আমরা ? এই বিরাট দেশের কোটি কোটি অসহায় মানুষকে নতুন জীবনের আলোকে নিয়ে যাবার একটা দায়িত্বও তো আছে আমাদের ?"

হরেন নিয়োগী একদিন বললেন, "মধু, একটা অসভ্য লোক সেদিন আমাকে বলছিল, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে। লোকটার নাকি অনেক টাকা। আমি অবশ্য তাকে যা বলবার বলেছি। দেশটার হলো কি ? স্বাধীন হবার পরেও, টাকার জোরটাই জোর রয়ে গেলো !"

চিঠি পাঠিয়ে মধুমালতী যার জন্যে অপেক্ষা করছে তিনি এখন রাস্তায়। ড্রাইভার দুঃখহরণ বীরেশ্বর রক্ষিতের গাড়িটা শোভা-বাজারের কাছে এনে ফেলেছে। সামনের সীটের ওপর ভারী পা দুটো তুলে দিয়ে বীরেশ্বর ইতিমধ্যে তাঁর জীবনের আর একটা দৃশ্য চোখ বুজে দেখতে শুরু করেছেন।

রাজা-রাণী নাটক দেখবার জন্যে নেদো মল্লিক যথাসময়ে সেজেগুজে বীরেশ্বরের সিমেণ্ট কোম্পানিতে হাজির হয়েছিলেন।

আশ্চর্য লোক এই নেদো মল্লিক। পুলিসের সঙ্গে গোপন সম্পর্ক যথাসময়ে চুকিয়ে দিয়েছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য, শেয়ার বাজার থেকে টু-পাইস কামিয়ে কর্মজীবন থেকেও নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নিয়েছেন। সমস্ত টাকা ব্যাংকে ফিকসড ডিপোজিট রেখে

নেদো মল্লিক এখন জীবন উপভোগে মন দিয়েছেন। নেদো মল্লিক বললেন, "সমস্ত দিন যা-খুশি করি - গল্পের বই পড়ি, গান শুনি, তামাক খাই, বাগান করি! কোনোদিন টোটো করে কলকাতা শহর ঘুরে বেড়াই। বিকেলে সিনেমা-থিয়েটার দেখি, তারপর সন্ধ্যে সাড়ে-আটটা নাগাদ আধ বোতল হুইস্কি নিয়ে আহ্নিকে বসি। আজকাল বার-এ যাই না—নিজের ঘরে, নিজের আসনে বসে হুইস্কির বংশ নির্বংশ করতে বেশী ভাল লাগে।"

রীতিমত সাজগোজ করে নেদো মল্লিকের সঙ্গে কোহিনূর থিয়েটারের সামনে এসেও বীরেশ্বর বুঝতে পারেন নি যে তাঁর জীবন-নাটকের আর একটা অঙ্ক আরম্ভ হতে চলেছে। এবারেও শুরুটা বেশ মজার। একেবারে সামনের সারিতে ছয় আর সাত নম্বর সীটে বসে আছেন তাঁরা দু'জনে। রাজা-রাণী নাটকের প্রোগ্রাম বইয়ের দিকে তাকিয়ে নাট্যরসিক নেদো মল্লিক বলছেন, "শুনেছি মধুমালতী ফাটিয়েছে এই বইতে।"

বীরেশ্বর আন্দাজ করলেন, "মধুমালতী নিশ্চয় রাণীর পার্ট করছে।"

"তোমার যেমন বুদ্ধি!" বকুনি লাগালেন নেদো. মল্লিক। "রাজা-রাণী বইতে রাণীর পার্ট করে কী পাবলিকের মনে দাগ কাটা যায়? মধুমালতী হচ্ছে রাজনটী। লেখাপড়া তো করলে না! শোনো নি রবি ঠাকুরের কোটেশন: নগরীর নটী চলে অভিসারে যৌবন মদে মত্তা।"

বীরেশ্বর একটু চটে উঠলেন। ভেবেছে কি নেদো মল্লিক? সিমেণ্ট এবং শেয়ারে মজে থাকলেও বীরেশ্বর এক সময় শখের থিয়েটারে রাজা সেজেছেন।

ঠিক এই সময় দু'জন পাবলিককে নিয়ে এসে থিয়েটারের এক চিমড়ে কর্মচারী ওদের বললো, "আপনারা এই সীট দুটো ছাড়ুন।"

ছাড়াছাড়ির মধ্যে নেই বীরেশ্বর। বীরেশ্বর রেগে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন ছাড়বো ?"

লোকটা বিব্রত হয়ে বললো, "এঁরা মধুমালতীর গেস্ট। দেখুন না, ছয় এবং সাত নম্বর সীট এদের জন্যে রিজার্ভ রয়েছে।"

নেদো মল্লিকের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে নিজেদের টিকিটের কাউণ্টারফয়েল দেখালেন বীরেশ্বর। চিমড়ে লোকটা জিভ কেটে বললো, "সর্বনাশ, একই সীট নম্বরে দু'বার টিকিট ইস্যু হয়ে গেছে।"

লোকটা ভেবেছিল, আর্টিস্টের গেস্টকে সীট দুটো ছেড়ে দিয়ে বীরেশ্বর অন্য সীটে সরে যাবেন। কিন্তু সে-পাত্রই নন বীরেশ্বর রক্ষিত। শেষ পর্যন্ত অতিথিরা পিছনের সারিতে চলে গেলো।

শো আরম্ভ হলো। রাজা সেজেছে ফণী মজুমদার এবং রাণী—সুদেষ্ণা রায়। কিন্তু যে-মুহূর্তে রাজনটী মধুমালতী মঞ্চে নামলেন, সব যেন পাল্টে গেলো। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। রাজনটী রাগমালার রূপের আগুনে দগ্ধ হচ্ছেন সভাসদরা। হাস্যে লাস্যে সঙ্গীতে, মধুর বচনে, দেহলতা আন্দোলনে রাজনটী মধুমালতী সকলের মনোহরণ করলো। রাজনটীর দেহের রঙ সোনার মতো—সেকালের ঐতিহ্য অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত বেশ-বাস করেছে মধুমালতী। মাথার খোঁপাটি পর্যন্ত কী সুন্দর মানিয়েছে ওই দীর্ঘ দেহে।

নেদো মল্লিক বললেন, "খোঁপা নয়—নাম কবরী।"

সুদেহিনী রাজনটী এবার গুপ্তগৃহে প্রণয়ীর সঙ্গে নিভৃত সাক্ষাতে এসেছে। নেদো বললেন, "বিউটিফুল। মালতীর হাব লক্ষ্য করো।"

"হাব আবার কী ?" বীরেশ্বর কথাটা এই প্রথম শুনলেন।

বেশ চটে উঠলেন নেদো মল্লিক। "আমি কাঠ-ব্যাচেলর হয়ে হাব কাকে বলে জানি, আর তুমি প্রেম করে বউ এনেও হাব চেনো না, বীরেশ্বর। এদ্দিন ধরে শুধু টাটা আয়রন আর বেঙ্গল কোল চিনলে—তোমার কপালে অনন্ত দুর্গতি আছে।"

বীরেশ্বর সত্যিই একটু লজ্জা পেয়ে গেলেন। নেদো এবার ব্যাখ্যা করলেন, "আহ্বান থেকে হাব। রাজনটীর মুখের দিকে একটু নজর রাখো—ভ্রূ-নেত্রর চাঞ্চল্য দিয়ে সেকালের সুন্দরীরা কীভাবে সম্ভোগ ইচ্ছা প্রকাশ করতো দেখো। আজকালকার মেয়েরা এসব আর্ট জানেই না।"

সম্ভোগ! কথাটা ভারী সুন্দর লাগছে বীরেশ্বরের। কোনো রকম অশ্লীলতা নেই, অথচ পুরুষ ও নারীর আদিম অনুভূতি সুন্দর-ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। বিমোহিত বীরেশ্বর মধুমালতীর দেহবল্লরী ও ভ্রূ-নেত্রর চাঞ্চল্য গভীর মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করছেন।

নেদো মল্লিক ফিসফিস করে বীরেশ্বরকে বললেন, "মেয়েমানুষ সম্বন্ধে হেম বাঁড়ুজ্যের ডায়ালগ শোনো নি?—জানে যদি ভাল মত হাব ভাব হাস নিকটে রাখিব তারে।"

ইণ্টারভ্যালের সময় গোলমালটা পাকিয়ে উঠলো। থিয়েটারের একটা বেয়ারা এসে বীরেশ্বরকে বললো, "আপনারা একবার গ্রীনরুমে চলুন।"

গ্রীনরুম থেকে নেমন্তন্ন! অপ্রত্যাশিত আনন্দ অনুভব করলেন বীরেশ্বর। লোকটা বললো, "মধুমালতী আপনাদের ডাকছেন।"

সেই প্রথম কোহিনূর থিয়েটারের ব্যাকস্টেজ দেখলেন বীরেশ্বর রক্ষিত। একটা পুরনো দরজার সামনে লেখা "বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ।"

অবশ্যই বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করছেন না বীরেশ্বর রক্ষিত, সুন্দরী নায়িকা স্বয়ং ডেকে পাঠিয়েছেন। ভিতরে টিমটিম করে কম ওয়াটের ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছে—কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। দু'খানা বেঞ্চির ওপরে কয়েকজন মাইনর অভিনেতা রঙ-চঙ মাখা অবস্থায় ভাঁড়ে চা খাচ্ছে। আর স্বয়ং রাজা মাথার মুকুট পাশে খুলে রেখে তাদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছেন। আশেপাশে অনেকগুলো ছোট ছোট ঘর রয়েছে। আড়চোখে একখানা ঘরের

মধ্যে ছোট্ট খাটিয়া, একটা ইজি-চেয়ার এবং মস্ত আয়না দেখতে পেলেন বীরেশ্বর।

লোকটার পিছন পিছন আলিগলি পেরিয়ে ওঁরা দুজন একটা বন্ধ ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সামনে ঝি বসেছিল। সে ভিতরে মধুমালতীকে খবর দিতে গেলো। তারপর বেরিয়ে এসে বললো, "আপনারা ভিতরে আসুন।"

রাজা-রাণী নাটকের রূপসী রাজনটী ডিভানে ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিয়ে আধ-শোয়া অবস্থায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। রাজনটীর স্বল্প বেশবাশের ওপর একটা আলখাল্লা জড়িয়ে নিয়েছিল মধুমালতী। প্রথম দর্শনটা ঠিক মিশর সুন্দরী ক্লিয়োপেট্রার মতো। ওর টিকলো নাকের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন বীরেশ্বর রক্ষিত। দৃষ্টিটা পিছলে গিয়ে এবার পরিপুষ্ট বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

অপরিচিতদের দেখে এবার চমকে উঠলো বিশ্রামরতা সুন্দরী। দেহের গাউনটা সামলে নিয়ে তড়াং করে উঠে মধুমালতী জানতে চাইলো, "এরা কারা?"

সঙ্গের কর্মচারী বললো, "মালতীদি, ছ'নম্বর এবং সাত নম্বর সীট থেকে এঁদেরই তো আপনি ডেকে আনতে বললেন, আপনার গেস্ট।"

রূপসী নটী এবার ভ্রূধনু ভঙ্গ করে বীরেশ্বরকে বললো, "আপনাকে চাই নি আমি, ভুল হয়ে গিয়েছে।"

থিয়েটারের সীটে ফিরে এসেও বীরেশ্বর সুন্দরী মধুমালতীর সেই ভ্রূ-ভঙ্গিমা ভুলতে পারছেন না। চোখের এই বিশেষ চাহনির অর্থ কি বীরেশ্বর জানতে চান।

"এর নাম ভ্রান্তিবিলাস—কমেডি অফ এরর! টিকিট নম্বরের ভুল থেকে নটী মধুমালতীর সঙ্গে গুপ্তগৃহে তোমার দেখা হয়ে গেলো," নেদো মল্লিক ফোড়ন কাটলেন।

বীরেশ্বর অধৈর্য হয়ে বললেন, "যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দাও।"

বীরেশ্বরের মানসিক পরিবতন লক্ষ্য করে নেদো মল্লিক তুষ্ট হাসলেন। বললেন, "আমি তো আর মেয়েদের চোখের ডাক্তার নই! বড় ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট ব্রাদার। যৌবনকালে স্ত্রীলোকদের সত্ত্বগুণ থেকে আঠাশ রকমের ভাব উৎপন্ন হয়—তাদের নাম অলঙ্কার। তার মধ্যে তিনটি হচ্ছে অঙ্গজ অলঙ্কার হাব, ভাব ও হেলা। তুমি তো একটি মেয়ের সঙ্গে টোয়েন্টি-ফোর আওয়ারস ঘর করছো, হাবের অ্যানাটমি তোমারই তো জানা উচিত।"

বীরেশ্বর বলতে গেলেন, "ঘরে যে-মেয়েটি আছে সে একেবারে গেরস্ত—বশীকরণের অত কারুকার্য তার জানা নেই।" কিন্তু আবার শো আরম্ভ হয়ে গেলো। বীরেশ্বর অপেক্ষা করতে লাগলেন, কখন আবার রাজনটী রাগমালা তার বিপুল দৈহিক ঐশ্বর্য নিয়ে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হবে। নেদো মল্লিক ততক্ষণে বীরেশ্বরের মানসিক অবস্থা আন্দাজ করতে আরম্ভ করেছেন।

কাজকর্মে মন বসাতে পারছেন না বীরেশ্বর। সিমেন্টের গোডাউনে বসেও রাজনটীর মুখটি প্রায়ই দেখতে পাচ্ছেন। সপ্তাহ শেষ হবার আগেই বীরেশ্বর হাজির হলেন নেদো মল্লিকের বাড়িতে। নেদো মল্লিক বয়সে অনেক বড়ো—তবু বীরেশ্বর ওঁর কাছে কোনো সঙ্কোচ অনুভব করেন না। নিজের মনের মধ্যে যে লোমশ আদিম পশুটি রয়েছে তাকে খুলে দেখাতে একটুও অস্বস্তি লাগে না বীরেশ্বরের। দু একটা মামুলি কথাবার্তার পরে বীরেশ্বর বললেন, "রাজা-রাণী আর একবার দেখতে পারলে মন্দ হতো না।"

"তথাস্তু।" মিটমিট করে হেসে নেদো মল্লিক জানিয়ে দিলেন, "ওই রকম একটা স্পেকুলেশন করেই তো আগাম থিয়েটারের টিকিট কেটে রেখেছি।"

একদিন নয়, দু'দিন নয়, পর পর চারদিন মায়াবিনী মধুমালতীকে রঙ্গমঞ্চের রঙীন আলোকে দেখলেন বীরেশ্বর রক্ষিত।

নতুন একটা বাসনা বীরেশ্বরকে ক্রমশ গ্রাস করছে। মধুমালতীর সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে মনটা প্রায়ই ছটফট করছে। প্রথমে একটু সঙ্কোচ লাগছিল। অজানা-অচেনা পুরুষমানুষের সঙ্গে সুন্দরী অভিনেত্রী কেন বন্ধুত্ব করতে যাবে? কিন্তু বীরেশ্বর ক্রমশ দ্বিধা কাটিয়ে উঠেছেন। নিজের মনেই তিনি বলেছেন, "হয়ার দেয়ার ইজ-এ উইল দেয়ার ইজ-এ ওয়ে! মধুমালতী আমি তোমার সঙ্গে পরিচিত হবোই।"

এ-ব্যাপারেও নেদো মল্লিক সহায় হয়েছিলেন। বীরেশ্বরের মনের কথাটি শুনে একগাল হেসে বলেছিলেন, "সাধ-আহ্লাদ যা হবে সোজাসুজি বলবে তো? একটু ঝেড়ে না কাশলে আমি বুঝবো কী করে?"

কেষ্ট কুণ্ডু স্ট্রীটের একটা বাড়ির সামনে ড্রাইভার একটু জোরে ব্রেক কষলো। সামান্য সেই ঝাঁকানিতেই বীরেশ্বর রক্ষিতের অতীত পরিক্রমা বন্ধ হলো। তিনি চোখ খুললেন।

চোখ খুলেই বাড়িটা ভালো করে দেখলেন বীরেশ্বর—একটা চাপা হাসি মুখে ভেসে ওঠবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তাকে আশকারা দিলেন না তিনি। এবার বীরেশ্বর ওপরে উঠে গেলেন। একটা নেপালী দারোয়ান তাঁকে দেখে ব্যস্ত হয়ে স্যালুট করলো।

ক্রিং। কেষ্ট কুণ্ডু স্ট্রীটের বাড়িতে বেল বাজালেন বীরেশ্বর রক্ষিত। বোতাম টেপার একটা বিশিষ্ট স্টাইল আছে বীরেশ্বরের —এই আওয়াজ শুনলেই মধুমালতী বুঝতে পারবে কে এসেছেন।

মধুমালতী নিজেই দরজা খুলে দিলো। ঠিক যেন নাটকের এক নতুন দৃশ্যের শুরু। যৌবনবতী নায়িকা যেন প্রিয়জনের অপেক্ষাতেই নিজের দেহটিকে যথাসম্ভব সাজিয়ে বিরহযামিনীর মুহূর্ত গুণছিল।

বারান্দার কাছে পায়ের জুতো খুলে রাখলেন বীরেশ্বর। মধু-মালতীর ঘরদোর এত পরিষ্কার যে জুতো পরে ঢুকতে বীরেশ্বরের সঙ্কোচ হয়। শ্যামার সঙ্গে এইখানেই মধুর পার্থক্য। শ্যামার সংসার ছাড়া কোনো কাজ নেই, ঝি-চাকরও আছে কয়েকগণ্ডা। মধুর বাড়িতে লোক বলতে অমূল্যদি। মধুর বাইরের জীবন রয়েছে —সপ্তাহে তিন দিন শো আছে, ছুটির দিনে বাড়তি দুটো শো। তবু মধুর বাড়িতে এলে বারেশ্বরের মনে হয় এই সংসারের কর্ত্রীর ঘরদোর গুছনো ছাড়া আর কোনো কাজ নেই।

ঘরে ঢুকে মধুমালতী যত্ন করে বারেশ্বরের পাঞ্জাবি খুলে নিলো। এক মিনিটের জন্য মাথার ওপর ফ্যান চালিয়ে দিলো। জিজ্ঞেস করলো, "কেমন আছেন ? বাড়ির সব খবর ভালো তো ?"

মধুর এই একটা পরম গুণ। বীরেশ্বরের কখনও মনে হয় না তিনি রক্ষিতার সঙ্গে রাত্রিযাপনের জন্য এসেছেন। ঠিক যেন কোনো আত্মীয়গৃহে এসেছেন, মনে হয় বীরেশ্বরের।

বীরেশ্বর বললেন, "সব খবরই মোটামুটি ভালো। শুধু শেয়ার মার্কেট ছাড়া। গেস্টকীন এবং বেঙ্গল কোল যে কেন ঝপ করে এক টাকা নেমে গেলো তা বোঝা যাচ্ছে না। অথচ ভিতরের খবর কোম্পানির ওয়ার্কিং খুব ভালো।"

শেয়ার-বাজারের চিন্তা থেকে বীরেশ্বরকে দূরে সরিয়ে আনবার চেষ্টা করে মধুমালতী বললো, "সারাদিন এইসব ভাবেন বলেই তো শরীর খারাপ হয়।"

বীরেশ্বর হাসলেন। একটা পাতলা এণ্ডির চাদর এনে বীরেশ্বরের উর্ধ্বাঙ্গ জড়িয়ে দিয়ে মধুমালতী জিজ্ঞেস করলো, "আজ বেলের শরবত খেয়েছেন তো?"

বীরেশ্বর ভাবলেন, "কী আশ্চর্য এই মেয়েমানুষের জাত! শ্যামা, মধুমালতী সবাই বেলের শরবতের খবর জিজ্ঞেস করছে। শুধু একজন ছাড়া। লিপিকা এখনও তাকে জিজ্ঞেস করে না, তিনি বেলের শরবত খেয়েছেন কিনা।"

মধুমালতীর অভিনয়জীবনের নানা ছবি ঘরের চারদিকে টাঙানো আছে। বিভিন্ন সময়ে তোলা, বিভিন্ন ফ্রেমে বাঁধানো। বীরেশ্বর বললেন, "মধু, এগুলো সব একই ডিজাইনের ফ্রেমে বাঁধিয়ে ফেলো। দেখতে ভালো হবে।"

"আপনি হুকুম করলে করতে হবে। কিন্তু জীবনের সব ফ্রেম তো এক নয়।" মধুমালতীর স্বরে যে চাপা বেদনা মিশ্রিত রয়েছে তা বীরেশ্বর লক্ষ্য করলেন না। মানুষের কোনো সূক্ষ্ম অনুভূতি নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতে পারেন না।

মধু জিজ্ঞেস করলো, "স্নান সারবেন নাকি? তাহলে হীটারে একটু গরম জল বসাই।"

থিয়েটার থেকেই স্নান সেরে বেরিয়েছেন বীরেশ্বর। বীরেশ্বর এবার শোবার ঘরের দিকে এগোলেন। ওখানে একটা দেওয়াল-আলমারিতে তাঁর কয়েকপ্রস্থ জামাকাপড় থাকে। নিভৃত এই শয়ন-মন্দিরে বীরেশ্বর বাড়তি ছবি রাখতে দেন নি। ওখানে একটিমাত্র ছবি আছে—রাজনটী রাগমালার রূপসজ্জায় মধুমালতী। মুখে একটু চাপা হাসির ইঙ্গিত। হাব কথাটা বীরেশ্বরের আবার মনে পড়ে গেলো।

মধুমালতী জিজ্ঞেস করলো, বীরেশ্বর এখনই খাবেন কিনা। বীরেশ্বর রাত দশটার সময় ডিনারের পক্ষপাতী নন। তিনি নিশাচর। রাত দেড়টার আগে তিনি ঘুমোতে যান না। নরহরিকেও কখনও কখনও তিনি জাগিয়ে রাখেন। প্রায় ভোররাতে ঘরমুখো মাতালদের সঙ্গে বেচারা নরহরি অবসন্ন দেহে রিক্‌শা চড়ে বাড়ি ফেরে। বাড়ির লোকদের এসব সহ্য হয়ে গিয়েছে।

মধুমালতীর দিকে তাকিয়ে বীরেশ্বর বললেন, "মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছে, এখনো ঠাকুরপুজো সারো নি।"

"ঠাকুরই বাইরে! পুজো সারবো কোত্থেকে?"—মধুমালতীর এই চটপট ডায়ালগটা বীরেশ্বরের বেশ মিষ্টি লাগলো।

রাজনটী রাগমালার ছবিটার দিকে আড়চোখে দৃষ্টিপাত করে আজকের মধুমালতীর শরীরের দিকে তাকালেন বীরেশ্বর। এই এক বদ অভ্যাস বীরেশ্বরের। শরীর ছাড়া মেয়েমানুষের যে আর কিছু থাকতে পারে তা ভাবতে পারেন না তিনি। এই আট দশ বছরে মালতীর শরীর নানা পরিচর্যা সত্ত্বেও যৌবনের অনেক ঐশ্বর্য হারিয়েছে। "নিষ্ঠুর সময়, বসন্তসমাগমে তুমি যেমন অকৃপণভাবে মেয়েদের সমৃদ্ধ করো, তেমনি বড় তাড়াতাড়ি তাদের সর্বস্ব কেড়ে নাও—তাদের দেহ নিঃস্ব হয়ে যায়।" বীরেশ্বর মনে মনে সময়কে জিজ্ঞেস করলেন, "সময়, তোমারও কি শেয়ার-বাজারে যাবার অভ্যেস আছে? দিতেও যত দরাজ ফিরিয়ে নিতেও তত নিষ্ঠুর তুমি।"

বীরেশ্বরের অনুমতি নিয়ে মধুমালতী এবার গা ধুয়ে কাপড় পালটে পুজো সারতে গেলো। থিয়েটারের নায়িকা তো! ঠাকুরকেও তাই এই অসময়ের পুজোতে অভ্যস্ত হতে হয়েছে। শো থাকলে পৌনে-দশটার আগে মধুমালতী বাড়ি ফিরতে পারে না।

মধুমালতীর ঘরের মধ্যে চেয়ারের বদলে একটা দোলনা বসানো

হয়েছে। শেয়ার-বাজারের ওয়াকার সায়েবের বাড়িতে জিনিসটা প্রথম দেখেছিলেন বীরেশ্বর। দোলনার এমন হাইট যে সামনে টেবিল রেখে সায়েব চিঠিপত্তরও লিখতেন। তোমার পাঠ মুখস্থ করতে সুবিধে হবে, এই বলে মধুমালতীর জন্যে বীরেশ্বর এই দোলনার ব্যবস্থা করেছিলেন।

মধুমালতী ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। বীরেশ্বর ঝুলন্ত-চেয়ারে বসে কেষ্ট ঠাকুরের মতো একটু একটু দোল খাচ্ছেন এবং ঘরটার দিকে তাকিয়ে আছেন।

এই খাট, এই ডানলপের বিছানা, এই লেপ, এই পাশ-বালিশ সমস্ত কিছুই একদিন বাংলা থিয়েটারের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত হওয়া উচিত।

আচ্ছা, খাট-বিছানা, লেপ-তোশক কোনো দেশের মিউজিয়ামে দেখানো হয়? বীরেশ্বর ভাবলেন, কোনো ঐতিহাসিক আইডিয়ার উৎপত্তি যেখানে হয় সেই উৎসস্থানটি তো ভাবীকালের মানুষদের কৌতূহল নিবৃত্তি করে।

এই খাট-বিছানার নাটকে বীরেশ্বরকে কোনোদিন জড়িয়ে পড়তে হতো না, যদি না কোহিনূর থিয়েটারের মালিক হরেন নিয়োগী ওইভাবে বীরেশ্বরকে অপমান করতেন। বীরেশ্বর শুধু একবার মধুমালতীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ প্রার্থনা করেছিলেন। লোকটা বলতে পারতো, "এখন মধুমালতী খুব ক্লান্ত। কিছু মনে করবেন না।" কিন্তু তার বদলে সে বীরেশ্বরকে নীতিসুধা পরিবেশনের চেষ্টা করলো; গার্জেনী কায়দায় বললো, "থিয়েটার দেখা হয়েছে এবার বাড়ি যান। কাপ্তানিবাবুদের যুগ বাংলা থিয়েটার থেকে শেষ হয়ে গিয়েছে।"

বীরেশ্বরের মাথায় রক্ত উঠে গেলো। সারপেনটাইন লেনে চায়ের দোকানের মালিক পরেশবাবুর কথা মনে পড়ে গেলো।

"এসব ক্ষেত্রে করণীয় কী ?" নেদো মল্লিককে জিজ্ঞেস করলেন বীরেশ্বর রক্ষিত।

নেদো মল্লিক মিটমিট করে হেসে বীরেশ্বরের রাগ উসকে দিলেন। টিপ্পনী কাটলেন, "তোমার কর্ম তুমি করবে, ভাই বীরেশ্বর। আমি তোমাকে শুধু হিসট্রি থেকে কেস ল দিতে পারি।" এই বলে নেদো মল্লিক পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে শুরু করলেন। "বাবু মতিলাল শীলের নাম শুনেছো ? তাঁর নাতি গোপাললাল শীল। কি এক অভিনয় দেখতে এসে তিনি একবার অপমানিত হয়েছিলেন; তখন তিনি, অ্যাজ এ প্রতিশোধ পুরনো স্টার থিয়েটারের বাড়ি কিনে নিলেন। অধর চাটুজ্যে নাট্যকার নিজে আমাকে বলেছে, এমারেল্ড থিয়েটার চালু করবার কোনো ইচ্ছে বাবু গোপাললাল শীলের ছিল না।"

"কোথায় সেই এমারেল্ড থিয়েটার ?" বীরেশ্বর জানতে চেয়েছিলেন।

"ছিল ৬৮ নম্বর বীডন স্ট্রীটে। এখন ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট সে সব ভেঙে ছাতু করে দিয়ে সেণ্ট্রাল এভিন্নিউ বার করেছে," নেদো মল্লিক উত্তর দিয়েছিলেন।

বীরেশ্বর তখন অপমানের জ্বালায় ছটফট করছেন। একদিন তিনি হরেন নিয়োগীর ওপর প্রতিশোধ নেবেনই। বীরেশ্বর রক্ষিতের আঁতে ঘা দিয়ে কারও মুক্তি নেই।

মধুমালতীর আয়নায় নিজের মুখ দেখে নিজেই মিটিমিটি হাসলেন বীরেশ্বর। রোখের মাথায়, প্রতিহিংসার নেশায় অনিশ্চয়তার দিকে ছুটে গিয়ে লোকে যথাসর্বস্ব হারায়। কিন্তু বীরেশ্বরের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো। একবার তিনি মলঙ্গা লেনে নিজের বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করে তার মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। সারপেনটাইন লেনের প্রতিহিংসা থেকে ভাগ্যের মোড় ফিরে গেলো। তারপর কুসুমকুমারীর পাড়ায় অপমান

ভুলবার জন্যে তিনি থিয়েটারে এসে মধুমালতীকে দেখতে পেলেন। মধুমালতীর জন্যে হয়েন নিয়োগী যে অপমান করলেন তার বদলা খুঁজতে গিয়ে বীরেশ্বর ব্যবসায়ের নতুন লাইন খুলে ফেললেন। গোপনে খোঁজখবর নিয়ে বীরেশ্বর রক্ষিত জানলেন, কলকাতায় অনেক লিজের সম্পত্তি আছে। অনেক সিনেমা-থিয়েটার রঙমেখে, আলোর মালা পরে ওই যে স্টাইলের মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে তার জমির মালিক একজন, বাড়ি আরেকজনের। বাড়ি লিজ নিয়ে সিনেমা-থিয়েটার চালাচ্ছে হয়তো আরেকজন।

কী সুন্দর লাইন। শেয়ার-বাজারের মতো ঘণ্টায় ঘণ্টায় উত্থান-পতনের ড্রামা নেই, কিন্তু সিমেণ্ট পারমিটের মতো টাকা আছে অনেক, যদি একটু ওকালতি বুদ্ধি থাকে। বীরেশ্বর আয়নাতে নিজের ছবির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। গরীবের ছেলে হয়ে জন্মেছিলেন বীরেশ্বর, কিন্তু এখন কী তাঁর নেই? পরিশ্রম করবার ক্ষমতা আছে, ব্যবসার ব্রেন আছে, সাহস করে স্পেকুলেশনে ঝাঁপিয়ে পড়বার নার্ভ আছে এবং আইনের কূটবুদ্ধি আছে যার নমুনা পেয়ে বাঘা-বাঘা উকিলরাও অবাক হয়ে যান।

"আর কী আছে তোমার বীরেশ্বর?" আয়নার ছবিটা রূপকথার চরিত্রের মতো আত্মবিশ্বাসের প্রতিমূর্তি এই বীরেশ্বরকে জিজ্ঞেস করলো। বীরেশ্বর হেসে বললেন, "হেনরি ফোর্ডেরও বীরেশ্বরের মতো নানা গুণ ছিল, কিন্তু একদম হজমের ক্ষমতা ছিল না। বীরেশ্বর রক্ষিতের শরীর সুস্থ ও সবল, সব রকমের ক্ষিধে আছে তার দেহে। জীবনের পাত্রটিকে পূর্ণ করে বীরেশ্বর উপভোগ করতে চায়। শ্যামা সেজন্যে যতই দুঃখ করুক, কিছু এসে যায় না।"

ঠিকে প্রজা এবং লিজের ব্যাপারে অনেক অনুসন্ধান করলেন বীরেশ্বর। তারপর ৮১।২ বৈষ্ণবপাড়া লেনের শ্রীমতী সুধাসিন্ধু দাসীর কাছ থেকে হাতিবাগানের জমির খবরাখবর নিলেন—যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে কোহিনূর থিয়েটার। সেই কোনকালে বাবু

বনওয়ারিলাল লাহা সুধাসিন্ধুর পূর্বপুরুষের কাছ থেকে নামমাত্র মূল্যে এই জমি লিজ নিয়ে তার ওপর থিয়েটার বাড়ি বানিয়েছিলেন। তারপর আরও ছেষট্টি বছর পেরিয়ে গিয়েছে। নানা হাত ঘুরে এখন এই সম্পত্তি উপভোগ করছেন হরেন নিয়োগী।

উল্লসিত বীরেশ্বর দেখলেন লিজের মেয়াদ শেষ হতে আর মাত্র কিছুদিন রয়েছে। নিঃসন্তান বিধবা সুধাসিন্ধুর পক্ষে সম্পত্তি উদ্ধারের জন্যে মামলা-মকদ্দমায় নামা সম্ভব নয়। বিধবাকে বাজারদরের থেকে একটু বেশী দাম দিয়েই দূরদর্শী বীরেশ্বর কোহিনুর থিয়েটারের জমি কিনে নিলেন।

সুসংবাদটা বীরেশ্বর প্রথমেই নেদো মল্লিকের কানে তুলে দিয়েছিলেন। নেদো তখন নিজের বাড়িতে একলা মদ খাচ্ছিলেন। করমর্দনের জন্য বীরেশ্বরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে নেদো বললেন, "কংগ্রাচুলেশন!" তারপর তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে নাটকীয় কায়দায় নেদো মল্লিক জিজ্ঞেস করলেন, "কুও ভেদিস? বীরেশ্বর, এরপর কোথায়?"

বীরেশ্বর এক মুহূর্ত দেরি না-করে উত্তর দিলেন, "সম্পত্তি দখল নিয়ে, হরেন নিয়োগীর ওই বুঁদির কেল্লা আমি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়ো করে ফেলবো। ও-বাড়ির ইঁটগুলোকে সুরকি হিসেবে বিক্রি না করা পর্যন্ত আমার গায়ের জ্বালা কমবে না।"

আমি মধুমালতী বলছি। স্নানটা দ্রুত সেরে নিয়ে এখন আমি গা মুছছি—ঠাকুর সেবার দেরি না হয়ে যায়। ঠাকুরই আমার সব।

আপনারা হাসছেন? ভাবছেন ঠাকুরই, যদি সব হবেন, তা হলে আমার শোবার-ঘরে যে-লোকটি বসে আছেন তিনি কে?

বিনোদমাসীমা তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন "আমাদের ন্যায় ভাগ্যহীনা বারনারীদের টালবেটাল তো সর্বদাই সহিতে হয়···একে আমি জ্ঞানহীনা অধম স্ত্রীলোক, তাহাতে সুপথ কুপথ অপরিচিতা। আমাদের গন্তব্যপথ/সততই দোষণীয়, আমরা ভাল পথ দিয়া যাইতে চাহিলে, মন্দ আসিয়া পড়ে। ইহা যেন আমাদের জীবনের সহিত গাঁথা। লোকে বলেন আত্মরক্ষা সতত উচিত, কিন্তু *আমাদের আত্মরক্ষাও নিন্দনীয়। অথচ আমাদের প্রতি স্নেহচক্ষে দেখিবার বা অসময়ে সাহায্য করিবার কেহ নাই!"*

দেখুন তো আমার ভাগ্য! থিয়েটার লাইনে এসেছি. কিন্তু আমি নিজেকে তখনও সহজলভ্য করি নি, সস্তা করি নি। অনেকেরই নজর ছিল আমার দেহের ওপর—দাম না নিয়ে তাঁরা আমাকে সাফল্যের সিংহদরজা দিয়ে ঢুকতে দেবেন না। সেই ভয়েই তো এই থিয়েটার থেকে ওই থিয়েটারে পালিয়েছি। নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি, কেবল এই অপরাধে বিশ্বসুদ্ধ শত্রু তৈরি হয়েছে আমার। তবু মনোবল হারাই নি, অনেক লোভী নেকড়ের সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই করেছি। শেষ পর্যন্ত অধরবাবুর দয়ায় এই কোহিনূরে এলাম। এখানে মালিক ভাল, দল ভাল, নাটক ভাল। শুধু বোধ হয় আমার ভাগ্য ভাল নয়। না হলে, সবে আমি কয়েকটা নাটক করে একটু দাঁড়াবার চেষ্টা করছি, নায়িকা হিসেবে কিছুটা স্বীকৃতি পাচ্ছি, ঠিক সেই সময় ভাগ্যের আকাশ কেন কাল মেঘে ঢেকে গেলো?

আমার চিন্তার শেষ নেই। তার ওপর অধরবাবুর দুশ্চিন্তা। আমারই জন্যে বেচারা ঝগড়া করেছেন অন্য থিয়েটারে। সেসব জায়গায় নাট্যকার অধর চট্টোপাধ্যায়ের প্রবেশ নিষেধ। কোহিনূর থিয়েটার বন্ধ হলে বোধহয় কোথাও তাঁর জায়গা হবে না।

হরেনবাবু গম্ভীর মানুষ, আমাদের সঙ্গে বিষয়-সম্পত্তির আলোচনা করেন না। অধরবাবু একদিন দুঃসংবাদ আনলেন, "জমির মালিকের কাছে হরেনবাবুর অনেক টাকা দেনা—লিজের টাকা অনেক কাল দেওয়া হয় নি। তার ওপর সুদ আছে—সুদের সুদ।"

এদিকে রাজনটী রাগমালার দিন শেষ হয়ে এসেছে। এবার বোধ হয় নতুন নাটক নাবাতে হবে। আমি দুঃখ করে অধরবাবুকে বলেছিলাম, "এত কষ্ট করে, পাট মুখস্থ করে, মহড়া দিয়ে আমরা বই নাবাই অথচ লোকের কাছে কত সহজে তা পুরনো হয়ে যায়।"

হরেনবাবু বলেছিলেন, "এখন তো তবু একশ দু'শো নাইটের মুখ দেখা যায় হামেশা। গিরিশবাবুর আমলে অনেক নাটকের তো তিরিশ শো হতো না। অমন যে অমন ম্যাকবেথ—সেক্সপীয়রের লেখা, গিরিশবাবুর অনুবাদ ও অভিনয়—ক'রাত চলেছিল?"

অধর অনেক খবরাখবর রাখেন। বলেছিলেন, "তোর বিনোদমাসীমা তো মাত্র বার বছর অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু নাটকের সংখ্যা চুয়ান্নখানা। ১৮৭৪ সালের ২রা ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশনালে 'শত্রুসংহার' নাটকে দ্রৌপদীর সখী হিসেবে প্রথম অ্যাপিয়ারেন্স। শেষ অভিনয় স্টার থিয়েটারের 'বেল্লিক বাজার'-এ, ইন দি ইয়ার ১৮৮৬, ২৫শে ডিসেম্বর।"

অধরবাবুর লেখা নতুন নাটক 'জননী জন্মভূমি' নামলো কোহিনূরে। দেশাত্মবোধক নাটক—আমি বন্দিনী ভারতলক্ষ্মীর পার্ট করেছিলাম। আমার অনেক সূক্ষ্ম কাজ ছিল, অভিনয়ে আমি মন প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলাম। কিন্তু কোথায় ভিড়?

রিহার্সালের সময় অধরবাবু আমাকে বলেছিলেন, "বন্দিনী ভারতলক্ষ্মীকে যখন বিদেশীর কাছে দুষ্টরা বিক্রি করে দিচ্ছে, যখন তুই কাতর হয়ে ডাকছিস—কে কোথায় আছো, অথচ তোর

ডাকে সাড়া দিয়ে কেউ এগিয়ে আসছে না তখন কীরকম হাত-তালি পড়বে দেখিস।"

নাট্যালয়ে হাত থাকলে তো তালি পড়বে! নরহরি ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিল, "দেশাত্মবোধ এখন সেকেলে হয়ে গিয়েছে—এসব বস্তাপচা জিনিস আজকালকার পাবলিক পছন্দ করে না।"

হরেনবাবু বিশ্বাস করলেন না। হাজার হাজার টাকার পোস্টার দিলেন, হ্যাণ্ডবিল ছড়ালেন। লিখলেন, "ভারতলক্ষ্মীর ভূমিকায় মধুমালতার শিল্পীজীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয়।" কিন্তু কিছুই হলো না। বুকিং আপিসে কোনো চাঞ্চল্য পড়লো না। বক্স আপিসের লোকরা মাছি তাড়াতে লাগলো।

অমন যে অমন হাসিখুশি অধরবাবু, তিনিও মুষড়ে পড়েছিলেন। অধরবাবু আশা করেছিলেন, এই নাটক থেকে হরেনবাবুর দেনা শোধ হবে। হরেনবাবু কিন্তু উৎসাহ দিলেন, "হতাশ হয়ো না, অধর। আবার তোমরা চেষ্টা করো। সুভাষ বোস, সি আর দাশের এই দেশে দেশাত্মবোধক নাটক না চলে উপায় নেই।"

'জননী জন্মভূমি' নাটক আর ক'দিন আটকে রাখা যাবে ঠিক নেই। অধর তখন রাত জেগে নতুন নাটক 'বন্দেমাতরম্' লিখছেন। আমাদের সকলের মন খারাপ। ঠিক সময়ে মাইনে পাওয়া যায় নি—কোম্পানির আর্থিক অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়।

সেই সময় অধর চাটুজ্যে একদিন আড়ালে ডেকে আমাকে বলেছিলেন, "মধু তুই একটা লোকের সঙ্গে আলাপ করবি? লোকটার অনেক টাকা।"

টাকা শুনেই আমার মাথা গরম হয়ে উঠেছিল। "টাকাওয়ালা লোকরাই তো তোমার জননী জন্মভূমি নাটকে আমাকে বেচে দিলো।" অধরদাকে আমি শুনিয়ে দিয়েছিলাম।

অধরদা বললেন, "লোকটার জীবনে এখন একটাই স্বপ্ন—

তোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়। টাকা থাকলেই মানুষ খারাপ হবে কেন? তুই বিপ্লবী গণেশ মিত্তিরের নাম শুনেছিস?"

আমি থিয়েটারের অশিক্ষিতা অ্যাকট্রেস হতে পারি, কিন্তু বিপ্লবী গণেশ মিত্রের নাম শুনবো না? রাজাবাগান স্ট্রীটেই তো উনি অজ্ঞাতবাস করতেন।

অধরদা বললেন, "বীরেশ্বরবাবুও বিপ্লবী গণেশ মিত্রের সঙ্গে একই দিনে একই জায়গায় অ্যারেস্টেড হয়েছিলেন—একই সঙ্গে জেল খেটেছেন। তারপর মুক্তি পেয়ে ভদ্রলোক যদি ব্যবসা-বাণিজ্যে নেমে ছুটো পয়সা করে থাকেন তাতে দোষ কী?"

বীরেশ্বর রক্ষিতের সঙ্গে দেখা করতে আমি রাজী হয়ে গেলাম। ছোটবেলা থেকে বীরবিপ্লবীদের সম্বন্ধে আমার ছুর্বলতা রয়ে গিয়েছে।

কেষ্ট কুণ্ডু স্ট্রীটের এই বাড়িতে বীরেশ্বর রক্ষিত একদিন আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এলেন। অধরদা সঙ্গে আসবেন বলেছিলেন। আমি ওঁদের ছুজনের জন্যেই খাবারের ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। নাঃ, এখন আর নোংরা কথা ভাববো না। ঠাকুরের পুজোর সময় আমি মনের সব মলিনতা মুছে ফেলতে চাই। হে গৌরহরি, পতিতপাবন মুখ তোলো, এই অধমাকে দয়া করো।

বীরেশ্বর রক্ষিত একবার ঘড়ির দিকে তাকালেন। কলঘর থেকে মধুমালতী এখনও বেরোয় নি, তারপর সে ঠাকুরসেবায় বসবে। এই সব বাজে কাজে মধু বড় সময় নষ্ট করে। যা প্রাণ চায় করুক, ঠোঁট উল্টে ভাবলেন বীরেশ্বর। পুতুলখেলার একটা জন্মগত প্রবৃত্তি প্রত্যেক মেয়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

একটু আগে বীরেশ্বর ঘরের রেকর্ড-প্লেয়ারটা চালিয়ে দিয়েছেন। নাটকের আবহসঙ্গীতের মতো সেতারের মৃদু ঝঙ্কার বেশ লাগছে।

নেদো মল্লিককে সুখবরটা দিয়ে বীরেশ্বর বলেছিলেন, "মধুমালতীর সঙ্গে আলাপ করতে যাচ্ছি, তুমিও চলো না।" নাট্যকার অধর চাটুজ্যের সঙ্গে বীরেশ্বরের আলাপটা নেদো মল্লিকই করিয়ে দিয়েছিলেন।

নেদো মল্লিক সহযাত্রী হতে রাজী হন নি। দুষ্টু হাসিতে মুখ ভরিয়ে তিনি বলেছিলেন, "বীরেশ্বর, কতকগুলো জায়গায় একা যেতে হয়—যেমন বাথরুমে, প্রিয়াসন্দর্শনে এবং খাটে চড়ে শ্মশানে।"

তখনও বীরেশ্বরের কিছু চক্ষুলজ্জা ছিল। নেদো মল্লিককে তিনি বলেছিলেন, "মধুমালতীর অভিনয়ে আমি মুগ্ধ। একটু আলাপ করতে চাই কেবল।"

"না না, তুমি আর কিছুই করতে চাও না!" হা-হা করে হেসেছিলেন নেদো মল্লিক। ওঁর কথাতে যে প্যাঁচ আছে বীরেশ্বর তাও বুঝতে পারেন নি। কিন্তু নেদো মল্লিক ছাড়বার পাত্র নন। বীরেশ্বরের পিঠে হাত রেখে সাবধান করে দিয়েছিলেন: "ইলিসিয়াম রোডের আই-বি সমুদ্র সাঁতরে পেরিয়ে এসে বাগবাজারের থিয়েটারি নর্দমায় যেন তরী ডুবিও না, ভায়া। বড্ড বিশ্রী লাইন। অধর চাটুজ্যের সঙ্গে গপ্পো করে বহু খবর কানে এসেছে। আচ্ছা-আচ্ছা কাপ্তেনরা বাপ-ঠাকুর্দার অনেক টাকা ওই থিয়েটারী নর্দমায় ঢেলেছে—বাবু গোপাললাল শীল, শ্রীনাথ দাসের ছেলে ইন্দু দাস। অমন যে অমন টাকার বাণ্ডিল, নন-বেঙ্গলী গুর্মুখ রাই সেও টাল সামলাতে পারলো না।"

নেদো মল্লিকের এই গার্জেনি লেকচারে বীরেশ্বরের মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেলো।

তখন সকালবেলা, অফিস টাইম। নাট্যকার অধর চাটুজ্যের

সঙ্গে বীরেশ্বর বেরিয়েছিলেন। থিয়েটারের নায়িকা মধুমালতী সম্বন্ধে সেদিন অধর কত কথা বলেছিল। এরকম রূপ এবং অভিনয় ক্ষমতা একসঙ্গে নিয়ে অনেকদিন কেউ বাংলা স্টেজে আসে নি। মধুমালতী মেয়েটি আরও ভাল—শিশুর মতো সরল। থিয়েটার লাইনে থেকেও এখনও ফুলের মতো নিষ্পাপ রয়েছে।

অধর চাটুজ্যে কিন্তু কেষ্টদাস কুণ্ডু স্ট্রীটে মধুমালতীর দরজার গোড়ায় এসে একটা ছুতো করে কেটে পড়েছিল। কিছুতেই অধর বাড়িতে ঢুকলো না। যে-ঘরে বীরেশ্বর এখন দেহ এলিয়ে বিশ্রাম করছেন এই ঘরেই মধুমালতীর সঙ্গে বীরেশ্বরের প্রথম একান্ত সাক্ষাৎ হলো।

মধুমালতী তখন সবে স্নান সেরে এলো চুলে বসে আছে। ওর চুল যে অত বড় তা বীরেশ্বরের ধারণা ছিল না। বীরেশ্বর গোগ্রাসে মধুমালতীর অনির্বচনীয় সৌন্দর্যসুধা পান করেছেন, কিন্তু রঙ্গমঞ্চের এই রাজকুমারী কেন তাঁর দিকে অমনভাবে তাকিয়ে আছে তা বীরেশ্বর বুঝতে পারছেন না। মধুমালতী কি জানতে পেরেছে যে কোহিনূর থিয়েটারের জমি কেনবার সব ব্যবস্থা বীরেশ্বর রক্ষিত গোপনে পাকা করে ফেলেছেন ?

নাটকটা এইরকম :

মধুমালতী বিস্ফারিত নয়নে—আপনি ?

বীরেশ্বর—আমি কোনো নায়ক নই মালতী দেবী। আমি সামান্য একজন লোক। ব্যবসা করি। আপনার অভিনয় আমাকে মুগ্ধ করেছে।

মধু—অত সহজে আমাকে ঠকাতে পারবেন না, বীরেশ্বরবাবু। আমি সব জানি।

বীরেশ্বর (মনে মনে) : সর্বনাশ।

বীরেশ্বর কিন্তু যা ভেবেছেন তা নয়। মধুমালতী বিপ্লবী গণেশ মিত্রের সহযোগী বীরেশ্বর রক্ষিতকে বিস্ফারিত নয়নে দেখছেন।

মধুমালতী অদ্ভুত মানুষ ছিলেন এই গণেশ মিত্র। ধরা পড়বার দিন সকালেও ওঁকে রাজাবাগানের বাড়িতে আমি দেখেছি। আমাদের বাড়ির চিলকুঠুরিতেই তো উনি লুকিয়ে ছিলেন।

বুকটা হঠাৎ অস্বস্তিতে ঠাণ্ডা হয়ে এলো, কিন্তু পরমুহূর্তেই বীরেশ্বর বীরোচিত মৃদু হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেললেন।

মধুমালতী—এটা কি সত্য, পুলিসের হাতে ধরা পড়বার পরেও উনি রবীন্দ্রনাথের উদয়ের পথে আবৃত্তি করেছিলেন ?

বীরেশ্বর—একটুও মিথ্যে নয়, মধুমালতী দেবী। একমাত্র আমারই সেই দুর্লভ দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল—যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন মনে থাকবে।

মধুমালতী—বাড়ির চিলকুঠুরিতে উঠে গণেশ মিত্রকে চা দিতে গিয়ে একদিন আমিও কয়েকলাইন আবৃত্তি শুনেছিলাম। আজও আমি ভুলতে পারি নি—এসেছে সে একদিন, লক্ষ পরাণে শঙ্কা না মানে, চিত্ত ভাবনাহীন। আমাদের নতুন নাটক 'বন্দেমাতরম্'-এর রিহার্সাল দেবার সময় অগ্নিপুত্র গণেশ মিত্রের সেই পবিত্র ছবিটা আমি স্মরণ করবার চেষ্টা করি।

বীরেশ্বর—ওসব কথা আমি এখন ভুলতে চাই, মালতী দেবী।

মধু—আহা! হাজতে নিয়ে গিয়ে আপনার ওপরে ওরা খুব অত্যাচার করেছিল বুঝি ?

হিরো বীরেশ্বরকে এবার পরম আদরে মধুমালতী আপ্যায়ন করেছিল। নিজের হাতে তৈরি খাবার রান্নাঘর থেকে এনে অতিথিকে খাইয়েছিল। সযত্নে কাপে চা ঢেলে দিয়েছিল। বলেছিল, "আমরা থিয়েটারের সামান্য অভিনেত্রী। আপনারা অগ্নিযুগের অগ্নিপুরুষ।"

ওর হাত থেকে খাবারের প্লেট নিতে গিয়ে. বীরেশ্বরের হাতের সঙ্গে মধুমালতীর হাত মুহূর্তের জন্যে ঠেকে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে

বিদ্যুতের এক বিচিত্র অনুভূতি বীরেশ্বরের সর্বদেহে প্রবাহিত হয়েছিল।

মধুমালতী আবার যখন তাঁর প্লেটে খাবার দিতে গিয়েছিল, তখন বীরেশ্বর আর একবার আচমকা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বাধা দেবার জন্যে। দুই হাতের মধুর মিলন-সংঘাতে মধুমালতীর কাঁচের চুড়িগুলো রিনি-ঝিনি সুরে বেজে উঠেছিল। অমন সুন্দর হাতে কাঁচের চুড়ি বীরেশ্বরের ভাল লাগে নি। সোনার হাতে সোনার কাঁকন পরিয়ে দেবার ইচ্ছে হচ্ছিল বীরেশ্বরের। কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না তিনি।

প্রথম দিন ওই পর্যন্ত। বেশীদূর এগোতে চান নি বীরেশ্বর। কেষ্টদাস কুণ্ডু স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে নিজের গাড়িতে চড়ে বীরেশ্বর সোজা শেয়ার বাজারের দিকে চলে গিয়েছিলেন। এবং কী আশ্চর্য, সেই দিনেই মার্কেট থেকে তিনি মোটা টাকা লাভ করেছিলেন। হাওড়া জুট, বি আই সি ও বেঙ্গল কোল টপাটপ কয়েক পয়েন্ট ওপরে উঠে বীরেশ্বরকে বিস্মিত করলো। বেপরোয়া হয়ে বীরেশ্বর কয়েক হাজার ইকুইটি শেয়ার বেচে দিলেন। লায়ন্স রেঞ্জের ফলের দোকানে ডবলসাইজ গ্লাসে বেদানার রস খেতে খেতে বীরেশ্বর সেদিন ভোরবেলার স্পর্শসুখের কথা ভাবতে লাগলেন। সেদিন সকালে তিনি ইচ্ছে করেই শ্যামাকে চুম্বন করে বেরোন নি। এই প্রথম বীরেশ্বর রক্ষিত অনুভব করলেন, শ্যামার থেকেও কোনো পয়মন্ত মেয়ে তাঁর জীবন-আকাশে দেখা দিয়েছে।

ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে মধুমালতী উঠে দাঁড়ালো। মধুমালতীর মনে পড়লো, অধরবাবুই খবর দিয়েছিলেন, "বিপ্লবী গণেশ মিত্রের সহযোগী বীরেশ্বর রক্ষিত তোর সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশী হয়েছেন। ভদ্রলোক আর একদিন তোর সাক্ষাতের অভিলাষী।"

গণেশ মিত্রের সহযোগী কীরকম হবেন, সে সম্বন্ধে মধুমালতীর মনে যে ভাবমূর্তি ছিল তার সঙ্গে বীরেশ্বরের কোনো মিল হয় নি। কিন্তু মধুমালতী মনকে বুঝিয়েছিল, চেহারা এবং কথাবার্তা থেকে সব মানুষের কাজ বোঝা যায় না।

কেন বীরেশ্বর রক্ষিত আবার আসতে চান? সরল মনে মধুমালতী ভেবেছে, হয়তো উনি রাজাবাগানে বিপ্লবী গণেশ মিত্রের অজ্ঞাতবাস পর্বের কাহিনী শুনতে চান মধুমালতীর কাছে।

এদিকে অধর চাটুজ্যে মুখ শুকনো করে বললেন, "মধু, আমাদের সময় খারাপ আসছে। 'বন্দেমাতরম' নাটক যদি ফ্লপ হয় তাহলে কোহিনূর থিয়েটারের ভবিষ্যৎ যে কী হবে কেউ জানে না। সবশুদ্ধ পঁচাত্তরটা লোকের চাকরি—তার মানে পঁচাত্তরটা পরিবারের অন্ন। বীরেশ্বর রক্ষিত গোপনে থিয়েটারের জমিটা কিনেছেন কিনা তাও খোঁজ করা দরকার।" সংকোচ কাটিয়ে অধর বলেছিলেন, "মধু একমাত্র তুই খবরটা ঘোড়ার মুখ থেকে বার করতে পারিস।" বীরেশ্বরের সঙ্গে আবার দেখা করতে রাজী হয়েছে মধুমালতী।

বীরেশ্বর রক্ষিত দ্বিতীয় দিন খালি হাতে আসেন নি। সঙ্গে অনেক উপহার এনেছিলেন। মধুমালতী বেশ লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল। থিয়েটারের সস্তা-মেয়েরা ভক্তদের কাছ থেকে যা-পায় তাই নেয়। সামান্য চেনা পুরুষমানুষের কাছ থেকে দামী উপহার নিতে মধুমালতী মোটেই অভ্যস্ত নয়।

তখন সকাল সাড়ে-দশটা। একটা লাল পাড় সাদা টাঙ্গাইল শাড়ি পরে মধুমালতী যতখানি সম্ভব নিজেকে গ্ল্যামারমুক্ত করে বীরেশ্বরের সামনে এসে বসেছিল। ধবধবে আদ্দির পাঞ্জাবি-পরা বীরেশ্বরের দিকে চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে সে বলেছিল, "এসব আপনি ফেরত নিয়ে যান, মিস্টার রক্ষিত।"

বিনয়ে বিগলিত বীরেশ্বর উত্তর দিয়েছিলেন, "এসব আপনারই

ভাগ্যে রোজকার করা। সেদিন এখান থেকে শেয়ার মার্কেটে ফিরে গিয়েই দেখি বেঙ্গল কোলের দাম তালগাছে ওঠবার জন্য ধড়ফড় করছে। পাঁচ হাজার শেয়ার দেড় টাকা প্রফিটে বেচে দিলাম।"

মধু মনে মনে হিসেব করতে লাগলো, এই সাড়ে সাত হাজার টাকা কোহিনূর থিয়েটারে লাভ করতে হলে তাদের সকলকে কত কাঠখড় পোড়াতে হতো।

বীরেশ্বর বলেছিলেন, "স্রেফ আপনার ভাগ্যেই ব্যাপারটা হলো। বেঙ্গল কোলের দাম এইভাবে বাড়বার কোনো কারণই ছিল না।"

মধুমালতী তবু ওসব উপহার নেবে না। কিন্তু বীরেশ্বর যাতে রাগ না করেন তার জন্য বললো, "আমাদের নতুন নাটক 'বন্দে-মাতরম' কবে দেখবেন? আমি পাসের ব্যবস্থা করে রাখবো।"

হাহা করে হেসে উঠলেন বীরেশ্বর। "গত কালই আমি দেখে এসেছি। যাতে নায়িকার নজরে না পড়ি সেইজন্যে ফিফথ সারিতে বসেছিলাম।"

"কী রকম লাগলো?" জিজ্ঞেস করলো মালতী।

নির্দ্বিধায় বীরেশ্বর উত্তর দিলেন, "আপনার অভিনয় ছাড়া নাটকে আর কিছুই নেই। আপনি যেন মূর্তিমতী স্বদেশলক্ষ্মী। কিন্তু হরেন নিয়োগী কতদিন আপনাকে শোষণ করবে?"

যাবার সময় আর এক কাণ্ড হলো। উপহারগুলো ফেরত দেবার কথা উঠতেই বীরেশ্বর হঠাৎ মধুমালতীর হাত চেপে ধরলেন। "একটা রফা হোক। উপহারগুলো থাক—তার বদলে আমি মালতীদেবীর ফ্রি পাসে আবার থিয়েটার দেখবো।"

শনিবার সাড়ে-ছটার শোতে বীরেশ্বর রক্ষিত থিয়েটার দেখতে আসবেন। ইতিমধ্যেই বোঝা গিয়েছে 'বন্দেমাতরম' সুপার ফ্লপ। হরেন নিয়োগীর সর্বনাশ হয়েছে। বউয়ের গয়না বন্ধক দিয়ে নতুন প্রোডাকশনে নেমেছিলেন হরেন নিয়োগী।

অধর চাটুজ্যের সঙ্গে বৃহস্পতিবারের শোতে মালতীর দেখা হয়ে গিয়েছিল। অধরের চোখে জল। বললেন, "আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেলো, মধু। কত আশা করে তোদের সকলকে এই কোহিনূরে নিয়ে এসেছিলাম। আমার নাটক, তোর অভিনয় ও সৌন্দর্য, এবং সকলের ঐকান্তিক চেষ্টায় এই কোহিনূরে নতুন এক ইন্দ্রপুরী গড়ে তুলবো ভেবেছিলুম।"

"এখন এই থিয়েটার একমাত্র তুই রক্ষে করতে পারিস, মালতী," অধর চাটুজ্যে বলেছিলেন আমাকে। "হরেন নিয়োগীর পথের ভিখিরী হতে দেরি নেই: কোহিনূর থিয়েটারের জমি কিনে মামলা-মকদ্দমা বাধিয়ে বীরেশ্বর রক্ষিত কাণ্ড বাধিয়ে বসবেন" তারপর অধরদার খবর, পুরনো এই থিয়েটার বাড়িটাকে ভেঙে ফেলে এখানে হাইরাইজ ফ্ল্যাটবাড়ি তুলবেন বীরেশ্বর রক্ষিত।

অধর চাটুজ্যে জানতেন, শনিবারে আবার নাটক দেখতে আসবেন বীরেশ্বরবাবু। অধর আরও জানালেন বীরেশ্বর নাকি এখন আমার নেকনজরে পড়বার জন্যে পাগল। তার জন্য যে-কোনো মূল্য দিতেই তিনি রাজী।

আমি তখনও 'বন্দেমাতরম'-এ নারী বিপ্লবী রীণা দাসের অভিনয় করছি। আমারই হাতের রিভলবার থেকে গুলি লাট-সাহেবের দেহের দিকে ছুটে গিয়েছে। পুলিসের শত অত্যাচারেও আমি মুখ খুলি নি।

কোথায় রীণার সেইসব অগ্নিগর্ভ সংলাপ, আর কোথায় অধরদার আজব কথাবার্তা। অধরদা শুকনো মুখে বললেন,

"মেয়েরাই তো বারবার আমাদের উদ্ধার করেছে। তোদের ত্যাগেই তো স্টার থিয়েটারের বাড়ি উঠেছিল।"

এসব অধরদা আমাকে কী বলছেন! আমি রাগ করে ওঁর সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছি। গোপনে খোঁজখবর নিয়েছি, অন্য কোনো থিয়েটারে আমার জায়গা হবে কিনা। আমার সময় খারাপ। ছোটখাট পার্ট জুটলেও জুটতে পারে, কিন্তু মধুমালতীকে এখন কেউ হিরোইন করতে চায় না। কিন্তু হিরোইন না হলে মধুমালতীর কী অবশিষ্ট রইলো? তাছাড়া অধরদা আমাকে আরও ভাবিয়ে তুললেন। ছোটখাট পার্ট করে আমার না-হয় পেট চলে যাবে। সময় ভাল হলে আবার না-হয় নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করলাম। কিন্তু কোহিনূরের এই পঁচাত্তরজন লোক কোথায় যাবে?

দু'দিন আমি সারাক্ষণ চিন্তা করেছি। বিনোদমাসীর জীবনের গল্পটা তখন জেনেও আমি যেন হঠাৎ ভুলে গেলাম। বিনোদ-মাসী নতুন স্টার থিয়েটারের টাকা তোলার জন্যে যা করেছিলেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো মেয়ে কখনও করে নি। এক অবাঙালী ধনীর কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকায় নিজেকে বেচে দিয়েছিলেন। তখন বড়লোক গুর্মুখ রাই রূপসী বিনোদমাসীকে পাবার জন্যে পাগল। এইসব পুরুষসিংহের পাল্লায় একবার পড়লে রক্ষে নেই। এদের কাছে ধরা দেবার অর্থ কি তাও জানতেন বিনোদমাসীমা। কতই বা তখন বিনোদমাসীর বয়স। বড় জোর কুড়ি। অনেক ভেবে-চিন্তে অন্য কোনো পথ খুঁজে পেলেন না। শেষে বিনোদমাসী গুর্মুখ রাইকে বললেন, "আগে থিয়েটার তৈরি করে দাও তবে আমাকে পাবে।" গুর্মুখ রাই সুন্দরীকে বুঝিয়েছিলেন, "থিয়েটারের হাঙ্গামায় গিয়ে কী হবে? তোমাকে আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্যাশ দিচ্ছি।" কিন্তু নটী-বিনোদিনীর এক কথা, "যতক্ষণ না থিয়েটার বাড়ি তৈরি করে দিচ্ছো, ততক্ষণ আমাকে পাবে না।"

এসব কতদিন আগেকার কথা। এতদিন পরে অভাগিনী আমার সামনে আবার সেই একই অগ্নিপরীক্ষা। আমি সংশয়ের দোলায় দুলছি। বীরেশ্বরবাবুকে আমি যতটা দেখেছি, তাতে তো তাঁকে বিনোদমাসীর পুরুষমানুষ গুমুখ রাই-এর মতো বোকা মনে হয় নি। সামান্য এক নটীকে সন্তুষ্ট করবার লোভে বীরেশ্বর কেন এই লাইনে আসতে যাবেন ?

বিনিদ্র বিছানায় সারা রাত ভাবতে ভাবতে আমার মনে নতুন সন্দেহ দেখা দিয়েছে। অধরদার একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছে, বিনোদিনী এবং আমার মধ্যে শক্তি পরীক্ষা হোক। মধুমালতীর কতখানি মনোহারিণী ক্ষমতা তা দেখা যাক।

আমি স্বপ্নে দেখলাম, রাজনটী রাগমালার রূপসজ্জায় আমি যেন আবার সম্রাটের মনোহরণে নেমেছি। এ আমার নতুন অগ্নিপরীক্ষা।

মধুমালতীর শোবার ঘরে বীরেশ্বর আপন মনে দোলনায় দুলছেন।

সেই স্মরণীয় শনিবারে কোহিনূর থিয়েটারের ছ নম্বর সীটে বসেই তিনি অগ্নিযুগের নায়িকা রীণা দাসকে দ্বিতীয়বার দেখছিলেন। বিরতির সময় অধর এসে খোঁজ করে গেলো।

বীরেশ্বরের ইচ্ছে শোয়ের শেষে মধুমালতীকে নিজের গাড়িতে কেষ্টদাস কুণ্ডু স্ট্রীটে পৌঁছে দিয়ে আসেন। অধর মাথা চুলকে বলেছিল, "জিজ্ঞেস করে দেখি। ভীষণ খেয়ালী মেয়ে তো। একবার না বললে, কার সাধ্য হ্যাঁ করায়।"

বীরেশ্বর ভেবেছিলেন, খেয়ালী বলেই তো পোষ মানাতে মজা আছে।

শোয়ের শেষে অধর চুপি-চুপি বীরেশ্বরকে বললো, "মধুমালতী এখন অগ্নিযুগের নায়িকার মেজাজে রয়েছে, বলতে সাহস হলো না। আপনি নিজেই একবার কথাটা তুলে দেখুন।"

বীরেশ্বর ভেবেছিলেন তাঁর প্রস্তাবে হয়তো বিস্ফোরণ হবে। কিন্তু কি আশ্চর্য, মধুমালতী কোনোরকম আপত্তি করলো না। মিষ্টি হেসে বীরেশ্বরকে বললো, "চলুন।"

গাড়ির মধ্যে মস্ত একটা ফুলের তোড়া রেখেছিলেন বীরেশ্বর। বাড়ির সামনে গাড়ি রেখে বিরাট সেই ফুলের তোড়া নিয়ে বীরেশ্বর ওপরে উঠে এলেন। বীরেশ্বরকে বসতে দিয়ে মধুমালতী দ্রুত কাপড় ছাড়তে গেলো। বীরেশ্বরের হৃদয়ে তখন অনিশ্চিত রোমান্সের দ্রুতস্পন্দন। আশা-নিরাশার দোলায় তখন তিনি দ্রুত দুলছেন।

জামাকাপড় ছাড়তে বেশি সময় লাগে নি মধুমালতীর। ামান্য কয়েক মিনিটে অভিনেত্রীরা যে কী রকম সাজসজ্জা পালটে ফেলতে পারে তার নমুনা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন বীরেশ্বর।

গাড়িতে কথায়-কথায় বীরেশ্বর বলেছিলেন, স্বদেশিনী রীণা দাসের কাছে তিনি কী রকম অস্বস্তি বোধ করেন। মধু মিষ্টি হেসে বলেছিল, "কেন? আপনিও তো একদিন এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন?"

এই ক'মিনিটে অগ্নিযুগের অগ্নিকন্যা রীণা দাসকে বিদায় দিয়ে রাজনটী রাগমালা রাজার বিজন কক্ষে ফিরে এসেছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য বীরেশ্বর তাঁর অতীত ও বর্তমান ভুলে গিয়েছিলেন। মনে হলো তিনিও যেন মঞ্চে রাজা-রাণী নাটকে অভিনয় করছেন। বীরেশ্বর সেই মুহূর্তে কী সংলাপ বলেছিলেন এবং রাগমালা তার কী উত্তর দিয়েছিল তা স্মরণ করতে পারছেন না বীরেশ্বর। শুধু মনে

আছে, সমস্ত দ্বিধা ও সংকোচ কাটিয়ে নতজানু রাজা বীরেশ্বর যৌবনমদমত্তা রাগমালার কৃপাভিক্ষা করেছিলেন।

লাস্যময়ী রাগমালা অনুরাগে রক্তিম মুখে বলেছিল, পরিবর্তে সে যদি অনেক কিছু চেয়ে বসে। শেয়ার বাজারের বীরেশ্বর রক্ষিত এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে ফাটকা খেলেছিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করে ছিলেন, রাগমালার অনুগ্রহ লাভ করলে তার কোনো অভিলাষই তিনি অপূর্ণ রাখবেন না।

মালতী তখন রাজা-রাণী নাটকের সেই বিখ্যাত সংলাপ ব্যবহার করেছিল। "হে বিদেশী, লালসায় আসিয়া প্রেমকথা কহিয়া মন মুগ্ধ করিবার মানুষের অভাব নাই। কিন্তু কে হৃদয়ের পরীক্ষা দিবে?"

বীরেশ্বরের মনে পড়লো, সেই রাত্রের পরবর্তী ঘটনার নীরব সাক্ষী হয়ে আছে এই পবিত্র শয়নমন্দির। এই ঘরের ইঁট, কাঠ, পাথর ও তুলো জানে রাজনটীর সান্নিধ্য ভিক্ষায় এসে ভাগ্যবান বীরেশ্বর কেমন করে অর্ধেক রাজত্বও লাভ করলেন। কোহিনূর থিয়েটারের জমিটাই কিনেছিলেন বীরেশ্বর। নিবিড় আলিঙ্গনে ধরা দেবার আগে রাজনটী বহু অর্থ ও হীরা মণিমাণিক্য দাবি করবে, আশঙ্কা করেছিলেন বীরেশ্বর। কিন্তু রাগমালা এসব কিছুই চাইলো না। মধুমালতী শান্তভাবে বললো, "আমার একটাই প্রার্থনা আছে, বীরেশ্বরবাবু। আমাদের থিয়েটার যাতে বন্ধ না হয়, আপনি দেখবেন।"

"এ আর এমন কি ব্যাপার, মধু!" বীরেশ্বর সেই রাত্রে মধুমালতীর অনাবিষ্কৃত উষ্ণ দেহকে নিবিড় আলিঙ্গনে বন্দী করবার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, "তুমি আমাকে নতুন সৌভাগ্য এনে দিয়েছো, মধু। সমস্ত জীবন ধরে তোমার কোনো ইচ্ছা অপূর্ণ রাখবো না।"

সৌভাগ্য বলতে মধু কি বুঝেছিল কে জানে, কিন্তু বীরেশ্বরের মাথায় ছিল শেয়ার বাজারের কথা—মালতীর আকস্মিক স্পর্শে

ভাগ্যবান হয়ে দ্বিতীয় দিনেও মার্কেট থেকে মোটা টাকা রোজগার করেছিলেন বীরেশ্বর রক্ষিত।

সে-রাত্রে আর বাড়ি ফেরা হয় নি বীরেশ্বরের। তাঁর মনে হলো, জ্যোৎস্না রাতে সীমাহীন সমুদ্রের উপর রাজা ও রূপসী ভেলা ভাসিয়ে দিয়েছেন। মালতী চায় নি, কিন্তু নবার্জিত নারীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য বীরেশ্বর সদর্পে প্রতিজ্ঞা করেছেন, "আমি তোমাকে বাংলায় নাট্য সম্রাজ্ঞী করে তুলবো।"

"নাট্যসম্রাজ্ঞী একজন আছেন," মধুমালতী মনে করিয়ে দিয়েছিল বীরেশ্বরকে।

থিয়েটারের অতশত খবর রাখেন না বীরেশ্বর। মাথা চুলকে বলেছেন, "বেশ, তুমি তাহলে হবে নাট্যেশ্বরী।"

ক্ষুদ্র এই লালসার জগতে পবিত্র ঈশ্বরকে টেনে আনবার কোনো ইচ্ছা নেই মধুমালতীর। তাই সে চুপ করে রইলো, বীরেশ্বরের প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারলো না। তখন বীরেশ্বর বলেছিলেন, "বেশ, নাট্যজগতের তুমিই হবে কোহিনূরমণি।"

অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে অভিভূত বীরেশ্বর সেদিন নটী মধু-মালতীর রমণীয় পাদপদ্মে আরও অনেক কিছু নিবেদন করেছিলেন।

"তুমি কি কোহিনূর থিয়েটারের মালিক হতে চাও?"

না, মধুমালতীর মনে নাট্যালয়ের মালিক হবার কোনো অভিলাষ নেই। সে শুধু চেয়েছিল পঁচাত্তরটা ভাগ্যহীন পরিবারকে অনশনের হাত থেকে রক্ষা করতে। চোখের জল চেপে রেখে মধুমালতী বলেছিল, "বীরেশ্বরবাবু, কোহিনূর থিয়েটার যেন চালু থাকে—আমি আর কিছুই চাই না আপনার কাছ থেকে।"

একগাল হেসে ধনপতি বীরেশ্বর বলেছিলেন, শয্যাসাক্ষী রেখে যে কথা দিয়েছি তার হেরফের হবে না। আমি অর্ডার দিয়ে দেবো,

কোহিনূরের কর্মচারীরা প্রতিদিন বিকেলে এসে তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে তবে কাজ আরম্ভ করবে।

পায়ের ধুলো থিয়েটারের লোকরা একজনেরই নেয়—তিনি পতিতপাবন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর পবিত্র স্পর্শে একদিন বিনোদ-মাসীর মধ্যেকার পাষাণী অহল্যা মুক্তি পেয়েছিল। বিনোদমাসীর অভিনয় দেখে মুগ্ধ ঠাকুর তো আশীর্বাদ করেছিলেন, "তোর চৈতন্য হোক।" এর থেকে বড় আশীর্বাদ আর কী হতে পারে মধুমালতী বুঝতে পারে না।

মধুমালতী থিয়েটারে ঢোকার পরে একদিন মনের দুঃখে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বিনোদমাসীকে বলেছিল, "তাহলে মাসী, আমি নরকে পড়ে থাকবো, তুমি যে মাকে বলেছো?" বিনোদমাসী ছোট মেয়েকে আচমকা দুঃখ দিয়ে মনোকষ্ট পেয়ে-ছিলেন। কিশোরী মধুমালতীকে কাছে ডেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বিনোদিনী বলেছিলেন, "অবলা মেয়েদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে নরকে নিয়ে যেতে থিয়েটার-বাবুদের তুলনা নেই। কিন্তু তোর কোনো ভয় নেই। থিয়েটারের সবার পিছনে ঠাকুর রামকৃষ্ণের আশীর্বাদ রয়েছে—ওদের চৈতন্য হবেই হবে।"

বিবেকানন্দের কথাও মধুমালতীকে বলেছিলেন বিনোদমাসী। থিয়েটারের সাজঘরে বসে নটনটীরা কতদিন সেই আশ্চর্য মানুষের গান শুনেছে। বিনোদমাসী বলেছিলেন, "তিনি বিভোর হয়ে গিরিশবাবুর লেখা গান গাইছেন এবং আমরা চোখের জল মুছতে মুছতে শুনছি—জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই।"

"কী হলো মধু? কথা বলছো না কেন?" মালতী-পাদপদ্ম-পূজারী বীরেশ্বর স্মরণীয় সেই রাত্রে নীরব শয্যাসঙ্গিনীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

মধুমালতী শান্তভাবে বলেছিল, "আমি থিয়েটারের মালিক হতে চাই না, বীরেশ্বরবাবু। আমি কেবল অভিনেত্রী হতে চাই—

নটী বিনোদিনীর মতো। অনেক অনেক দিন পরে যখন আমি এই পৃথিবীতে থাকবো না, বিনোদিনীর মতো তখনও যেন নটী মধুমালতীর অভিনয়ের কথা লোকের স্মরণে থাকে। রেখো এ দাসীরে মনে, এ মিনতি করি পদে।”

ঠক করে শব্দ হলো ঘরে। দোলন থামিয়ে বীরেশ্বর দেখলেন পুজো শেষ করে মধুমালতী ঘরে ঢুকছে। দেওয়ালে টাঙানো রাজনটী রাগমালার সঙ্গে এখনকার মালতীর মুখটা মিলিয়ে নিলেন বীরেশ্বর। সিনেমা-থিয়েটারের নায়িকাদের বেশীক্ষণ ঠাকুর-ঠাকুর করা উচিত নয়—তাতে ওদের ক্ষতি হয়, সেক্সগ্ল্যামার একশ ওয়াট থেকে বিশ ওয়াটে নেমে আসে, বীরেশ্বর ভাবলেন। যৌবনধন্যা যে রাজনটীর কটাক্ষ সহস্র পুরুষহৃদয়ে কামনার দাবদাহ ছড়িয়ে দিতো, সেই চিরন্তন উর্বশীকে আজকের ঠাকুরভজা মধুমালতীর মধ্যে বীরেশ্বর খুঁজে পাচ্ছেন না। মধুমালতীর দেহের দিকে আর একবার নজর দিলেন বীরেশ্বর। যৌবনের ঐশ্বর্য এখনও নিঃশেষিত হয়নি, মধুমালতীর বক্ষসম্পদ এখনও আশ্চর্য। কিন্তু মধুমালতী যেন তার যৌবনের আকর্ষণী শক্তি হারিয়ে ফেলছে।

বীরেশ্বরের মনের এইসব ভাবনা কিন্তু বাইরে প্রকাশ পাচ্ছে না। এই বীরেশ্বরকে ধরা মধুমালতীর মতো সরলা নারীর কাজ নয়।

দু'জনে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া শেষ করলেন। মধুমালতীর আইনকানুন বাড়ির মতই কড়া হয়ে উঠেছে ক্রমশ। রান্নায় আলু নেই—যদিও আলু বীরেশ্বরের প্রিয় খাদ্য। আশ্রিতারা এই মুহূর্তে বিশিষ্ট অতিথির জন্যে মদের বোতল বার করে। বীরেশ্বরের হয়েছে মুশকিল। মধুমালতী ড্রয়ার থেকে ডাইজিপ্লেক্সের শিশি বার করলো। বীরেশ্বরের নিয়মিত অভ্যাস যাতে কেষ্টদাস কুণ্ডু স্ট্রীটে এসে নষ্ট না হয় সেইজন্যে মধুমালতী স্পেশাল ব্যবস্থা করে রেখেছে।

বিছানায় এসে বসলো মধুমালতী। বীরেশ্বর বললেন, "আজকের তারিখটা মনে আছে মধু ?"

মধুর খুবই মনে আছে। কয়েক বছর আগে এমনই এক ২১শে জানুয়ারির রাত্রে এই ঘরেই তো মধুমালতী নিজেকে বীরেশ্বরের কাছে বন্ধক রেখে কোহিনূর থিয়েটারকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল। বীরেশ্বর সেদিন যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, মধুমালতীর হৃদয়সাগরে ডুব দেবার জন্যে যেসব অযাচিত প্রস্তাব এনেছিলেন তা যদি মধুমালতী টেপরেকর্ড করে রাখতো, তাহলে আজ তা বীরেশ্বরকে শোনানো যেতো।

"আমি চিঠি না লিখলে আজ আপনি আসতেন ?" শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো মধুমালতী।

বীরেশ্বর অভিনয়ের স্টাইলে অর্ধেক চোখ বুজে, ভারি গলায় বললেন, "কী যে বলো, মালতী ? আজ আমি এখানে না এসে পারি ? ভেবেছিলুম আচমকা মাঝরাতে ফুলের মালা নিয়ে হাজির হবো। একতলার সিঁড়ির কাছে দাঁড়ানো তোমার নেপালী দারোয়ানটা আমাকে দেখে অবাক হয়ে যাবে।"

"দারোয়ানটা আমার নয়, আপনিই ওর মাইনে দেন, বীরেশ্বরবাবু," অপ্রিয় সত্যটা শান্তভাবে মধুমালতী রাতের অতিথিকে মনে করিয়ে দিলো।

"তোমারই নিরাপত্তার জন্যে দারোয়ান রাখা মধু। হরেন নিয়োগীর থিয়েটারের মধুমালতী আর বীরেশ্বরের কোহিনূর থিয়েটারের মধুমালতী তো এক নয়। আর যা দিনকাল পড়েছে। মানুষের যেরকম নৈতিক অধঃপতন হচ্ছে—পার্সোনাল দারোয়ান ছাড়া কোনো সমর্থ মেয়েই সেফ নয়।"

মধুমালতী অভিনেত্রী। মুখে একটুও ভাব না প্রকাশ করে মনে মনে হাসতে পারে। অমূল্যদি নিজের কানে শুনেছে, বীরেশ্বর দারোয়ানকে বলছেন, "পুরুষমানুষ কেউ আসছে কিনা নজরে

রাখবে। দিদিমণির গানের মাস্টারমশায় কতক্ষণ থাকে প্রতিদিন নোট করবে।"

বীরেশ্বর এবার বললেন, "আমি ভেবেছিলুম, নিশীথ রাতে যখন ঢুকবো তখন তুমি একটা চমৎকার ডায়ালগ দিয়ে আমাকে রিসিভ করবে—ওরে বাজারে শঙ্খ বাজা, এসেছে আজ আঁধার ঘরের রাজা।"

"কালের কালিমা নাটকে ওই ডায়ালগটা আমার নয়—লিপিকা ওর জন্যে হাততালি পায়," মধুমালতী শান্তভাবে বীরেশ্বরকে মনে করিয়ে দিল।

মধুরমিলনের এই যামিনীতে দু'জনের মধ্যে আচমকা থার্ড পার্টির প্রসঙ্গ উঠতেই বীরেশ্বর সজাগ হয়ে উঠলেন। এর জন্যে তিনি ঠিক প্রস্তুত ছিলেন না—একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন তিনি।

এই ডায়ালগটা নিয়ে ভিতরে ভিতরে যে অনেক কাণ্ড হয়েছে তা মধুমালতীর অজানা নয়। অধর চাটুজ্যে একদিন চুপিচুপি মধুমালতীকে বলেছিলেন, "থার্ড সীনে তোর জন্যে একখানা ডায়ালগ যা দিয়েছি না—হল তোর কথায় ফেটে পড়বে।" সংলাপটার জন্যে মধুমালতী তৈরি হয়েছিল। দর্শকদের কাছে নতুন ধরনের একটা কাজ দেখাবে সে। কিন্তু রিহার্সালে দেখা গেল ডায়ালগটা লিপিকার মুখে। বীরেশ্বরের হুকুমেই যে সংলাপটা লিপিকার মুখে বদলী হয়েছে তা বুঝতে পেরেছে মধুমালতী। বীরেশ্বর মুহূর্তের জন্যেও অপ্রস্তুত হলেন না। নিজেকে সামলে নিয়ে, মধুমালতীকে এখনকার মতো শান্ত করবার জন্যে বললেন, "নাটকের প্রয়োজনে লিপিকার মুখেই কথাটা মানায়। কালের কালিমা তো লিপিকার ওপরেই পড়ছে। মধু—তুমি তো মহাকালের সোনালী প্রতিমা হয়ে দর্শকদের মনের সিংহাসনে বসে থাকছো।"

এই সামান্য ক'বছরে কী সুন্দর সব ডায়ালগ আয়ত্ত করেছেন বীরেশ্বর রক্ষিত। বীরেশ্বর নিজেই এক একসময় অবাক হয়ে

যান। অধর চাটুজ্যেকে তিনি হুকুম করেছিলেন, যেখানে যা ভাল সংলাপ পাবে তা আমার জন্যে সংগ্রহ করবে। আমাকে এসে শোনাবে। এর জন্যে তোমাকে আমি মাসে দশটাকা করে স্পেশাল অ্যালাউন্স দেবো।

বেটাচ্ছেলে অধরটা এখানে থাকলে ভাল হতো। একটা তাক-লাগানো সংলাপ দিয়ে মধুমালতীর মুখের অমাবস্যা ঘুচিয়ে দেওয়া যেতো।

বীরেশ্বর এবার মধুমালতীকে একটু আদর করবেন ঠিক করলেন। প্রেমিকের মতো গদগদভাবে বীরেশ্বর বললেন, "মধু, অনেক বছর আগে এই রাতের নিমন্ত্রণ আমি নিজেই চেয়ে নিয়েছিলাম। সেই রাতে তোমার ও আমার জীবন পাল্টে গেলো। আজ ঠিক সেই রাতে তুমিই আমাকে পত্র লিখে ডেকে পাঠালে।"

মধুমালতী চুপ করে রইলো। বীরেশ্বর বললেন, "সেই রাতের আগে তুমি আমাকে দেখলেই বিরক্ত হয়ে উঠতে, মনে আছে?"

বীরেশ্বরের শিথিল আলিঙ্গনে বন্দিনী মধুমালতী এখনও নির্বাক। বীরেশ্বর বললেন, "আমার মনে সন্দেহ জেগে উঠেছিল। হয়তো আমি আর এগোতাম না। ঠিক সেই সময় আমার বন্ধু নেদো মল্লিক বললেন, রাজনটী রাগমালার একটা বিব্বোক দৃশ্য আছে। ওই রকম শব্দ আমি শুনি নি। নেদোবাবু আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, অহঙ্কারবশে নারী প্রিয়বস্তুতে যে অযথা অনাদর প্রকাশ করে তার নাম বিব্বোক।"

মধুমালতীর চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে। বীরেশ্বর স্নেহভরে বললেন, "ঘুমিয়ে পড়ো, তুমি খুব ক্লান্ত আজ।"

মধুমালতী ভাবছে, যে জন্যে বীরেশ্বরকে ডেকে পাঠানো তা এবার বলবে কিনা। কাজের কথা আছে বলেই, নিজের লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিয়ে সে আজ বীরেশ্বরকে চিঠি লিখেছিল। বীরেশ্বর

আজ আবার শয্যায় ধরা দিয়েছেন, যা-কিছু জটিল সমস্যা আছে তার ফয়সালা করবার এই তো প্রকৃষ্ট সময়।

কথাটা অবশ্যই লিপিকা সম্বন্ধে। কিংবা ভেবে দেখলে, মধুমালতীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। নায়িকা মধুমালতীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইদানীং চিন্তা দেখা দিয়েছে। সেই সম্বন্ধেই সে খোলাখুলি প্রতিশ্রুতি চায় বীরেশ্বরের কাছ থেকে।

নিজেকে হঠাৎ ভীষণ দুর্বল মনে হচ্ছে মধুমালতীর। বীরেশ্বর-বাবু তো তার স্বামী নয়—অগ্নিসাক্ষী করে তার আমরণ দায়িত্ব তো তিনি গ্রহণ করেন নি। যে নারী অপরের রক্ষিতা, তার ভবিষ্যৎ চিন্তা তো তার নিজেরই। নিজের মা ও বিনোদমাসী—দু'জনের বিষণ্ণ মুখই মধুমালতী এই অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পাচ্ছে। নিরাপত্তা, স্বামী ও বিবাহিত জীবনের লোভ বিনোদমাসীকে পাগল করে তুলেছিল। তারই আকর্ষণে খ্যাতির মধ্যগগনে মাত্র তেইশ বছর বয়সে নটী বিনোদিনী রঙ্গমঞ্চের স্বর্ণসিংহাসন ত্যাগ করে সিংহ মশায়ের আশ্রয়ে চলে গিয়েছিলেন। যতদিন সিংহমশায় বেঁচে-ছিলেন ততদিন প্রায় বিবাহিতা স্ত্রীর সম্মান ও সুরক্ষা পেয়েছিলেন বিনোদমাসীমা। একটি মেয়ের মাও হয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের দেবতা শকুন্তলা ও সিংহমশায় দু'জনকেই কেড়ে নিলেন। বিনোদিনী আবার নিরাশ্রয় হয়ে রাজাবাগানে ফিরে এলেন।

থিয়েটারের অভাগিনী অভিনেত্রীদের জন্যে ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নেই—বেশ বুঝতে পারছে মধুমালতী। এখন ওই সব কথা তুলে বীরেশ্বরের কাছে মধুমালতী নিজেকে ছোট করবে না। মধুমালতী এবার বীরেশ্বরের দিকে নিজের হাত এগিয়ে দিলো।

বীরেশ্বর দেখলেন, অন্ধকারে মধুমালতী নরম নরম সরু সরু আঙুল দিয়ে তাঁর রোমশ বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। মন্দ লাগছে না বীরেশ্বরের। তবু ভদ্রতা করে বললেন, "তুমি শুধু শুধু কষ্ট করছো কেন, মধু?"

অন্ধকারে মধুমালতীর হাসি বীরেশ্বর ভাগ্যে দেখতে পেলেন না। মধুমালতী মনে মনে বলছে, "আমি শুধু শুধু আপনার বুকে হাত বুলোচ্ছি না! ঠাকুর, তুমি এখানে চৈতন্য দাও! মালিক, নাট্যকার ও নির্দেশক বীরেশ্বর রক্ষিতের হৃদয়ের এইখানে বিবেকের স্নিগ্ধ প্রদীপটি তুমি জ্বেলে দাও, ঠাকুর।"

"মধুমালতী ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু আমি কেমন জেগে আছি। অথচ কয়েক বছর আগে এইরাত্রে নারীদেহমত্ত আমি কি মালতীকে ঘুমোতে দিয়েছিলাম?" বীরেশ্বর রক্ষিত এখন নিজের সঙ্গেই কথা বলছেন।

কয়েকটা নাটকীয় দৃশ্য পরপর দেখতে পাচ্ছেন বীরেশ্বর রক্ষিত। "অভাগারা নাকের বদলে নরুন পায়, আর ভাগ্যবান বীরেশ্বর নরুনের বদলে একটা নাক পায়," বলেছিলেন নেদো মল্লিক।

"মনের মানুষ পেলে, সেই সঙ্গে একটা নতুন বিজনেস," নেদো মল্লিকের পরবর্তী মন্তব্য।

নেদোর আর এক মন্তব্যে বীরেশ্বর মনে মনে খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন। নেদো বলেছিলেন, "নিজস্ব সংবাদদাতা, শেয়ার মার্কেট, সিমেন্ট, রিয়েল এস্টেট—এসব ব্যবসায় অনেকেই টু-পাইস কামিয়েছে। কিন্তু পঞ্চম অঙ্কের এই বিজনেসে লোকে টাকা ওড়াতে আসে।"

অধর চাটুজ্যে সেখানে বসেছিল। মাথা চুলকে বেচারা জিজ্ঞেস করে ফেলেছিল, "আপনি স্যর, রিপোর্টারি লাইনেও ছিলেন নাকি?"

বীরেশ্বর প্রচণ্ড এক ধমকে অধরকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন দিনকাল পাল্টেছে।

অধর চাটুজ্যেকে যে-কারণে তৈলায়িত করা হয়েছিল সে-কাজ ফুরিয়েছে। এখন বীরেশ্বর রক্ষিত কোহিনূর থিয়েটারের হর্তা-কর্তা বিধাতা—নতুন মালিকের মেজাজ বুঝে-সুঝে অধর চাটুজ্যেকে কথাবার্তা বলতে হবে। নাট্যকার অধর চাটুজ্যে গরীব হলেও চিরকাল অভিনেতা, অভিনেত্রী ও মালিকদের ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছে। এই ধরনের অভিজ্ঞতা এর আগে কখনও হয় নি। প্রথমে একবার জ্বলে ওঠবার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং পেটের কথা ভেবে অধর চুপ করে গেলো।

নেদো মল্লিক এসব লক্ষ্য করলেন না। ফিসফিস করে বীরেশ্বরকে বললেন, "মহিলা-মৃগয়ায় বেরিয়েও যদি তুমি টু-পাইস কামাতে পারো, তা হলে ওয়ার্লডের ফাইনানশিয়াল হিস্ট্রিতে তোমার নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।"

নাট্যকার অধর চাটুজ্যে এখন বীরেশ্বরের কথায় উঠছে-বসছে। না-উঠে উপায় কি? "ছ-সাতটি ছেলেপুলে, স্যর," অধর কাঁদ-কাঁদ অবস্থায় বীরেশ্বরের কাছে নিবেদন করেছিল।

"আমার নাট্যকারটির সৃজনী প্রতিভা নিজের বাড়ির মধ্যে বেশী পরিস্ফুট," বীরেশ্বর দাঁতে দাঁত চেপে একবার নেদোর কাছে মন্তব্য করেছিলেন।

"অধর।" বীরেশ্বর ডাক দিয়েছিলেন। "তুমি তো এই নাট্য-জগতের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি সব জানো। বলো তো, এ-লাইনে সব মালিকই কি লোকসান খেয়েছে?"

"মোটেই না, স্যর," প্রতিবাদ করলো অধর চাটুজ্যে। "বাবু প্রতাপচাঁদ জহুরীর কথা ধরুন। ন্যাশনাল থিয়েটার নীলামে ওঠায় মাড়োয়ারি প্রতাপচাঁদ সেই থিয়েটার কিনেছিলেন। বেশ টু-

পাইস কামিয়েছিলেন। বিজনেস করতে জানতেন ভদ্রলোক কিন্তু আর্টিস্টদের টাকা দিতে চাইতেন না তেমন। শেষকালে বিনোদিনীর সিকলিভ পে নিয়ে গণ্ডগোল হলো। অসুস্থ হয়ে বিনোদিনী সামান্য কিছুদিন পশ্চিমে গিয়েছিল। কর্তা বললেন, মাইনে দেবো না। তখন গিরিশবাবু থেকে আরম্ভ করে সবাই একসঙ্গে প্রতাপচাঁদ জহুরীর থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এলেন।"

"ন্যাশনাল থিয়েটারটা যেন কোথায় ছিল?" বীরেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন।

"এখন যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার ঠিক সেই জায়গায়।" "মনমোহন পাঁড়ে মশায়ও এই থিয়েটার-লাইনে টাকা কামিয়েছিলেন।"

অধর চাটুজ্যে আরও কয়েকটা নাম মনে করবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু বীরেশ্বর তাকে তখনকার মতো বিদায় দিলেন। বীরেশ্বর এবার নেদোকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বললেন, "আমার সঙ্গে একটা বাজী লড়বে নাকি? এই থিয়েটার থেকে আমি শুধু বস্তা বস্তা টাকা কামাবো না, আরও অনেক কিছু করবো। আমার বিজনেস বুদ্ধিতে বলছে, একদল বেটাছেলে আর মেয়েমানুষ মুখে চুনকালি মেখে কাঠের স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে বকাবকি, কাঁদাকাঁদি, হাসাহাসি করবে—এতে লোকসানের চান্স কোথায়?"

"বাঃ, বেশ বলছো, বীরেশ্বর," নেদো মল্লিক তারিফ করেছিলেন। বীরেশ্বর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছিলেন, "রঙ মেখে সঙ সাজার নামই তো থিয়েটার।"

ভাগ্যে অধর চাটুজ্যে এই কথাটা শুনতে পায় নি। তাহলে বেচারা হয়তো ঐখানেই ভিরমি খেতো।

হরেন নিয়োগীকে বিদায় করে কোহিনূরের নতুন গদিতে বসবার পরেই বীরেশ্বর পুরনো কর্মচারীদের ঠিকুজীকোষ্ঠী এক নজরে

দেখে নিয়েছেন। নিজের মনস্কামনা পূরণের জন্যে বীরেশ্বর দুটো লোককে নির্বাচন করেছেন—নরহরি ব্যানার্জি এবং অধর চাটুজ্যে। নরহরি তিন পুরুষ এই থিয়েটার লাইনে।

অধর চাটুজ্যের বাবা সারা জীবন রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে জড়িত থেকে এই থিয়েটার স্টেজেই মারা গিয়েছিলেন। সে এক নাটকীয় যবনিকাপাত—থিয়েটার প্রম্পটারের যোগ্য মৃত্যু। সে-গল্প অধরের মুখে এই থিয়েটারের অনেকেই শুনেছে। অধর বলেছিল, "তারিখটা আমার মনে গেঁথে আছে—১৩ই পৌষ, ১৩১৬ শনিবার। বীডন স্ট্রীটের কোহিনূর থিয়েটারে হরিপদ মুখোপাধ্যায়ের নতুন নাটক রাণী দুর্গাবতার প্রথম অভিনয়রজনী। হলে অনেক লোক। মালিক শিশিরকুমার রায় নিজে ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছেন। ছোকরা নাট্যকার হরিপদ নিজে দু'বার স্টেজের ভিতর ঘুরে গেলেন এবং আমার বাবার সঙ্গে কথা বললেন।" একটু থেমে অধর বলে, "এই হরিপদ মুখুজ্যে কে জানো তো? এখনকার লেখক শংকরের বাবা। যা হোক, রাণী-দুর্গাবতী নাটকের চতুর্থ অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্যে অধর চাটুজ্যের বাবা গড়মণ্ডলেশ্বরী দুর্গাবতীর পার্ট প্রম্পট করছেন। মালবাধিপতি বজবাহাদুরকে দুর্গাবতী বলছেন—'বহুদিন ব্যাপিনী কালনিদ্রা এক দিনের চেষ্টায় ভঙ্গ হবে না বাহাদুর। অনন্ত কার্যক্ষেত্র সম্মুখে বিস্তীর্ণ, আমাদের কার্য সুখ্যাতির জন্য নয়, ইতিহাসে স্থানলাভের জন্য নয়, আমাদের কার্য দেশের জন্য, কর্তব্যের জন্য।' বলতে বলতে অসহ্য যন্ত্রণায় বাবা বুক চেপে ধরলেন এবং ওইখানেই তাঁর পতন ও মৃত্যু। প্রথম রজনীর অভিনয় বন্ধ রাখা যায় না। দর্শকরা কেউ কিছু জানতে পারলো না। অভিনয় চলতে লাগলো। বাবার দেহটা ওরা আমাদের বাড়ি পৌঁছে দিলো।"

নরহরি ও অধরের কথাবার্তা হাবভাব থেকে বীরেশ্বরের এক এক সময় মনে হয় এদের দুজনের জন্মও এই স্টেজের

সাজঘরে। নাটক ও রঙ্গমঞ্চ ছাড়া এরা আর কিছুই জানে না। অধরকে এ-বিষয়ে কিছু বলবার উপায় নেই। অধর সঙ্গে সঙ্গে কোটেশন দেয়। "স্যার, গিরিশ ঘোষ বলেছিলেন: সংসার বৃহৎ রঙ্গালয়, নাট্য রঙ্গালয় তারই ক্ষুদ্র অনুকৃতি।"

থিয়েটারের নতুন ব্যবসায় এই নরহরি এবং অধরকে ঠিকমতো কাজে লাগাবেন, মনস্থির করেছিলেন বীরেশ্বর। কিন্তু তাদের ব্যাপারটা বুঝতে দেন নি। নতুন মালিকানায় নিজেদের চাকরি থাকবে কি থাকবে না, এই দোলায় ওরা দুজনেই একটু দুলুক।

থিয়েটারের নাম কি হবে এ নিয়েও কথা উঠেছিল। নরহরি ব্যানার্জি গদগদ হয়ে বলেছিল, "স্যার, নাম রাখুন—বীরেশ্বর থিয়েটার।"

"নিজের নামে কেউ থিয়েটারের নাম রাখে নাকি?" বীরেশ্বর জানতে চেয়েছিলেন। নরহরি বলেছিল, "কেন রাখবে না, স্যার? মনমোহন পাঁড়ে তো পুরনো কোহিনূর কিনে নিয়ে নিজের নামেই রেখেছিলেন মনমোহন থিয়েটার।"

বীরেশ্বরের চোখের সামনে তখন মধুমালতীর মিষ্টি মুখটা ভাসছে। "ম' দিয়ে কিছু নাম করা যায় না?" অধরের মতামত জানতে চেয়েছিলেন বীরেশ্বর।

অধর আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছিল, "খুব সুন্দর নাম হতে পারে—একেবারে নতুন ধরনের নাম—মালতী মঞ্চ।"

বীরেশ্বর আবার ছুটেছিলেন কেষ্টদাস কুণ্ডু স্ট্রীটে। কিন্তু তার আগেই অধর দেখা করেছিল মধুমালতীর সঙ্গে। তার দুটি হাত ধরে অধর বলেছিল, "থিয়েটারের ক'টা ফ্যামিলিকে বাঁচাবার জন্যে তুই যা করেছিস তা কোনোদিন শোধ হবে না। এমনই নোংরা ঘটনা যে ঢাক বাজিয়ে লোককে বলাও যায় না। ভবিষ্যতের মানুষ এতোবড়ো আত্মত্যাগের কথা জানতেও পারবে না।" একটু থেমে অধর বলেছিল, "মধু, তুই আপত্তি করিস না। কর্তা যদি

থিয়েটারের নাম পাল্টানোর কথা তোলেন, তুই রাজী হয়ে যাস। রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে তোর নাম অমর হয়ে থাকবে।”

মধুমালতী উৎসাহিত বোধ করে নি। বিষণ্ন মুখে প্রশ্ন করেছিল, অধরদা, “অভিনেত্রী হিসেবেই যদি বেঁচে থাকতে না পারলাম, তা হলে শুধু থিয়েটারের সাইনবোর্ডে টিকে থেকে কী লাভ অধরদা?”

অধরদা উৎসাহ দিয়েছিলেন, “নাম তো করেছিস। এবার আরও খ্যাতি বাড়বে। শুধু তোকে ভেবেই একটা নাটক খাড়া করবো এবার।”

নরহরি কোথা থেকে খবর পেয়ে চিন্তিত মুখে অধরকে জিজ্ঞেস করেছিল, “মেয়েমানুষের নামে থিয়েটার চলবে?” এ-ব্যাপারে তার মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ভাঁড়ু মিত্তির বলতেন, মেয়েমানুষ ছাড়া থিয়েটার চলে না সত্যিকথা। কিন্তু মেয়েমানুষকে মাথায় তুলেছো কি মরেছো!

“তুই থাম!” নরহরিকে জোর বকুনি লাগিয়েছিল অধর চাটুজ্যে। তার চোখ দুটো তখন রাগে আগুনের মতো জ্বলছে। অধর বললো, “অনাথা অসহায় মেয়েমানুষের চোখের জল পড়েছিল বলেই তো এ-লাইনে এতো কষ্ট। প্রবঞ্চনার সেই আদিম অভিশাপ থেকে কোনোদিন কি কলকাতার থিয়েটারপাড়ার পুরুষমানুষদের মুক্তি হবে? তুই কি বিনোদিনীর ব্যাপারটা ভুলে গেলি? তোমার নামে ‘বি’ থিয়েটার হবে এই মিথ্যে প্রলোভন দেখিয়ে, মেয়েটাকে বলা হলো তুই নিজেকে বেচে থিয়েটার তৈরির টাকা তোল। সরল মনে, সবাইকে বিশ্বাস করে, মেয়েটা নরকে ঝাঁপ দিলো—অথচ তাকে নতুন থিয়েটারের ভাগ দেওয়া হলো না। তার নামও মুছে ফেলা হলো, নতুন থিয়েটারের নতুন নাম দেওয়া হলো স্টার থিয়েটার। সবকিছু জেনেশুনেও যাঁরা এই কাণ্ডটা করলেন তাঁরা নাট্য জগতের কেষ্ট-বিষ্টু। এর মধ্যে খোদ গিরিশবাবুও ছিলেন।”

কবে কারা কোন্ মেয়ের সর্বনাশ করেছে তা নিয়ে নরহরির

মাথাব্যথা নেই। সর্বনাশে পড়বার জন্যেই তো মেয়েমানুষরা এ-লাইনে আসে। কবেকার কোন্ এক বিনোদিনীর জন্যে অধরের চোখ দিয়ে কেন জল গড়াচ্ছে তাও নরহরি ব্যানাজি বুঝতে পারে না। ভাঁড়ু মিত্তির বলতেন, 'ভগবান যে-কাজের জন্যে যাকে সৃষ্টি করেছেন। ঠকবার জন্যে, কপাল পোড়াবার জন্যে, বড়লোক পুরুষমানুষের লালসার আগুনে জ্বলে পুড়ে মরবার জন্যেই তো মেয়েমানুষের সৃষ্টি।' নরহরির সাহস হলো না, ভাঁড়ু মিত্তিরের এই প্রবচন অধরকে শুনিয়ে দেয়। যা রাগী লোক, এখনই হয়তো গালে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দেবে।

ভেবে-চিন্তে নরহরি বললো, "নামের ব্যাপারে যা ভাল হয় তাই করুন।"

বীরেশ্বর রক্ষিত কেষ্টদাস কুণ্ডু স্ট্রীটের এই ঘরেই প্রেয়সীর কাছে প্রস্তাব করেছিলেন, "থিয়েটারের নাম রাখবো মালতীমঞ্চ।"

কৃতজ্ঞচিত্তে মধুমালতী বলেছিল, "আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, বীরেশ্বরবাবু। কিন্তু এখনই আমার নাম জড়ালে আপনার বদনাম হবে—থিয়েটারের জনপ্রিয়তা কমে যেতে পারে।"

"বেশ তুমি যখন বলছো, এখন নাম পাল্টাবো না। কিন্তু সে কিছুদিনের জন্যে। কোহিনূর নিজের পায়ে দাঁড়ানো মাত্রই আমি নিজের মতে চলবো, তখন তোমার কথা শুনবো না।"

কোহিনূরকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্যে নানা বুদ্ধি খেলেছিলেন বীরেশ্বর রক্ষিত। পুরনো প্রত্যেক কর্মীকে ছাঁটাই করে একমাস পরে নতুন নিয়োগপত্র পাঠিয়েছিলেন। সেই সময় নিজের ওকালতি প্রতিভা খাটিয়েছিলেন বীরেশ্বর। প্রত্যেক কর্মচারীকে একখানা পদত্যাগ পত্রেও আগাম সই করতে হয়েছিল।

নেদো মল্লিক বলেছিলেন, "ব্রাদার, তোমার নামে বাজারে

নানা গুজব রটছে। রক্ষিতার মন রাখবার জন্যেই তুমি নাকি নাটক লাইনে এসেছো।”

বীরেশ্বর আবার দাঁতে দাঁত চেপেছিলেন। এইরকম হিংসুটে নিচুমনের লাইন দুনিয়ায় নেই।. কোন্ কোন্ থিয়েটারের দল ইচ্ছে করে এইসব গুজব ছড়াচ্ছে তা বীরেশ্বর লিখে দিতে পারেন। “কিন্তু দাঁড়াও! তোমরা ঘুঘু দেখেছো—বীরেশ্বর রক্ষিতকে এখনও দেখো নি। তোমাদের ব্যবসার বাড়া-ভাতে ছাই না দিতে পারলে পৈত্রিক নাম পাল্টে ফেলবো।”

বীরেশ্বর এবার নরহরিকে ডেকে পাঠালেন। “নরহরি, পাবলিসিটির কিছু বোঝো?”

মনঃক্ষুণ্ণ নরহরি মাথা চুলকে বললো, “ওই কাজটা তো গত সতেরো বছর ধরে করে আসছি।”

“কজন মালিককে দেউলিয়া করেছো ওই সময়ের মধ্যে?” বীরেশ্বর গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

এবারে ভয় পেয়ে গেলো নরহরি। মালিকের করুণা উদ্রেকের জন্যে বিনয়ে বিগলিত হয়ে স্বীকার করলো, “তিনজনকে স্যর—চিন্তামণি শ্রীমানি, অভিনেতা কিশোর লাহিড়ী এবং হরেন নিয়োগী। শ্রীমানি মশাই গেলেন মদের নেশায়—প্রতিদিন সন্ধ্যে-বেলায় বন্ধুদের জন্যে পাঁচ বোতল স্কচ লাগতো। বক্স আপিস থেকে সেই টাকা নেওয়া হতো। তারপর বন্ধুবান্ধবদের নজর পড়লো অ্যাকট্রেসদের ওপর। তাঁদের ধারণা হলো ফ্রি পাশের মতো ওসব জিনিস বিনা পয়সায় পাওয়া যায়। থিয়েটারের সবাই বিগড়ে গেলো। চিন্তামণি শ্রীমানি তখন কিশোর লাহিড়ীকে থিয়েটারের ভার দিয়ে কেটে পড়লেন। অতবড় অভিনেতা হয়েও কিশোর লাহিড়ীর বিষয়বুদ্ধি ছিল পাঁচ বছরের ছেলের মতো। সন্ধ্যে হলেই মদের বোতলটি দরকার। আচমকা এসে যখন-তখন বুকিং অফিস থেকে খামচা মেরে টাকা তুলে নিয়ে যেতেন, কোনো

হিসেব থাকতো না। কিন্তু নিজের নামের ব্যাপারে খুবই সাবধানী ছিলেন লাহিড়ীমশাই। এমনভাবে নাটক তৈরি করবেন যে কিশোর লাহিড়ী ছাড়া আর কেউ অভিনয়প্রতিভা দেখাবার সুযোগ পাবে না। ওঁকেও যেতে হলো। আর হরেনবাবু গেলেন আদর্শের জন্যে। দেশের এবং জাতের উন্নতি করতে গিয়ে নিজের ব্যবসা ডকে তুললেন।"

বীরেশ্বর গম্ভীরভাবে বললেন, "শোনো নরহরি, প্রচারের ব্যবস্থা করো। পাবলিককে, গভরমেন্টকে এবং পাড়ার ছেলেদের বোঝাও—হরেন নিয়োগীর থেকেও আমার বড় আদর্শ। আমি বাংলা নাট্যমঞ্চের মরাগাঙে নতুন প্রাণের বন্যা আনতে চাই। যে-আদর্শে জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করে একদিন বিপ্লবী গণেশ মিত্তিরের সঙ্গে আমি স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, সেই এক উদ্দেশ্যে আমি কোহিনূর থিয়েটারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি। আমার প্রথম পরিকল্পনা—বিনোদিনী সেবাকেন্দ্র। দুঃস্থ নটীদের সাহায্য এবং ভবিষ্যতের নটীদের সুশিক্ষার জন্যে আমি বড় বড় অধ্যাপকদের ডাকবো। আমাদের কোহিনূর শুধু থিয়েটার থাকবে না—এটা হবে একটা সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কেন্দ্র। আর সেই সঙ্গে শুরু হবে পরমহংস নাট্য গ্রন্থাগার।"

নেদো মল্লিক খবর পেয়ে মন্তব্য করলেন, "তোমার মাথাতেও আদর্শের পোকা ঢুকলো? দেখো, শরীর খারাপ না করে!"

বীরেশ্বর জানিয়ে দিলেন, "এখনই হয়েছে কি! টিকিটের দাম অনুযায়ী কোহিনূর হলকে ভাগ করবো—গোলাপসুন্দরী ব্লক, তারাসুন্দরী ব্লক, তিনকড়ি ব্লক, সরযূ ব্লক।"

সমস্ত কলকাতা শহরে হৈ-চৈ পড়ে গেলো। দেশের বড় বড় নেতারা প্রথম দিনের মিটিং-এ এসে বীরেশ্বর রক্ষিতের এই 'বৈপ্লবিক' প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানালেন। পাড়ার যুব-নেতারাও

স্বীকার করলেন, "আমাদের প্রথম দিকে একটু সন্দেহ হয়েছিল। এখন আমরা সানন্দে নবপর্যায়ের কোহিনূরকে সমস্ত রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।"

নেদো মল্লিক ধুতি-চাদর পরে ছড়ি হাতে সভায় এসেছিলেন। সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফেরবার পথে তিনি বীরেশ্বরকে অভিনন্দন জানালেন, "দাবার চাল চমৎকার চেলেছো, ব্রাদার। তোমার এইটুকু মাথায় যে এতো বুদ্ধি আছে, তা সারপেণ্টাইন লেনে সেই চায়ের দোকানে প্রথম দেখে বুঝতেই পারি নি।"

ঠোঁট উল্টে মুচকি হেসে বীরেশ্বর বললেন, "এখন সবে তো শুরু।"

এরপর অধরকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন বীরেশ্বর। তখন রাত প্রায় দশটা। ঘুমে অধরের হাই উঠছিল। বীরেশ্বর গম্ভীরভাবে বললেন, "অধর, তোমার নতুন নাটকের কী হলো?"

আরও সপ্তাহ তিনেক সময় চেয়েছিল অধর। বীরেশ্বর গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করেছিলেন, "এতো সময় কেন?"

"ভাল জিনিসের জন্য একটু মাথা ঘামাতে হয়, স্যর।" দুঃখের সঙ্গে অধর বললো। মধুমালতীকে পকেটস্থ করবার আগে যে-বীরেশ্বর তার সঙ্গে কথা কইতেন আর এই মালিক বীরেশ্বর এক নয়।

চাঁচা-ছোলা কায়দায় কাজের কথা তুললেন বীরেশ্বর। "অধর, আমি নরহরির মুখে শুনলাম গিরিশ ঘোষ পাঁচ ছ দিনে এক একখানা নাটক নামিয়ে ফেলতেন। আমাকে বোকা বানাতে পারবে না, অধর। ভাল হবার হলে এক রাতেও হয়। 'মানময়ী গার্লস স্কুল' নাটকটা তো মৈত্রমশায় এক রাতে লিখেছিলেন।"

বীরেশ্বরের এই মূর্তি দেখে চমকে উঠেছিল অধর। নেহাত বাড়িতে অনেকগুলো পেট রয়েছে তাই এসব অপমান অধরকে হজম করতে হবে।

"কী ধরনের নাটক চাই ?" অধর জিজ্ঞেস করেছিল।

"যে-নাটক পাবলিককে টানবে, অধর। গাঁটের পয়সা খরচ করে যে-নাটক দেখবার জন্যে সব বয়সের ব্যাটাছেলে এবং মেয়েমানুষের মন উসখুশ করবে।" বীরেশ্বরের কণ্ঠে তীব্র ব্যঙ্গ ঝরে পড়লো। "দু-পুরুষ থিয়েটারে থেকেও নাটকের গোড়ার কথাটুকু শেখো নি ?"

অধরকে দশদিন সময় দিয়েছিলেন বীরেশ্বর। এরই মধ্যে নরহরিকে রাত্রে ডেকে পাঠাতেন বীরেশ্বর। নানা গল্পের মধ্যে থিয়েটারের ইতিহাসটা জেনে নেবার চেষ্টা করতেন বীরেশ্বর।

নরহরি বলেছিল, "রাশিয়ান লেবেডফ সায়েবের থিয়েটারে প্রথম বাংলা নাটকের জন্ম ১৭৯৫ সালে, পঁচিশ নম্বর ডুমতলায়।"

"ডুমতলা আবার কোথায় ?" বীরেশ্বর জিজ্ঞেস করেছিলেন।

"এখন যাকে এজরা স্ট্রীট বলে। অধরবাবুর কাছে শুনেছি, লেবেডফ সায়েবের দক্ষিণহস্ত ছিলেন বাবু গোলকনাথ দাস। তারপর বাঙালীর প্রথম নাট্যশালা হলো নারকেলডাঙায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাসাবাড়িতে—নাম হিন্দু থিয়েটার।"

"বটে!" বীরেশ্বর মন্তব্য করলেন।

নরহরি এবার মাথা চুলকে বললো, "বাংলায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চ কিন্তু সেদিনের ব্যাপার।"

"সাধারণ এবং অসাধারণ রঙ্গমঞ্চের মধ্যে তফাতটা কী ?" বীরেশ্বর ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছেন না।

নরহরি বললো, "অর্থাৎ প্রাইভেট ব্যাপার নয়। যে-কেউ টিকিট কেটে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে ঢুকতে পারে।"

"আই সী! রাইট অফ অ্যাডমিশন রিজার্ভড্ নয়।"

"একরকম তাই স্যর। অসুস্থ অথবা মত্ত অবস্থায় থাকলে আলাদা কথা—না হলে আমরা কোনো টিকিট-কেনা দর্শককে ফিরিয়ে দিতে পারি না।"

নরহরি বললো, "১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর ৩৬৫ নম্বর

আপার চিৎপুর রোডে ন্যাশনাল থিয়েটারে নীলদর্পণ অভিনয় হলো। আমার ঠাকুর্দা ওই দলে ছিলেন। তখন টিকিটের দাম ছিল এক টাকা ও আট আনা। ফাস্ট শোতে দুশো টাকা এবং সেকেণ্ড শোতে সাড়ে-চারশো টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছিল। যদিও স্ত্রী-ভূমিকাতে নামতো পুরুষমানুষ।"

মাথা চুলকে নরহরি বললো, "হাউস ফুল করবার জন্যে ১৮৭৩ সালে বেঙ্গল থিয়েটার এক মন্তর ঝাড়লো। জগত্তারিণী, গোলাপ, এলোকেশী ও শ্যামা এই চারজন ফিমেল আর্টিস্ট নেওয়া হলো।"

"তারপর," মনে মনে হিসেব কষতে-কষতে বীরেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন।

নরহরি বললো, "১৮৭৫ সালে আমার ঠাকুর্দা বেঙ্গল থিয়েটারে চাকরি নিলেন। ওই বছরেই বেঙ্গল থিয়েটার নতুন স্টাণ্ট দিলো। বঙ্কিম চাটুজ্যের দুর্গেশনন্দিনী নাটকে জগৎসিংহের ভূমিকায় একটর শরৎ ঘোষ জেনুইন ঘোড়া নিয়ে স্টেজে হাজির হলেন। সে এক ভীষণ ব্যাপার। বেঙ্গল থিয়েটারে বাদুড় ঝুলতে লাগলো।"

"মানে ?"

"খুব ভিড় হলে তখন 'বাদুড় ঝোলা' বলতো স্যর।" উত্তর দিলো নরহরি।

"১৮৭৫ সালেই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের স্টেজে প্রথম রেলগাড়ি দেখানো হলো। অমৃতলাল বসুর নাটক হীরকচূর্ণ। সেও ভীষণ ব্যাপার। স্টেজে চলন্ত রেলগাড়ি দেখবার জন্য লোকে আবার বাদুড় ঝোলা হলো।"

বীরেশ্বর চোখ বুজে শুনছেন। নরহরিটা কী করে এত সাল তারিখ মনে রেখেছে ভগবান জানে। নরহরির গল্প শুনতে শুনতে কখন রাত বারোটা বেজেছে খেয়াল নেই। নরহরিকে বিদায় করে গাড়ি চড়ে বাগবাজারে গিয়ে বীরেশ্বর যখন মধুমালতীর বাড়িতে

কড়া নাড়ছেন তখন রাত দুটো। এতো রাত্রে বীরেশ্বরকে দেখে মধুমালতী অবাক।

বিছানায় শুয়ে শুয়েও বীরেশ্বর থিয়েটারের রহস্য বোঝবার চেষ্টা করছেন। "কি এতো ভাবছেন?" জিজ্ঞেস করেছিল মধুমালতী।

বীরেশ্বর বললেন, "যখন-যেমন তখন-তেমন—এই হচ্ছে থিয়েটারি লাইনের গোপন কথা। কখনও স্টেজে ঘোড়া দেখিয়ে, কখনও ভক্তিরসের বন্যা আনিয়ে, কখনও আবার দেশাত্মবোধ জাগিয়ে থিয়েটারের মালেরা পাবলিকের পকেট হাল্কা করেছে।"

"আমাদের ভারতলক্ষ্মী ও বন্দেমাতরম যে চললো না?" মধুমালতী দুঃখের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিল।

বীরেশ্বর উত্তর দিলেন, "অথচ নরহরির মুখে শুনলাম ১৯০৬ সালে মীরকাশেম ও সিরাজদ্দৌল্লা নাটক নামিয়ে মিনার্ভা থিয়েটার এক লাখ টাকা লাভ করেছিল। নরহরির বাবা সত্যহরি ওখানকার কর্মচারী ছিলেন।"

"তাহলে কি ভাবছেন?" মধুমালতী জিজ্ঞেস করেছিল।

"তুমি চিন্তা কোরো না মালতী। অধরের সঙ্গে কথা বলে তোমাকে বিখ্যাত করে দেবো।"

অধরকে বীরেশ্বর বলেছিলেন, "নতুন কায়দা ভাবো। সেই তো একদল মেয়েপুরুষ রঙ মেখে স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে বকবক করবে। পাবলিককে গরম করবার মতো জিনিস আনো, থিয়েটার-পাড়ায় হৈচৈ ফেলে দেবার মতো সীন লেখো।"

অধর অনেক ভেবেচিন্তে বলেছিল, "রঙ্গমঞ্চে মেয়েপুরুষ দুজনেরই ঘোড়া-চড়া দেখানো হয়েছে স্যার। রাণী দুর্গাবতী নাটকে তারাসুন্দরী ঘোড়ায় চড়েছিলেন। এবার স্টেজের ওপর আসল বাঘসিংহি দেখালে কেমন হয়?"

মন্দ লাগছিল না আইডিয়াটা। কিন্তু নরহরি ফাঁসিয়ে দিল।

সে বললো, "নতুনত্ব হলো না, স্যর। মিনার্ভা ও ক্লাসিক থিয়েটারের মধ্যে তখন বেস্বায় রেষারেষি। দুই থিয়েটারে একই দিনে একই সময়ে একই নাটক অভিনয় হবে—বঙ্কিম চাটুজ্যের কপালকুণ্ডলা। লাস্ট মোমেণ্টে ক্লাসিকের অমর দত্ত শহরে হ্যাণ্ডবিল ছাড়লেন—প্রথম দৃশ্যে বালিয়াড়ির কাছে বনে সত্যি-কারের বাঘ দেখা যাবে। সার্কাস কোম্পানি থেকে ভাড়া করে এনে নির্ভেজাল বাঘ সত্যিই দেখানো হলো। ক্লাসিক থিয়েটারে দিনের পর দিন বাদুড় ঝোলা চলতে লাগলো।"

বিরক্ত বিরেশ্বর তখন অধরকে বলেছিলেন, "আমি বস্তাপচা মালের ব্যবসা করি না। নতুন কিছু ভাবো অধর।"

তারপর শুভদিনে কোহিনূরের নতুন নাটক 'লেভেল ক্রশিং' প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল। কথাসাহিত্যিক উমাশঙ্কর রায়ের উপন্যাস 'আসা-যাওয়া' অবলম্বনে এই নাটক। নাটকের শেষ অঙ্কে চলমান ট্রেনের ফার্স্ট-ক্লাস কামরায় শ্লীলতাহানির দৃশ্য আছে। দুরন্ত সাহসে চলমান রেলের টি-টি-ই অনন্ত রায় নিজের জীবন বিপন্ন করে অন্য কামরার ফুটবোর্ড বেয়ে এই কামরায় এসে মহিলা-যাত্রী ডাক্তার মালবিকা চৌধুরীকে উদ্ধার করেছিল। এই দৃশ্যের ব্যাপারে বিলিতী কোম্পানির ইলেকট্রিক মিস্ত্রীদের আনানো হলো।

শুভারম্ভের আগের দিনে মধুমালতীর বিরাট ছবি দৈনিক পত্রের বিজ্ঞাপনে বেরিয়েছিল। মধুমালতীর চোখে চশমা, গায়ে যথাসাধ্য টাইট সাদা অ্যাপ্রন, হাতে স্টেথো। জোড়হস্তে সে বলছে, "আমার নাম ডক্টর মিস মালবিকা চৌধুরী। যাঁরা হাই ব্লাডপ্রেসারে ভুগছেন, যাঁদের হার্ট দুর্বল— তাঁদের কাছে বিনীত অনুরোধ, কোহিনূর থিয়েটারের নতুন নাটক 'লেভেল ক্রশিং' দেখতে আসবেন না। চতুর্থ অঙ্কে চলমান ট্রেনের দৃশ্যে কিছু ঘটলে আমি দায়িত্ব নিতে পারবো না, তখন আমার নিজেরই

ভীষণ বিপদ—নরপিশাচ দীনদয়াল হাজরা রাতের অন্ধকারে আমার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করছে।”

খবরের কাগজে সেই বিজ্ঞাপন পড়ে সমস্ত শহরে তুলকালাম ব্যাপার। প্রথম অভিনয় রজনীতেই থিয়েটারের সামনে জন-সমুদ্র। উৎসুক দর্শকের সেই ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকতে গিয়ে মধুমালতী নিজেই তাজ্জব। মেকআপ-রুমে যাবার আগেই মধুমালতী দোতলায় বীরেশ্বরের ঘরে চলে এসেছিল। তখন তার অঙ্গে অঙ্গে শিহরণ। “আপনি কি জাদু জানেন, বীরেশ্বর বাবু?” বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিল মধুমালতী।

ভাগ্যে ঘরের মধ্যে তখন কেউ ছিল না। চারদিকে তাকিয়ে, চোখের পাতা নাচিয়ে ক্ষুধার্ত বীরেশ্বর বলেছিলেন, “পুরস্কার চাই।” কোনোরকম সম্মতির জন্য অপেক্ষা না করে শক্তিমান বীরেশ্বর চেয়ার থেকে উঠে ডাক্তার মিস মালবিকা চৌধুরীর ওষ্ঠে কয়েকটি আকস্মিক চুম্বন এঁকে দিয়েছিলেন।

অসহায় ও বিব্রত মধুমালতী বাধা দেবার চেষ্টা করেও সফল হয় নি। নিজেকে আলিঙ্গনমুক্ত করে সে সাজঘরে চলে গিয়েছে। বীরেশ্বর এবার চেয়ারে বসে নতুন ধরনের এক সুখ অনুভব করছেন। কিন্তু আচমকা আনন্দের এই রেশ বেশিক্ষণ থাকে নি।

হাউসফুল বোর্ড টাঙিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে অধর ও নরহরি দুজনেই সায়েবের কাছে ছুটে এসেছিল। অধর বললো, “ফার্স্ট নাইট বিক্রির রেকর্ড হয়েছিল ১৯০৭ সালে চাঁদবিবি নাটকে। দশ হাজার টাকা বোনাস আর পাঁচশ টাকা মাইনেতে গিরিশ তখন কোহিনূরে যোগ দিয়েছেন। ফার্স্ট নাইটে ২৬০০ টাকার টিকিট বিক্রি হলো। আজ আমরা বিক্রি করলাম ৩৫০০ টাকা।”

“জায়গা থাকলে আরও ৩৫০০ টাকার টিকিট বিক্রি হতো।” সগর্বে মন্তব্য করলো নরহরি।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলেছিল এই 'লেভেল ক্রশিং' নাটক। মধুমালতী ও সাহিত্যিক উমাশঙ্কর রায়ের সঙ্গে নাট্যকার ও নির্দেশক অধর চাটুজ্যেও বঙ্গবিখ্যাত হয়ে উঠেছিল।

নেদো মল্লিক তখন বীরেশ্বরকে বললেন, "কামাল করে দিলে ভাই। পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি, মধুমালতী ভাবছে আমার অভিনয়ের জোরেই 'লেভেল ক্রশিং' চলছে। সাহিত্যিক উমাশঙ্কর বলছেন, কার গল্প দেখতে হবে তো? অধর তো এখন আঙুল ফুলে কলাগাছ।"

ঠোঁট উল্টে বীরেশ্বর বললেন, "নাটক চালাচ্ছে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। চলন্ত ট্রেনে পড়ন্ত মেয়েমানুষের সীনটা বাদ দিলেই দেখবে হল খালি, বুকিং অফিসের মেয়েগুলো মাছি তাড়াচ্ছে।"

জীবনের যাত্রাপথে কত মানুষ এলো গেলো। কিন্তু নেদো মল্লিককে সম্পূর্ণ সরাতে পারলেন না বীরেশ্বর। নানা নেশার মধ্যেও মাঝে মাঝে নেদো মল্লিকের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বীরেশ্বরের মনটা ছটফট করে। আচমকা মুখের ওপর কথা বলে ফেলেন নেদো, তবু রাগে ফেটে পড়েন না বীরেশ্বর।

হাউসফুলের বহর দেখে নেদো মল্লিক বলেছিলেন, "কী মুশকিল যে হলো তোমার! এলে মেয়েমানুষের খোঁজ করতে, কিন্তু সেখানেও পয়সা ঢুকতে লাগলো তোমার পকেটে।"

মন্দ বলেন নি নেদো মল্লিক। কিন্তু শুধু পয়সায় এখন আর মন ভরছে না বীরেশ্বরের। অর্থসুখ ও নারীসঙ্গসুখের সঙ্গে বীরেশ্বর এখন খ্যাতি চান। এই হতভাগা দেশে যত সম্মান লেখকের, নাট্যকারের, অভিনেতার এবং অভিনেত্রীর। অমন যে অমন মধুমালতী সেও উমাশঙ্কর রায়ের পায়ের ধুলো নিয়েছে, যেদিন তিনি থিয়েটার দেখতে এসেছিলেন। আর সাহিত্যিক উমাশঙ্কর কেমন বেমালুম তা হজম করে ফেললেন—সাহিত্যিকের

পদধূলি নেবার জন্যেই যেন রঙ্গশালার নটীদের জন্ম হয়েছে। বিরক্ত বীরেশ্বর ভাবলেন, চলন্ত ট্রেনে একাকিনী মহিলা যাত্রীর শ্লীলতাহানির দৃশ্যটা যদি না দেওয়া হতো তা হলে কোথায় থাকতেন সাহিত্যিক উমাশঙ্কর? কোনো কাজকর্ম না করেই উমাশঙ্কর রায় প্রতি নাইটে সাত টাকা রয়ালটি কামাচ্ছেন।

অধর চাটুজ্যেকে ডেকে মনস্থির করে ফেলেছেন বীরেশ্বর রক্ষিত। ইদানীং তার ওপর সায়েব যে একটু অসন্তুষ্ট তা বুঝতে পেরেছে অধর। কিন্তু সায়েবকে খুশী করার মন্ত্র বেচারা অধর জানে না। আধা চোখ-বোজা অবস্থায় নাটকীয় কায়দায় বীরেশ্বর জিজ্ঞেস করেছেন, "অধর, বৈচিত্র্যই তো যে কোনো রঙ্গমঞ্চের প্রধান সম্পদ?"

সায়েবের সঙ্গে একমত হওয়া ছাড়া অধরের আর কী উপায় আছে? বীরেশ্বর এর পর ইঙ্গিত দিয়েছেন, পরের বইয়ের জন্য তিনি নতুন নাট্যকারের সন্ধান করতে পারেন। অসহায় অধরের তখন কাঁদ-কাঁদ অবস্থা।

"ভাত ছড়ালে কত অধর চাটুজ্যেকে আপনি পাবেন," অধর স্বীকার করেছে এবং বীরেশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছে। "আপনি যা হুকুম করবেন তাই করবো স্যার। দয়া করে কোহিনূর থেকে সরাবেন না আমায়।"

মিটমিট করে হেসেছেন বীরেশ্বর। এই অধর চাটুজ্যেই নাটকের চরিত্রদের জন্যে আগুন-জ্বালানো সংলাপ তৈরি করে! তার সৃষ্ট চরিত্রগুলো স্টেজে কত বড় বড় কথা বলে, দর্শকদের রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়।

অধরের সঙ্গে বীরেশ্বর গোপন রফা করে ফেলেছেন। এবারের নাট্যকার ও নির্দেশক হবেন স্বয়ং বীরেশ্বর, যদিও লেখা-লিখির কাজটা অধরই চালিয়ে যাবে। নাম ছাড়া তুমি আর সবই পাবে, অধরকে আশ্বস্ত করেছেন বীরেশ্বর। "বরং তোমার মাসোহারা

দশ টাকা বাড়িয়ে দিলুম। তবে ভিতরের ব্যাপারটা যদি বাইরে কখনও ফাঁস হয় তা হলে সঙ্গে সঙ্গে চাকরি যাবে।"

নিরুপায় অধর রাজী হয়ে গিয়েছে। সায়েবকে ডবল সন্তুষ্ট করবার জন্যে মনের দুঃখ বুকে চেপে রেখে অসহায় অধর বলেছে, "নামে আমার অরুচি ধরে গিয়েছে, স্যার। এতো দিন তো নিজের নামেই সাহিত্যসাধনা চালিয়ে গেলাম, কিন্তু কী হলো? আপনি না থাকলে আজ ছেলেপুলে নিয়ে আমাকে পথে বসতে হতো।"

অধরকে পরের নাটকের কথা ভাবতে বলেছেন বীরেশ্বর।

কয়েকদিন পর অধর ফিরে এসে বললো, "লোকে বলছে স্যার, আপনি বাংলা থিয়েটারে নিউ অমর দত্ত। নিত্য নতুন কায়দা ঢুকিয়ে হলে বাদুড় ঝোলার ব্যবস্থা করতে অমর দত্তের জুড়ি ছিল না। এবার অমর দত্তের রেকর্ড ম্লান হবে।"

বীরেশ্বর বেশ খুশী হলেন। একটু পরে নরহরিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "নরহরি, পাবলিক নাকি আমাকে অমর দত্তর সঙ্গে তুলনা করছে?"

আচমকা এই প্রশ্নে নরহরি একটু ঘাবড়ে গেলো। তুলনাটা ভাল না মন্দ তা সে ঠিক আন্দাজ করতে পারছে না। নরহরি মাথা নিচু করে বললো, "কয়েকজন শত্রু তা রটাতে পারে স্যার।"

বিরক্ত কণ্ঠে বীরেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, "শত্রু কেন?"

আবার ঘাবড়ে গেলো নরহরি। আমতা-আমতা করে বললো, "অধরবাবু একদিন মালতীদির সঙ্গে গল্প করছিলেন—অমর দত্তর মৃত্যু ১৯১৬ সালের জানুআরি মাসে। আর, স্যার, আপনার জন্ম নাকি ১৯১৬ সালেই সাতই ডিসেম্বর। এর মধ্যে নাকি অনেক তাৎপর্য আছে—অধরবাবু তো আবার জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করেন।"

"তুমি কী বললে?" বীরেশ্বর এমনভাবে জিজ্ঞেস করলেন যে তাঁর মনের অবস্থা এখনও বোঝা যাচ্ছে না।

নরহরি বললো, "আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলাম, স্যার।"

"আর মধুমালতী?" বীরেশ্বর আবার প্রশ্ন করলেন।

মাথা চুলকোতে লাগলো নরহরি। "আমার ঠিক মনে নেই স্যার। যদ্দূর মনে পড়ছে উনি আমার সঙ্গেই একমত হলেন। আমি বললুম, 'অধরদা, কখনই নয়। যদি তুলনা করতেই হয়, তা হলে বলবো, আমাদের সাহেব বেটার ছান অমর দত্ত। অমর দত্তর চরিত্রদোষ ছিল, আমাদের সায়েবের ওসব নেই। অমর দত্ত বড়লোকের ছেলে, আমাদের সায়েব নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন। অমর দত্তের ফার্স্ট নাটক কী আমাদের সায়েবের নাটকের মতো তিনশ নাইট চলেছিল?' আমি অধরবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।"

"অধর কী বললো?" প্রশ্ন করলেন বীরেশ্বর।

মাথা নিচু করে নরহরি বললো, "অধরবাবু আমাকে বকুনি লাগালেন। বললেন, উপমার কচু বুঝিস তুই। চাঁদের মতো মুখ মানে কি চাঁদের মতো থালা সাইজের মুখ? অমর দত্তর এবং আমাদের সাহেবের নাট্য-প্রয়োগের প্রতিভা একই ধরনের। দুজনেই থিয়েটারের মরা গাঙে বান আনতে চেয়েছিলেন।"

"মালতী কী বললো?" আবার প্রশ্ন করলেন বীরেশ্বর।

নরহরি বললো, "মালতীদি আমার সঙ্গে একমত হলেন, আবার অধরবাবুর সঙ্গেও তর্ক করলেন না।"

অমর দত্তর সঙ্গে তুলনাটা মন্দ লাগছে না বীরেশ্বরের। অধরের মুখে তিনি শুনেছেন, অমর দত্ত দিলদরিয়া লোক ছিলেন। দু-হাতে গরীব-দুঃখীদের টাকা দিতেন। সেই করেই নিজের ব্যবসা ডুবিয়ে, শেষ জীবনে অমর দত্তকে অভিনয়ের চাকরি নিতে হয়েছিল। স্টার থিয়েটারে অভিনয় করতে করতেই স্টেজে মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন আর ওঠেন নি।

অধর চাটুজ্যে গোপনে আবার মালিকের সঙ্গে দেখা করতে

এলো। বীরেশ্বরের তাই নির্দেশ। বর্তমান নাটক কতদিন চলবে, পরের নাটক কী হতে পারে, এসব টপ সিক্রেট। একটু খবরাখবর বেরুলে অধর চাটুজ্যের চাকুরি শেষ।

অধর বললো, "অমর দত্তর কথা ভাবতে ভাবতে মাথায় একটা আইডিয়া এসে গেলো, স্যার। আপনি বঙ্কিমের কৃষ্ণকান্তের উইলটা আবার নামান।"

"আবার লেখকের হাঙ্গামা? উমাশঙ্কর রায় নাটকের ডায়ালগ নিয়ে কীরকম জ্বালায়, জানোই তো?" বীরেশ্বর খুব খুশী হতে পারছিলেন না।

"কোনো হাঙ্গামা নেই, স্যার। বঙ্কিমের কপিরাইট শেষ··· উনি এখন পাবলিক প্রপার্টি। মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরে যে কেউ ওঁর পিণ্ডি যেভাবে ইচ্ছে চটকাতে পারে, অথচ একটি পয়সা রয়ালটি লাগবে না।"

এই রকম অবস্থায় বীরেশ্বর মাঝে মাঝে নির্বাক হয়ে যান, শুধু অধরের কথা শোনেন। উৎসাহ পেয়ে অধর বললো, "এই বই নামিয়েই তো অমর দত্ত ফাটিয়েছিলেন। বারুণী পুষ্করিণীর দৃশ্য—স্টেজের মধ্যেই পুকুর। রোহিণী জলে ডুবলো। গোবিন্দলাল ঘাটে তা দেখলো, জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলো, তারপর চড়চড় করে গায়ের শার্ট ছিঁড়ে ঝপাং করে জলে লাফিয়ে পড়লো এবং রোহিণীকে উদ্ধার করে যখন উঠলো তখন দুজনের গা দিয়ে জল ঝরছে। দর্শকদের হাততালি থামানো যায় না। গোবিন্দলাল সাজতেন স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ।"

অধর চাটুজ্যে একটু কেশে বললেন, "খরচ হয়তো পড়বে—প্রতি শো-তে একখানা নতুন শার্ট ছিঁড়তে হবে, কিন্তু পুরনো গল্পটাই ঘষেমেজে দাঁড় করালে আবার বাদুড়-ঝোলা হবে।"

অধরকে বকুনি লাগিয়ে বীরেশ্বর মনে করিয়ে দিয়েছিলেন পুরনো বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করা বীরেশ্বর রক্ষিতের স্বভাব নয়।

শেষ পর্যন্ত চোখের জল ফেলতে ফেলতে অধর রচনা করেছিলেন 'সমুদ্র সৈকতে'। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল—কাহিনী, সংলাপ, নাটক ও নির্দেশনা : বীরেশ্বর রক্ষিত।

অধর বলেছিল, "এর মধ্যে কোনো অন্যায় নেই স্যার। গোড়ার কথাটা বীজ আকারে আপনিই তো বলেছিলেন—অমর দত্ত স্টেজে পুকুর দেখিয়েছে, আমরা সমুদ্র দেখিয়ে ছাড়বো। এমন কিছু ভাবো যাতে সমুদ্রের ঢেউ-এর ছিটে দর্শকদের গায়েও এসে পড়ে।"

মধুমালতী প্রথমে একটু দ্বিধায় পড়েছিল। বীরেশ্বরের পরিকল্পনা—নির্জন সমুদ্র সৈকতে সুদেহিনী নায়িকা সাঁতারের সুট পরে নৃত্যছন্দে ঢেউয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সুইমিং সুটের ব্যাপারে মধুমালতী সঙ্কোচ প্রকাশ করছিল। "ওতে অভিনয় দেখাবার সুযোগ কোথায়?" বীরেশ্বর আধা-চোখ-বোজা অবস্থায় মধুমালতীকে বুঝিয়েছিলেন, "মধু সমস্ত কলকাতায় হই-হই রই-রই ব্যাপার হবে—নাট্যজগৎ স্তম্ভিত। সবার মুখে এবার থেকে কেবল কুহেলী রায়, কুহেলী রায়। বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে সমুদ্রের ধারে হনিমুনে এসেছো তুমি। সুইমিং সুট পরা অবস্থায় সমুদ্রের ধারে রূপলাবণ্যে মোহিত স্বামীর সঙ্গে তোমার মস্ত রোমান্টিক ডায়ালগ থাকবে—বাংলা থিয়েটারে এই প্রথম।"

রঙ্গশালার শত শত দর্শকের সামনে এই অর্ধউলঙ্গ হবার পরিকল্পনা মধুমালতী কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছে না। বাংলা থিয়েটারের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের সঙ্গে ওই কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত রমণীর দৃশ্যটা ঠিক মিলছে না। কিন্তু বীরেশ্বর অত সহজে নিরস্ত্র হবার পাত্র নন। তিনি বুঝিয়েছেন, "মধু এর মধ্যে অবাস্তব তো কিছুই নেই। তুমি বলো বিয়ের পর বাঙালী স্বামী-স্ত্রী পুরী যায় না? এবং সেখানে মেয়েরা সাঁতারের পোশাক পরে না? নববিবাহিতা স্ত্রীকে নবরূপে দেখতে কোন্ স্বামীর ভাল লাগে

না ?” বীরেশ্বর অনেক কায়দায় মালতীকে রাজী করিয়ে বললেন, “এসব আমি কার জন্যে করছি মধু ? কোহিনূর থিয়েটার আমার কাছে মালতীমঞ্চ ছাড়া কিছুই নয়। দেখবে, তোমার বক্স অফিস কী রকম বাড়ে—একই নাটক লোকে পাঁচবার দেখতে আসবে। কুহেলী কুহেলী করে দর্শকরা পাগল হবে !”

মালতী সরল মনে বলেছিল, “গোলাপসুন্দরীর মতো দশা হবে নাকি আমার ? উপেন দাসের লেখা শরৎ-সরোজিনী বইতে সুকুমারীর ভূমিকায় গোলাপসুন্দরী এমন অভিনয় করলেন যে তাঁর নামই হয়ে গেলো সুকুমারী। গোলাপসুন্দরী নামটা কোথায় হারিয়ে গেলো।”

বীরেশ্বর বললেন, “হতে পারে। তখন এই বাড়িতে এসে মধু মধু বলে ডাক দিয়ে আমি কোনো সাড়াই পাবো না ! আমাকেও তখন ডাকতে হবে—কুহেলী, কুহেলী।”

নিউমার্কেট থেকে কুহেলীর টু-পীস সাঁতারের ড্রেস বীরেশ্বর নিজের হাতে কিনে এনেছিলেন। মধুমালতীর কুঁচবরণ কেশ রক্ষার জন্য প্লাস্টিকের ক্যাপও এসেছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সীন পাল্টে গেলো। মহলার দিনে বীরেশ্বর বললেন, “সাঁতার-সুটের ওপর একটা আলখাল্লা চাপিয়ে কুহেলী সমুদ্রতীরে আসবে। পাশে দু-একটি অপরিচিত মেয়েকে স্নান করতে দেখা যাবে। রূপেগুণে তারা কুহেলীর নখের যোগ্য নয়। কুহেলীর স্বামী বলবে, ‘আলখাল্লা খুলে বালির ওপর রেখে এবার তুমি সমুদ্রস্নানে নেমে পড়ো।’ কিন্তু কুহেলীর মুখে চোখে এবার সঙ্কোচের ছাপ পড়বে। সে বলবে, গৃহস্থ-ঘরের বধূ সে—তার পক্ষে এইভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হওয়া সম্ভব নয়।”

বীরেশ্বরের এই আকস্মিক মতপরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন মহলে চাঞ্চল্য পড়ে গেলো। কুহেলীর বেদিং কস্টুম দোকানে ফিরে যাওয়ার সম্ভাব্য কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মহলে গবেষণা আরম্ভ হলো।

এই নাটকীয় পরিবর্তনের কারণ, নেদো মল্লিক ছাড়া আর কেউ জানেন না। নেদো মল্লিকের সান্ধ্য আসরে বীরেশ্বর নতুন নাটকের গল্পটা শুনিয়েছিলেন।

নেদো মল্লিক বলেছিলেন, "সাধু, সাধু। তোমার উদ্দেশ্যটা আমি বেশ বুঝতে পারছি, বীরেশ্বর। এতোদিন বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় যেতাম—অভিনয় দেখার জন্যে থিয়েটারে, গান শোনার জন্যে বাঈজীবাড়িতে, মাতাল হবার জন্যে মদের দোকানে, দুষ্টুমির জন্যে পতিতালয়ে। এখন আর বিভিন্ন জায়গায় ছোটাছুটি করতে হবে না। একই ছাদের তলায় একই জায়গায় বসে সব রকম আনন্দের প্যাকেট একসঙ্গে পাওয়া যাবে—একের মধ্যে চার!"

"সাপের হাসি বেদেয় চেনে! তুমি আমার মনের কথাটা ঠিক ধরে ফেলেছো, নেদোদা।" বিপুল উৎসাহে বীরেশ্বর এবার সমুদ্রসৈকতে স্নানরতা সুন্দরীর দৃশ্য বর্ণনা আরম্ভ করেছিলেন।

নেদো মল্লিক কিন্তু ঠোঁট বেঁকালেন। বললেন, "তোমার বুদ্ধিশুদ্ধির ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস ছিল, বীরেশ্বর। ঘরের জিনিসকে এই ভাবে বে-আব্রু করে পাবলিকের সামনে দেখাবে তুমি? কীসের জন্যে? টাকা তোমার কম পড়েছে?"

ঠিক বলেছেন নেদো মল্লিক। এই দিকটা বীরেশ্বরের একেবারে খেয়াল হয় নি—অমর দত্তকে টেক্কা দিয়ে বেদিং বিউটি দেখাবার নেশায় তাঁর মাথা গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। মধুমালতী তো বাজারের জিনিস নয়। তার বাড়ির সামনে তিনি তো দারোয়ান বসিয়ে দিয়েছেন।

কিছুদিন পরে নিজের ঘরে মধুমালতী অভিমানে মুখ ভারী করে বসেছিল। মধুমালতীর মুখে মেঘ দেখতে চান না বীরেশ্বর। ওর স্নিগ্ধ প্রসন্ন মুখে চুম্বন এঁকে দিয়ে শেয়ার বাজারে গেলেই বীরেশ্বর অনেক টাকা লাভ করেন।

বীরেশ্বর অবাক হয়ে গেলেন। যে-মালতী বেদিং স্যুট পরে স্টেজে নামতে প্রবল আপত্তি জানিয়েছিল, সেই বলছে, "অন্তত একদিনের জন্যে ওই বেশে স্টেজে নামবো।"

সব কথা শুনে বীরেশ্বর বুঝলেন, মধুমালতীর রাগ করার কারণ আছে। গ্রীনরুমে গুজব ছড়িয়েছে, বেদিং স্যুট পরে স্টেজে নামবার মতো ফিগার কুহেলীর নেই বলেই শেষ মুহূর্তে এই পরিবর্তন। গুজবটা যে নিতান্তই গুজব তা বীরেশ্বর অন্তত জানেন। চোয়াল দুটো চেপে বীরেশ্বর বললেন, "কাদের তুমি সন্দেহ করো, মধু? অধর এবং নরহরি যদি এর মধ্যে থাকে তা হলে আজই লাথি মেরে ওদের দূর করে দিচ্ছি।"

বীরেশ্বরের রাগ কীরকম তা মধুমালতী জানে। তাই সঙ্গে সঙ্গে সে জানিয়েছিল, নরহরি এবং অধর সম্বন্ধে সে কিছুই খবর রাখে না। জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মতো বীরেশ্বর বললেন, "তেমন সন্দেহ হলে, কোহিনুরের সব-কটা লোককে লাথি মারতে-মারতে আমি আজ থেকে বিদায় করে দেবো।"

অনেক কষ্টে মধুমালতী সেদিন বীরেশ্বরকে শান্ত করেছিল। এই থিয়েটারের কারও চাকরি যাক, তা সে চায় না। থিয়েটারের মানুষদের সঙ্গে তার অদ্ভুত সম্পর্ক। বিনোদমাসীর কথা মনে পড়ে যায়—"যাদের সঙ্গে চিরদিন ভাই-বোনের মতো একত্রে কাটিয়েছি, আমি যাদের চিরবশীভূত, তাদের কষ্ট আমি দেখতে পারি না। তারা আমার শত সর্বনাশ করলেও আমি তাদের দলে।"

'সমুদ্র সৈকত' নাটক কিন্তু প্রথম নাটকের মতো জমলো না। এক বছর চলবার পরেই ধুঁকতে লাগলো। অথচ সমুদ্র সৈকতের সীনের জন্যে যেসব যন্ত্রপাতি বসাতে হয়েছে, তাতে পুরো তিন বছর না-চললে তেমন লাভ হয় না। এর জন্যে কাকে দোষ দেবেন বীরেশ্বর? মধুমালতী ছাড়া অন্য কোনো নায়িকা থাকলে

বীরেশ্বরের কোনোরকম দ্বিধা থাকতো না। বেদিং সুট পরা কুহেলীর বর্ণনা করে অধর একটা মারাত্মক ডায়ালগ লিখেছিল। কুহেলীর স্বামী বলছে—সাগর জলে সিনান করি, সজল এলো চুলে, বসেছিলে উপল উপকূলে। ঠিক সেই সময় কুহেলীর প্রাক্তন প্রেমিক টেলিফটো লেন্সে দূর থেকে কুহেলীর ছবি তুলছে।

সীনটা যখন পাল্টালো, তখন অধরকে কতবার বীরেশ্বর বললেন, "এইখানটা মন দিয়ে লেখো। যা চোখের সামনে দেখানো গেলো না, তা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দাও, দর্শকদের কল্পনায় সুড়সুড়ি দাও। দৃশ্যটাকে একটা অবিস্মরণীয় দৃশ্য করে তোলো।"

এরপরে অধরের কীর্তিকাহিনীর খবর বীরেশ্বর বিশ্বস্ত সূত্র থেকে সংগ্রহ করেছেন। নাট্যকার অধর হাতে কলম ধরে রাতের অন্ধকারে লেবেডফ, গিরিশ ঘোষ, ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, যোগেশ চৌধুরী, এমন কি বঙ্কিম ও শরতের করুণাভিক্ষা করেছে। কাতরভাবে বলেছে, 'বঙ্গরঙ্গমঞ্চের স্বর্গত মহাপুরুষগণ আপনারা এই অধমকে ক্ষমা করুন। আমার কলমে এমন কয়েকটা সংলাপ দিন যা শুনে দর্শকরা ধন্য ধন্য করবেন, কোহিনূর থিয়েটারের সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়ে যাবে এবং ম্যানেজার নরহরি বিরাশিখানা বাড়তি চেয়ার বসিয়ে, আরও চেয়ার ভাড়া করবার জন্যে ডেকরেটরের দোকানে ছুটবে।' কিন্তু অধরের প্রার্থনায় ফল হয়নি—কিছুই তেমন করা গেলো না।

বীরেশ্বর জানেন স্টেজের আড়াল থেকে অধর চাটুজ্যে অবাক হয়ে হলের দর্শকদের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এক এক সময় নদীস্রোতের মতো এই দর্শকপ্রবাহের ওপর সমস্ত ভক্তিশ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে অধরের। অধরের ধারণা, পাদ-প্রদীপের মোহিনী আকর্ষণে সমস্ত জীবনটাই সে নষ্ট করেছে। এর থেকে কোনো আপিসে কেরানীগিরি করলে অনেক বেশী সুখে থাকা যেতো।

নরহরি এসে একবার অধরকে জিজ্ঞেস করলো, "কী ভাবছেন দাদা? পরবর্তী নাটকের কোনো সীন?"

নরহরিও নাকি এই লাইনে তিন পুরুষ ধরে জলেপুড়ে মরছে! অধর জিজ্ঞেস করলো, "এতো লাইন থাকতে, হতভাগা, এ-লাইনে এলি কেন? আমার না-হয় পায়রাবুক—বড় অফিসের ডাক্তারি পরীক্ষায় পাস করতে পারতাম না। তোর তো জোয়ান চেহারা।"

নরহরি সহানুভূতির ইঙ্গিত পেয়ে বললো, "সত্যি দাদা, কেন যে মরতে এ লাইনে এলাম। আমার শ্বশুর বলেছিলেন, নরহরি চলো, তোমাকে শাহাগঞ্জের রবার কারখানায় চাকরি করে দিচ্ছি।' আমি তখন ভাবলুম কোথায় রবারের বোঁটকা গন্ধ আর কোথায় থিয়েটারের মাতোয়ারা সেণ্ট।"

একটা সীন শেষ করে মধুমালতীও তখন ভিতরে ঢুকেছে। স্টেজে যে ছিল লজ্জাবতী নববধূ, সাজঘরের ভিতরে এসে সে কেমন ধড়াস করে অধরের পাশে বসে পড়লো। "অধরদা, বাদাম খাবে?" জিজ্ঞেস করলো মধুমালতী।

"তুই এখন স্বামীর সঙ্গে পুরীর বি এন আর হোটেলে রয়েছিস, চপ কাটলেট খাচ্ছিস, ওই মুখে বাদাম রুচবে?" অধর হেসে মন্তব্য করলো।

"আঃ, অধরদা!" মৃদু প্রতিবাদ করলো মধুমালতী।

অধর বললো, "জানিস মালতী, অনেক আইবুড়ো মেয়ে শুধু তোকে দেখতে থিয়েটারে আসছে। বিয়ের পরেই হনিমুনে স্বামীর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে তা তোর অ্যাকটিং থেকে ওরা মুখস্থ করছে।"

মধুমালতী এবার গম্ভীর হয়ে গেলো। মেকআপম্যান এসে মনে করিয়ে দিলো, পরের সীনের জন্যে কাপড় পাল্টাতে হবে। মধুমালতী বললো, "অধরদা, আসল হনিমুনে গেলে আমার কোনো অসুবিধে হবে না বলছো?"

অধরদার শুকনো মুখ গম্ভীর হয়ে রইলো। সে ফিসফিস করে বললো, "মরতে কেন মা এ-লাইনে এলি? বরের সঙ্গে হনিমুনে যাবার মতো সব যোগ্যতাই তো তোর ছিল।"

ড্রেস পাল্টাতে যাবার আগে মধুমালতী জিজ্ঞেস করেছিল, "এতো কী ভাবছো, অধরদা?"

অধর যে উত্তর দিয়েছিল তা যথাসময়ে বীরেশ্বরের কানে পৌঁছেছিল। অধর বলেছিল, "আজ সকালে হঠাৎ সেযুগের থিয়েটার দিকপাল রাজকেষ্ট রায়ের কথা মনে পড়ে গেলো। এই থিয়েটার লাইনেই কবি রাজকেষ্ট রায় সর্বস্ব হারিয়েছিলেন। অপরেশ মুখুজ্যে একবার কম বয়সে ওঁর কাছে গিয়েছিলেন। ওঁরা থিয়েটার লাইনে ঢুকতে চান জেনে রাজকেষ্টবাবু ভীষণ রেগে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, পরকালে নরক আছে শুনেছেন তো? ইহকালের নরক হলো এই থিয়েটার।"

মধুমালতী কথাটা শুনেই দ্রুত চলে গিয়েছিল। কিন্তু চতুর নরহরি কায়দা করে প্রশ্ন করেছিল, "কী ব্যাপার অধরদা? সায়েব কিছু বলেছে তোমায়?"

"বলবার তো কোনো প্রয়োজন নেই। পদত্যাগপত্র তো সই করিয়ে রাখা আছে, শুধু তারিখটা বসিয়ে নেওয়া," শতসহস্র রজনীর সফল নাট্যকার অধর চাটুজ্যে বিমর্ষবদনে উত্তর দিয়েছিল। পদত্যাগ পত্রের ব্যাপারটা অধর যে মনে রেখেছে এটা খুবই ভাল কথা। খবরটা পেয়ে বীরেশ্বর মনে মনে খুশী হয়েছিলেন।

পরের বই-এর আইডিয়া শেষ পর্যন্ত অধরের মাথায় এসেছিল এবং সে-বইতে বাজিমাৎ করেছিলেন নাট্যকার, নির্দেশক বীরেশ্বর রক্ষিত। 'নগরীর নটী' বইতে শুধু বক্স অফিস নয়, সমালোচকদের হৃদয়ও জয় করেছিল কোহিনুর থিয়েটার। চারশ' অভিনয়-রজনীতে আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র থেকে বীরেশ্বরের সাক্ষাৎ-

কার প্রচারিত হয়েছিল। এর আগে কোহিনূর থিয়েটার হলে বিশেষ এক অনুষ্ঠানে নাট্যকারের সোনার কলম ও চাদর বীরেশ্বর গ্রহণ করেছিলেন থিয়েটারের প্রবীণতম কর্মচারী শ্রীঅধর চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। রেডিওর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আগে বীরেশ্বর হুকুম করেছিলেন, "অধর, দু-চারটে পয়েন্ট দাও। এই নাটকটা কীভাবে আমার মাথায় এলো?"

অধর একটুও অসহযোগিতা করে নি। কিন্তু বীরেশ্বরের মনে হয়েছিল, ওর চোখ দুটো বরফ-চাপানো মাছের মতো শীতল। ব্যাটাচ্ছেলে যদি ওই রকম ঠাণ্ডা না হয়ে থেকে নিজের অধিকার আদায়ের জন্যে রেগেমেগে তেড়েফুঁড়ে উঠতো তাহলে বোধ হয় ভাল হতো, বীরেশ্বর ভাবলেন।

অধর কিন্তু আত্মরক্ষার আপ্রাণ চেষ্টায় নিজেকে পরমুহূর্তেই সামলে নিয়েছিল। অধর বলেছিল, "রেডিওর সাক্ষাৎকারে আপনি দুটো ঘটনার উল্লেখ করতে পারেন। সেকালের ক্লাসিক থিয়েটারে আলিবাবার সাফল্য। ১৮৯৭ সালে ২০শে নভেম্বর অমর দত্ত বাংলা থিয়েটারে নতুন যুগ নিয়ে এলেন।"

চোখ বুজে সমস্ত শুনলেন বীরেশ্বর। তারপর সোজা চলে গেলেন রেডিও অফিসে।

আকাশবাণী থেকে বীরেশ্বর প্রথমেই সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালেন নাট্যজগতে তাঁর পূর্বসূরীদের। তারপর শুরু করলেন 'আলিবাবা' নাটকের কথা। বীরেশ্বর বললেন, "সে একদিন। যুবকরা চললো, প্রৌঢ়রা চললো, বৃদ্ধরা চললো বিডন স্ট্রীটের ক্লাসিক থিয়েটারে। সেকেণ্ড-ক্লাস ঘোড়ার গাড়ির দরজা-জানলা বন্ধ করে বাড়ির স্ত্রী, কন্যা, বধূরা ছুটলেন আবদাল্লা-মর্জিনার নাচ দেখতে। গানেও দেশ মশগুল। গৃহবধূ স্নানের ঘরে গুনগুন করলো 'বাজে কাজে মিনসেকে আর যেতে দেবো না'। কোচম্যানরা গাইলো—'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল'। এর থেকেই অনুপ্রেরণা

পেলাম। সেই সঙ্গে মনে পড়লো, শাজাহান নাটকের সাফল্যের পর মিনার্ভার অভিনেতা প্রিয়নাথবাবু একবার নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে বলেছিলেন, 'এতদিন পিঁয়াজ-রসুন খাইয়ে গা গন্ধ করে দিয়েছেন। এবার একটু ঘি-আলোচাল দিন না।' দ্বিজেন্দ্রলাল এর পরেই চন্দ্রগুপ্ত নাটক রচনা করেছিলেন। আমিও ওই একই ইঙ্গিত পেয়ে প্রাচীন হিন্দুযুগে ফিরে গেলাম এবং বহু গবেষণা এবং সাধনার পর রচনা করলাম অতীত যুগের পাটলীপুত্রকে কেন্দ্র করে 'নগরীর নটী'। আমার এই সুদীর্ঘ গবেষণার মূল প্রেরণাদাত্রী শ্রীমতী মধুমালতী গুপ্তা। প্রাচীন ভারতীয় নটীর রূপসজ্জায় তিনি যে অবিস্মরণীয় অভিনয় করছেন তা বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।"

মুখ টিপে হাসতে হাসতে নেদো মল্লিক পরের দিন বীরেশ্বরকে বলেছিলেন, "রেডিওতে শুনলাম তোমার লেকচার। বেশ বলেছো। শুধু একটা কথা বুঝলাম না। 'আলিবাবা'র দৌলতে অমরবাবু সে যুগে লক্ষ টাকা রোজগার করেছিলেন। এ-বইতে তুমি কত তুলেছো এখন পর্যন্ত?"

নেদো মল্লিকের কাছেও বীরেশ্বর আজকাল একটু সাবধানী হয়ে উঠেছেন। সমস্ত তাস আজকাল দেখান না। মিষ্টি হেসে বীরেশ্বর বললেন, "আজকাল খরচ দশগুণ বেড়েছে, কিন্তু থিয়েটার টিকিটের দাম সে তুলনায় বাড়ে নি। অমর দত্ত নিজে নিমতলা থেকে উঠে এলে, আমার খরচের বহর দেখে ভিরমি খাবেন।"

কেষ্টদাস কুণ্ডু স্ট্রীটের বাড়িতে বেঁটে মোটা পাশবালিশটা

জড়িয়ে বীরেশ্বর রক্ষিত পাশ ফিরলেন। এই সামান্য সময়ে তিনি দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এলেন। মধুমালতীর সঙ্গে এসব নিয়ে গল্প করতে পারলে বেশ হতো। কিন্তু পাতলা একখানা লেপের তলায় নিজেকে লুকিয়ে সে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। বীরেশ্বরের এই দুর্ভাগ্য—এক একদিন কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না। মনে হয় তাঁর চোখের পাতা কেউ ধারালো কাঁচিতে কেটে দিয়েছে, বীরেশ্বর চোখ বন্ধ করতে পারছেন না। চোখে হাত দিলেন বীরেশ্বর রক্ষিত। না, দুটো চোখেই তো পাতা রয়েছে, তবু কেন রাত্রির শেষ প্রহরে গভীর নিদ্রায় অচেতন নারীসান্নিধ্যে তিনি এইভাবে জেগে রয়েছেন ?

বীরেশ্বর ভাবলেন, 'নগরীর নটী' পর্যন্ত এসেও তো তাঁর জীবনের গল্প শেষ হয়ে যেতে পারতো। অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছেন তিনি, হরেন নিয়োগী এখন তাঁরই থিয়েটারের সামনে রাধাবল্লভী বিক্রি করে। রাজনটী রাগমালার ইচ্ছা তিনি পূর্ণ করেছেন—মধুমালতী এখন একান্তই তাঁর নিজস্ব। মধুমালতীকে তিনি শুধু আশ্রয় ও আর্থিক নিরাপত্তা দেন নি, সেই সঙ্গে এনে দিয়েছেন অভূতপূর্ব খ্যাতি। বাংলা থিয়েটারের কোনো কর্তা-ব্যক্তিই—এমন কি ধনপতি গুরমুখ রাই পর্যন্ত তাঁর আশ্রিতা বিনোদিনীকে এইভাবে সুখ দিতে পারে নি। অনাস্বাদিত সুখের সন্ধানে বেরিয়ে বীরেশ্বর নিজেও পেয়েছেন অনেক কিছু। মলঙ্গা লেনের সেই খুদে বীরেশ্বর রক্ষিত সময়ের আবর্তে এখন সত্যিই সম্রাট হয়ে উঠলেন।

বিছানাটা সামান্য নড়ে উঠলো। মধুমালতী ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরলো। ওর চুড়ির আওয়াজ বেশ কিছুক্ষণ বীরেশ্বরের কানে বাজছে।

থিয়েটারটা মনে ধরে গিয়েছে বীরেশ্বরের। এক এক সময় ইচ্ছে হয় শেয়ার বাজার ও সিমেন্টের ব্যবসার দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে

চাপিয়ে তিনি পুরোপুরি এই থিয়েটার লাইনে ডুবে থাকবেন। বীরেশ্বর রক্ষিত সেদিন ফ্যান মেল পর্যন্ত পেয়েছেন। দুটি মেয়ে উচ্ছ্বসিত ভাষায় নাট্যকার বীরেশ্বরকে অভিনন্দন জানিয়েছে এবং তাঁর অটোগ্রাফ করা ছবি চেয়ে পাঠিয়েছে। সিমেণ্ট ও শেয়ার বাজার প্রসঙ্গে নিজের ছেলের কথা মনে পড়লো। খোকন ইচ্ছে করলেই বীরেশ্বর (সিমেণ্ট) লিমিটেডের দায়িত্ব নিতে পারে। কিন্তু···বীরেশ্বর একটু মানসিক ধাক্কা খেলেন।

রক্ষিতার বিছানায় শুয়েও বীরেশ্বরের অবাধ্য মন হঠাৎ বাড়ি ফিরে চলেছে। তিনি কুইনস্ পার্কে বাড়ির গেটটা, তাঁর শোবার ঘর এবং ছেলের ঘরটা দেখতে পাচ্ছেন। একমাত্র সন্তানের শান্ত গম্ভীর মুখটা তাঁর সামনে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যৌবনে বীরেশ্বর তো ঐ রকম ছিলেন না—খোকন ওই গাম্ভীর্য কোথা থেকে পেলো?

একমাত্র সন্তানকে কেন্দ্র করে বীরেশ্বর অবশ্যই বহু স্বপ্ন দেখেন। কপর্দকশূন্য অবস্থা থেকে নিজের চেষ্টায় ও সাধনায় বীরেশ্বর যে-সাম্রাজ্য তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন, তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব তো খোকনের।

খোকন এখন খোকনটি নয়। সে বড়ো হয়েছে—সাবালক হয়েছে। নিজের খেয়ালখুশী মতোই চলেছে সে। বীরেশ্বর এখনও বাধা দেন নি—বীরেশ্বর জানেন ব্যবসা-বাণিজ্য, বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া-ঝগড়ি খোকনকে সারা জীবন ধরেই করতে হবে, এখন একটু প্রজাপতির মতো মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াক। শ্যামার ধারণা, বীরেশ্বর নিজের সন্তান সম্বন্ধে বিশেষ মাথা ঘামান না। বীরেশ্বর কখনও প্রতিবাদ করেন নি, কিন্তু কথাটা মোটেই সত্য নয়। মুখোমুখি না হলেও, দূর থেকে তিনি খোকনের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। নিজের সন্তানকে এই ভাবে দেখার মধ্যে অনির্বচনীয় এক আনন্দ আছে।

বীরেশ্বরের এবার আচমকা মনে পড়লো, খোকনের ঘরটা কয়েকমাস হলো বন্ধ রয়েছে। কী একটা ডিগ্রীর ছুতোয় সে আমেদাবাদে পাড়ি দিয়েছে। কয়েকমাস অন্তর খোকন এক-আধবার কলকাতায় হাজির হয়—কয়েকদিন বাড়িতে থেকে সে আবার আমেদাবাদে ফিরে যায়। এই মাসেই পড়া শেষ হয়ে যাবার কথা—কিন্তু শ্যামা তো ফোনে বললো আবার কী একটা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী নেবার মতলব আঁটছে খোকন।

বীরেশ্বর এই বিনিদ্র রজনীতে খোকনের মুখটি স্মরণ করে বেশ আনন্দ পাচ্ছিলেন। কিন্তু আচমকা সেবারের ঘটনা মনে পড়ে গেলো। কেষ্টদাস কুণ্ডু স্ট্রীটের এই ঘরে এই বিছানাতেই শুয়ে শুয়ে খোকনের কথা ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন বিরেশ্বর। খেয়ালের মাথায় মধুমালতীর এখান থেকেই খোকনকে ফোন করেছিলেন তিনি। কী আশ্চর্য! খোকন ফোন ধরেছিল, কিন্তু পরমূহূর্তেই কোনো কথা না বলেই খোকন ফোন নামিয়ে রেখেছিল। ব্যাপারটা বীরেশ্বর ঠিক বুঝতে পারেন নি। কিন্তু পরের দিন শ্যামা চোখের জল মুছতে মুছতে স্বামীকে অনুরোধ করেছিল, "খোকন তো বড় হয়েছে। তুমি আমার একটা কথা রাখবে? কখনও কেষ্টদাস কুণ্ডু স্ট্রীট থেকে এখানে ফোন কোরো না."

ছোট্ট সেই ঘটনার স্মৃতি এই মুহূর্তে বীরেশ্বরের মনে আবার অস্বস্তি সৃষ্টি করছে। বিরক্ত বীরেশ্বর স্থির করলেন, কেষ্টদাস কুণ্ডু স্ট্রীটে নটী মধুমালতীর বিছানায় শুয়ে একমাত্র সন্তান নির্মলের কথা তিনি ভাবতে চান না। ভাববার মতো আরও অনেক বিষয় তাঁর রয়েছে বিশেষ করে লিপিকার কথা। মধুমালতীর পাশে শুয়ে তিনি এখন লিপিকার কথাই স্মরণ করতে চান।

লিপিকা। লিপিকা। বীরেশ্বরের পঞ্চম নাটক 'কামনা-বাসনায়' পাশ্চাত্য নৃত্যের ব্যবস্থা হয়েছিল। নতুন নাটকের প্রস্তুতিপর্বে বীরেশ্বরকে খুশী করবার জন্যে নরহরি বলেছিল, "আবার আপনি ইতিহাস সৃষ্টি করতে চলেছেন। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের মধ্যে প্রথম নাচ এলো 'সতীকলঙ্কিনী' গীতিনাট্যে। তারপর এই এতদিন পরে থিয়েটারে ক্যাবারে ঢোকাচ্ছেন আপনি। বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের হানড্রেড ইয়ারসের ইতিহাস যখন লেখা হবে তখন মস্ত একটা চ্যাপ্টার আপনার সম্বন্ধে থাকবে।"

হিসট্রি-ফিসট্রির লোভ দেখিয়ে বীরেশ্বরকে ভেজানো অত সহজ নয়। প্র্যাকটিক্যাল লোক বীরেশ্বর, তিনি বললেন, "কাজের কথায় এসো। সোনাগাছির মেয়েদের দিয়ে সেযুগে বাংলা নাটকের স্ত্রীচরিত্র শুরু হয়েছিল। কিন্তু এযুগে বিলিতি নাচের মেয়েদের তোমরা কোত্থেকে যোগাড় করবে?"

নরহরি তৎক্ষণাৎ বললো, "সে আপনি চিন্তা করবেন না স্যার! অধরবাবু নিজে খোঁজখবর করতে গিয়েছেন, থিয়েটার মেটিরিয়াল সাপ্লায়ার মিঠাই হাজরার কাছে।"

"মেটিরিয়াল নয়—আমি নর্তকী চাইছি," বীরেশ্বর বিরক্তভাবে উত্তর দিয়েছিলেন।

"সে আপনি ভাববেন না। মোমবাতি থেকে আরম্ভ করে মেয়েমানুষ পর্যন্ত থিয়েটারে যা-কিছু লাগে সব খবর রাখেন মিঠাইবাবু। তিনি নিজে সাপ্লাই করতে পারলে ভালই, না হলে ওঁর ভাই মাখনের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। মণ্ডা, মিঠাই, মাখন তিন ভাই তো এই লাইনে তিনপুরুষ ধরে আছেন।"

অধর এবং নরহরি দু'জনে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে সায়েবপাড়ার এক হোটেল-নর্তকীকে যোগাড় করে এনেছিল। মেয়েটার অরিজিন্যাল নাম ছিল চামেলি, কিন্তু সাহেবপাড়ার হোটেলে বিলিতি নাম ছাড়া জমে না। বৌবাজারের চামেলিকেই হোটেলের কর্তারা 'লাসাস লোলা' বলে চালাচ্ছিল। ওদের কথাবার্তা এবং বিজ্ঞাপনে এমন একটা ভাব, যেন খোদ লণ্ডন থেকেই লোলাকে আমদানি করা হয়েছে।

সেই মেয়েকে খুঁটিয়ে দেখলেন বীরেশ্বর। ক্যাবারে লাইনের মেয়েগুলোর দেমাক বড্ড বেশী।

উত্তর কলকাতায় এসে কোহিনূর থিয়েটারে বীরেশ্বরের সামনে হাজির হওয়ার জন্যেও টাকা চার্জ করেছিল। বীরেশ্বর জিজ্ঞেস করেছিলেন, "নরহরি, লুসিয়াস মানে কী ?"

"আমি ইংরিজীতে একটু উইক, স্যর," নরহরি উত্তর দিয়েছিল।

তখন অধরের দিকে তাকিয়েছিলেন বীরেশ্বর। অধর বলেছিল, "ইংরিজী উচ্চারণটা বোধহয় লাসাস মানে খুব মিষ্টি।"

"এই বুঝি তার নমুনা!" বীরেশ্বর বেশ বিরক্ত হয়েছিলেন।

অধর বলেছিল, "এর থেকে বেশী ভাল হলে সে মেয়ে কেন অর্ডিনারি হোটেলে নাচতে যাবে, স্যর ? তারা সঙ্গে সঙ্গে ফরেনে এক্সপোর্ট হয়ে যাবে। আমাদের হোটেলগুলোর অবস্থাও ভাবুন। ফরেন থেকে মেয়েমানুষ ইমপোর্ট একেবারে বন্ধ। আগেকার দিনে এই কলকাতার শাজাহান হোটেলে, মার্কনি রেস্তোরাঁয়, গ্র্যাণ্ড, গ্রেটইস্টার্নে আমরা কী সব ফরেন ডান্সার দেখেছি! লাস্ট দেখেছিলাম, অ্যাকটর শরৎ দত্তর দয়ায় মিস্ এটম বোম্বকে। সে এক জিনিস! বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল, হার্টফেলের জন্যে হোটেল কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।"

বিজ্ঞাপনের ভাষাটা বীরেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে নোট করে নিয়েছিলেন। নরহরি বললো, "লুসিয়াসের বদলে, বিজ্ঞাপনে আমরা লাস্যময়ী লোলা বলতে পারি।"

বীরেশ্বর রহস্যময় হাসিতে মুখ ভরিয়ে নির্দেশ দিলেন, "ওর আসল নাম যখন চামেলি, তখন নতুন নাম দাও মিস সি। বিজ্ঞাপনে বলা যাবে, ক্যালকাটায় এই প্রথম।"

"হোটেলের ভিজিটররা যদি দেখতে আসে এবং আমরা ধরা পড়ে যাই ?" নরহরি উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল।

সবসময় শুধু ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় এই নরহরি লোকটার। "সেই জন্যেই লাইফে তোমার কিছু হলো না নরহরি", বীরেশ্বর বকুনি লাগিয়েছিলেন। "ধরা পড়বার ভয় থাকলে বিপ্লবী গণেশ মিত্র দেশের জন্যে কিছু করতে পারতেন ? ধরা পড়বার ভয়ে ধুকপুক করলে আমি পারতাম জীবনে কিছু করতে ?"

ক্যাবারে নর্তকী আমদানির ব্যাপারটা মধুমালতীর ঠিক পছন্দ হয় নি। নাটকের স্বধর্মচ্যুতি হতে পারে, এই ভয় মধুমালতীর। কিন্তু বীরেশ্বর চালাক লোক। সোজাসুজি গায়ের জোর না খাটিয়ে মধুমালতীকে বুঝিয়েছিলেন—"যুগের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে যেতে হবে, মধু। পোয়েট রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার।"

মধুমালতী তবুও মত পরিবর্তন করতে চায় নি। বিদেশের ভালটা আমাদের নিতে হবে, খারাপটা নয়। কিন্তু বীরেশ্বর অত সহজে ছাড়বার পাত্র নন। তিনি বলেছিলেন, "কোন্‌টা ভাল এবং কোন্‌টা মন্দ তা বিচার করবার আমরা কে ? একমাত্র মহাকালই এর বিচার করতে পারে, মধু। রঙ্গমঞ্চে মেয়েদের অভিনয়ের কথাই ধরো। মাইকেল মধুসূদন পরামর্শ দিলেন, ছেলেদের মেয়ে সাজা বীভৎস—থিয়েটারে মেয়েদের আনতেই হবে। অথচ অমন যে অমন বিদ্যাসাগরমশায় তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। তাঁর

ধারণা হলো, দেশের লোকদের চরিত্র উচ্ছন্নে যাবে। ওই ইস্যুতে তিনি থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন।"

এরপর মধুমালতী চুপ করে গিয়েছে। এই বইতেও তার প্রধান ভূমিকা ধনীর আদরের দুলালী ছন্দার বিয়েতে মন নেই। তাই তাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলবার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা হচ্ছে। ছন্দার বেশী সময় কাটে হোটেলে, রেস্তোরাঁয়, কফির দোকানে এবং ক্লাবে। এমনই এক হোটেলে তার সঙ্গে দেখা হলো চন্দন সেনের। সদ্য বিদেশপ্রত্যাগত চন্দন এদেশে সশস্ত্র বিপ্লব আনতে চায়। মালিক বীরেশ্বরের নির্দেশে অধর বিপ্লবের সঙ্গে ক্যাবারের চমৎকার ককটেল করেছে।

কোহিনূরের অফিসঘরে বসে বীরেশ্বর একদিন অধরের কাছে স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন। অধরকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, দানছত্র করবার জন্যে তিনি থিয়েটার লাইনে আসেন নি। বীরেশ্বর বলেছিলেন, "একটা সোজা কথা মনে রাখবে অধর। রামকৃষ্ণ মিশন থেকে রেসকোর্স, ক্রাইস্ট থেকে ক্যাবারে, ব্রহ্মা থেকে বেশ্যা, আমাদের কাছে কোনো বাছবিচার নেই। পাবলিকের নাড়ি বুঝে শরবত তৈরি করতে হবে—কখনও ডাবের শরবত কখনও ভাঙের শরবত। পয়সা ফেলনেওয়ালা পার্টির যা অভিরুচি আমরা তাই সাপ্লাই করবো।"

নতুন নাটকে ক্যাবারের ডোজ একটু কড়াভাবেই দেওয়া হয়েছে। চন্দন সেন গোপনে কলকাতার অভিজাত ০০৮ রেস্তোরাঁয় এসেছে তার দলের একজনের সঙ্গে গোপনে দেখা করতে। নৃত্যের পরে ধনীর দুলালী ছন্দার সঙ্গে নতুন নর্তকীর সামান্য ডায়ালগ। তারপর ছন্দার সঙ্গে ছদ্মবেশী চন্দনের কিছু কথাবার্তা। চন্দন এই সময় নর্তকীকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে, এই জীবন তার ভাল লাগে? হোটেলের এই অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরতে ইচ্ছে করে না তার? অত্যাচারীর পদভারে নত পৃথিবী যে তাকে বাইরে ডাকছে।

এমন সময় চন্দনের সন্ধানে পুলিসের আকস্মিক আবির্ভাব—অকুস্থলে দুইপক্ষের গুলিগোলা বিনিময়—সে এক ভীষণ ব্যাপার। যাকে নরহরি বিজ্ঞাপনে বলেছে 'নাটকের চেয়ে নাটকীয়'।

নর্তকী মিস সি ওরফে চামেলি সুযোগ বুঝে একটু বেশী দাম হেঁকেছিল। তার ওপর আসা-যাওয়ার গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। সেকেণ্ড শোতে নাচ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হোটেলে পৌঁছে দিতে হবে, সেখানকার শোটাও লাসাস লোলাকে চালিয়ে যেতে হবে। কালো পর্দায় ঢাকা ঘোড়ার গাড়িতে থিয়েটারের মেয়েদের রঙ্গমঞ্চে নিয়ে যাওয়া এবং পৌঁছে দেবার রীতি অনেক দিনের। কিন্তু সে সব ব্যবস্থা যারা কাছাকাছি থাকে তাদের জন্যে। মিস সি-কে পার্ক স্ট্রীটে পৌঁছে দিতেও বীরেশ্বর রাজী হলেন।

মিস সির হাবভাব লক্ষ্য করে বিরক্ত হয়ে অধর বলেছিল, "এই মেয়েকে থিয়েটারের জন্যে তৈরি করা স্বয়ং গিরিশবাবুর পক্ষেও অসাধ্য। এর দেহ কোনোরকমে নাচে, কিন্তু জিভ নড়তে চায় না। আর যা কথা বলবার ধরন!" অধরের ইচ্ছে, সীনটা বাদ যাক্। তার মূল গল্পের সঙ্গে ক্যাবারে নৃত্যের কোনো সম্পর্কও নেই।

বীরেশ্বর বললেন, "অধর, ওকে ন্যাচারাল রাখো। অভিনয় শেখাবার চেষ্টা কোরো না। ক্যাবারে মেয়ে যেভাবে কথা বলে সেইভাবে ডায়ালগ বলুক।"

আবার হৈহৈ-রৈরৈ কাণ্ড। নৃত্যপটীয়সী মিস সির স্বেচ্ছাবস্ত্রবিবর্জন দেখতে বেশ ভিড় হচ্ছে এবং লোকমুখে খবরটা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে টিকিট বিক্রি বাড়ছে।

কিন্তু সেই সঙ্গে নরহরির চিন্তা বাড়ছে। চল্লিশ অভিনয় রজনীর দিনে পাড়ার কয়েকটি ছেলে এসে নরহরির কাছে প্রতিবাদ জানিয়ে গিয়েছে। সায়েবের সঙ্গেও দেখা করতে চেয়েছিল তারা, অনেক কষ্টে নরহরি ছাত্রদলকে বিদায় করেছে।

নরহরির কাছে রিপোর্ট পেয়ে বিরক্ত বীরেশ্বর নির্দেশ দিয়েছেন, "আমার সঙ্গে মোটেই ওদের দেখা করতে দেবে না। জিজ্ঞেস করলেই বলবে, উনি এখন নতুন নাট্যরীতি আবিষ্কারে ব্যস্ত আছেন। সারাদিন পরিশ্রমের পর উনি এই সময় একান্তে দেবী সরস্বতীর সাধনা করেন।" কথাটা যদিও একেবারেই মিথ্যে। ভাউচার এবং চেক সই ছাড়া আর কোনো কাজেই বীরেশ্বরকে কলম ধরতে হয় না।

নরহরি সায়েবকে জানিয়েছে, "ছেলেরা বলছে, নাটকের নামে রঙ্গমঞ্চে অশ্লীলতা আমদানি করা হচ্ছে।"

হয়তো আবার গোলমাল হতে পারে। কিন্তু তার আগেই বীরেশ্বর গোড়া বেঁধে ফেলতে চান। দেশের কয়েকজন হোমরা-চোমরা লোককে নাটকটা দেখাতে হবে। পাড়ার ছোঁড়ারা এলে তাদের মুখের ওপর বলা যাবে—জজ-ব্যারিস্টাররা নাটক দেখে ধন্য ধন্য করছেন, আর তোমরা কী বলছো ভাই ?

সেই উদ্দেশ্যেই পঞ্চাশ রজনীর বিশেষ উৎসব করছেন বীরেশ্বর। অর্ধশত রজনীতে কেউ কখনও উৎসব করে না। নবরূপে কোহিনূরের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে বিশিষ্ট নাগরিকদের কাছে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন বীরেশ্বর।

তার আগের দিন গ্রীনরুমে নাটকের কুশীলবদের সঙ্গে দেখা করেছেন বীরেশ্বর। আজকাল গ্রীনরুমে বড় একটা আসেন না বীরেশ্বর। তাই ওখানে নিজেদের খেয়ালখুশিমতো কথা বলতে পারে অভিনেতা এবং অভিনেত্রীরা। কিন্তু তারা জানে না, এইখান থেকে একটা গোপন মাইকে সমস্ত কথাবার্তা বীরেশ্বরের আপিসঘরে চলে যায়। একটা রেডিওর মতো যন্ত্র আছে বীরেশ্বরের ঘরে। বোতাম টিপলেই স্টেজের ডায়ালগ শুনতে পান বীরেশ্বর। নাটক কতখানি এগলো, প্লেয়াররা ঠিক মতো ডায়ালগ বলছে কিনা তাও চেক করতে পারেন বীরেশ্বর।

কমেডিয়ান গোবিন্দ নন্দীর বদ অভ্যাস আছে বানিয়ে বানিয়ে ডায়ালগ ঢুকিয়ে দেওয়া। মাঝে মাঝে মন্দ বানায় না গোবিন্দ, কিন্তু মাত্রা ছাড়ালেই বীরেশ্বর নিজের ঘর থেকে শিল্পীদের নামে স্লিপ পাঠান।

রেডিওর মতো যন্ত্রটার আর একটা গোপন বোতাম আছে, যার খবর বিলিতী কোম্পানির মিস্ত্রি ছাড়া কেউ জানে না, এমন কি নরহরি পর্যন্ত না। সেই বোতাম টিপে বিশেষ এক অভিনেত্রীর বিশ্রামকক্ষে বীরেশ্বর আড়ি পাতেন।

অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের ডেকে বীরেশ্বর বললেন, "কাল তোমরা সকলে প্রাণ ঢেলে অভিনয় করবে। ডাক্তার পুলোমা চৌধুরী, অধ্যাপক সুদর্শন চাটুজ্যে, জাস্টিস কারফর্মা ইত্যাদি দেশের মান্যগণ্যরা এখানে পায়ের ধুলো দেবেন। অভিনয়কে তোমরা এমন হাইটে নিয়ে যাবে যাতে কোনো নোংরামিকে নোংরামি মনে না হয়।"

সকলেই মাথা নিচু করে সর্বাধিনায়ক বীরেশ্বরের নির্দেশ শুনলো। অধর চাটুজ্যে মন্তব্য করলো, "আমাদের অশেষ সৌভাগ্য, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে আরম্ভ করে স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎ, শিশির সবাই আমাদের এই থিয়েটারে পায়ের ধুলো দিয়েছেন?"

"বিবেকানন্দও থিয়েটার দেখতেন?" ব্যাপারটা বীরশ্বরের জানা ছিল না।

অধর বললো, "কী বলছেন স্যার! গিরিশের সঙ্গে স্বামীজীর যে খুব ফ্রেণ্ডশিপ ছিল। যেমনি প্রশংসা তেমনি কথা কাটাকাটি হতো দুজনের মধ্যে। গিরিশ একবার নরেনকে বললেন, 'থাম শালা, সন্ন্যাসী ভিখিরী'। বিবেকানন্দরও তো মুখের লাগাম ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, যা শালা ভাঁড়, তুই শালা থিয়েটারে মাগী নাচাবি, তোর শালা কি ব্রেন আছে?"

"অ্যাঁ!" বীরেশ্বর মুখ বেঁকিয়েছিলেন। অভিনেত্রীদের সামনে অধর কী করে এইসব নোংরা কথা মুখে আনছে তা ভেবে পান না বীরেশ্বর।

অধরের ওসব খেয়াল নেই। গিরিশ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে মাতোয়ারা হয়ে সে বললো, "আবার প্রশংসাতেও বিবেকানন্দ পঞ্চমুখ। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'গিরিশের বিল্বমঙ্গল সেক্সপীয়রের ওপর গিয়েছে।' বুঝুন ব্যাপারটা—স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন গিরিশ সেক্সপীয়রের ওপর গিয়েছেন।"

অধরকে নিয়ে বীরেশ্বর নিজের ঘরে চলে এসেছিলেন। "প্রবীণতম কর্মী হিসেবে তুমিই বলবে আমার কথা। সমস্ত পয়েন্টগুলো ভালভাবে নোট করে নিও। পুলোমা চৌধুরীর মঙ্গলাচরণের পরেই সভার কাজ আরম্ভ হবে। টিকিটঘরের মেয়েদের দিয়ে পুষ্পস্তবক ও মাল্য দেওয়াবে। তারপর তুমি আমার সম্বন্ধে বক্তৃতা করে অধ্যাপক সুদর্শন চাটুজ্যেকে দিয়ে আমার হাতে ফুলের তোড়া উপহার দেবে। মস্ত লোক এই চাটুজ্যেমশায়—রবি ঠাকুরের সঙ্গে খুব দহরম-মহরম ছিল।"

কিন্তু কোহিনূর থিয়েটারে পরের দিন যে এমন নাটকীয় কাণ্ড হবে কেউ কি জানতো? বেলা দেড়টায় শেয়ার বাজারেই বীরেশ্বর ফোন পেলেন, "সিরিয়াস ব্যাপার, এখনই চলে আসুন। চামেলিকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

একটু আগেই মার্কনি হোটেল থেকে নরহরিকে ফোন করেছিল। লাঞ্চের সময় ক্যাবারে নাচবার জন্যে চামেলির আসবার কথা। সাধারণত সাড়ে-বারটায় হোটেলে এসে সে তৈরি হয়। হন্তদন্ত হয়ে নরহরি সায়েবকে টেলিফোনে খবরটা দিয়েই ছুটেছিল মার্কনি হোটেলে। ম্যানেজার বললেন, "ফ্লোর শো শেষ করে রাত একটার সময় হোটেলের গাড়ি লোলাকে

বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে। আজ দুপুরে চামেলির দেখা না পেয়ে ম্যানেজার ভাবলেন, থিয়েটারের রিহার্সালে হয়তো আটকে পড়েছে। নর্থ ক্যালকাটায় রাস্তার যা অবস্থা—ট্রাফিক জ্যাম লেগেই আছে।"

হোটেল ও লোলার বাড়িতে খোঁজখবর সেরে নরহরি যখন কোহিনূর থিয়েটারে ফিরে এলো তখন বেচারা হাঁপাচ্ছে। চামেলির বাড়িতে ঝি বলেছে "ভোরবেলায় এক কালো সায়েবের সঙ্গে দিদি ট্যাক্সিতে বেরিয়ে গিয়েছেন। বলে গিয়েছেন, কবে ফিরবো কিছু ঠিক নেই।"

আরও সর্বনাশা খবর, হোটেলের বাজনদার পিটারকেও পাওয়া যাচ্ছে না। ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চান পিটারকে নরহরি চেনে। আবলুস কাঠের মতো রঙ। ক্যাবারে দৃশ্যের মিউজিক রেকর্ডিং-এর সময় পিটার বাজনা বাজিয়েছিল।

"সর্বনাশ হয়েছে স্যার—মনে হচ্ছে দুজনে এক সঙ্গে কোথাও পালিয়েছে," নরহরি বললো সায়েবকে।

"ব্যস্ত হচ্ছো কেন ?" অধর এবার নরহরিকে বকুনি লাগালো। "থিয়েটারের আর্টিস্টদের ট্রেনিং আলাদা। মদ গাঁজা ভাঙ খেয়ে যেখানেই পড়ে থাক, সময় হলেই চৈতন্যের এলার্ম ঘণ্টা বেজে উঠবে—বেলা যে পড়ে এলো জলকে চল। ঠিক সময়ে হাজির হবে। গিরিশবাবু তো প্রায়ই ওই রকম করতেন।

"থিয়েটারের আর্টিস্ট নয় এই চামেলি—স্রেফ ক্যাবারে মেয়ে," অধরকে মনে করিয়ে দিলেন বীরেশ্বর।

আরও সর্বনাশ, এই নাটকে প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীর ডবল আছে। ডবল মাইনে দিয়ে তাদের পোষা হয়। যথা সময়ে এসে তারা খাতা সই করে, অভিনেতা নির্দিষ্ট সময়ে না এলে মেক-আপ পর্যন্ত চড়ায়। তারপর অভিনেতা হাজির হলে উধাও হয়ে যায়। অভিনেতার পাট তাদের মুখস্থ—কোনো কারণে

তিনি না এলেও শো চলবে, কেউ কিছু বুঝবে না। কিন্তু চামেলির কোনো ছু নম্বর নেওয়া হয় নি। স্রেফ হাজরে খাতায় সই করবার জন্যে কোন্ ক্যাবারে আর্টিস্ট রোজ এই হাতিবাগানে আসবে? খরচ বাঁচাবার জন্যে বীরেশ্বর নিজেও জেনে-শুনে ঝুঁকি নিয়েছিলেন।

বিপদে ভেঙে পড়বার মানুষ বীরেশ্বর নন। কিছু একটা ব্যবস্থা করবার জন্যে নরহরি এবং অধরকে ট্যাক্সিতে পাঠিয়ে দিলেন। মিঠাইবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বললেন, যত টাকা লাগে লাগুক, চামেলিকে যদি উদ্ধার করা যায়।

নরহরি কখন ফিরবে কে জানে। ইতিমধ্যে রাগে ফুঁসছেন বীরেশ্বর। এই জন্যেই প্রতাপ জহুরীমশাই থিয়েটারের মেয়েদের সঙ্গে কাউকে মিশতে দিতেন না। পিটার ছোকরাকে সামনে পেলে তার ছু পাটি দাঁত মড়মড় করে তুলে ফেলবার হুকুম দিতেন বীরেশ্বর। কলকাতা শহরে মেয়েমানুষের অভাব নেই, যার সঙ্গে খুশি তুমি যত ইচ্ছে প্রেম করো—কিন্তু কোহিনূর থিয়েটারের মেয়ের দিকে নজর দিও না।

জাস্টিস কারফর্মার সেক্রেটারি ফোন করলেন, মাননীয় বিচারপতি ঠিক সময় কোহিনূরে হাজির হবেন। সেই ছোটবেলা থেকে কোহিনূরে থিয়েটার দেখছেন তিনি। পুলোমা চৌধুরীও নিজের কাজকর্ম ফেলে সোজা ইউনিভার্সিটি থেকে চলে আসবেন, মিটিং পেলে তিনি আর কিছু চান না। বুকিং আপিসে লেডি বুকিং ক্লার্ক মিনতি দত্ত দর্শকের দাবি মেটাতে হিমসিম খাচ্ছে। কাগজে মস্ত বিজ্ঞাপন বেরিয়ে টিকিট বিক্রির চাপ বেশ বেড়েছে।

মিনতি বলছে, "আর সীট নেই। একস্ট্রা ফোল্ডিং চেয়ার হতে পারে। প্যাসেজের ওপর বসতে হবে, মাথার ওপর ফ্যান থাকবে না, সীট নম্বর থাকবে না।" তাতেই পাবলিক রাজী - ওই যে বিজ্ঞাপনে লেখা আছে, হার্টফেলের জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

কিন্তু ক্যাবারে নর্তকীর এখনও খবর নেই—এই অবস্থায় বীরেশ্বর কি করবেন? নিজের ঘরে ঢুকে তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও গিরিশের ছবিতে মাথা ঠেকালেন। তারপর দরজা ভেজিয়ে তৃতীয় দৈনন্দিন কর্মটি সারতে যাচ্ছেন এমন সময় আচমকা ঘরে ঢুকলো মধুমালতী।

মধুমালতী অবাক হয়ে দেখলো, রাজনটী রাগমালা-বেশিনী মধুমালতীর ছবিতে বীরেশ্বর একটি মধুর চুম্বন এঁকে দিচ্ছেন। থিয়েটারে এসেই বীরেশ্বর কিছু একটা গোপন কাজ করেন মধুমালতী শুনেছিল, আজ চোখের সামনে তা দেখে সে অভিভূত হলো।

ধরা পড়ে গিয়ে একটুও বিব্রত হলেন না বীরেশ্বর। হেসে বললেন, "এইভাবে কাজ শুরু করে আমি কখনও ব্যর্থ হই নি, মধু।"

মধুমালতী ইচ্ছে করেই একটু আগে এসেছে। ঠাকুর ও গিরিশের ছবিতে সাজাবার জন্যে নিজের হাতে নতুন-বাজার থেকে সে সুগন্ধ ফুলের মালা কিনে এনেছে। নব পর্যায়ে কোহিনূর থিয়েটার প্রতিষ্ঠার এই দিনে মালতী তার সমস্ত দেহে শিহরণ অনুভব করে। এই প্রাচীন বাড়িটার উত্থান-পতনের বিচিত্র ইতিহাসের সঙ্গে তার জীবনের সুখ-দুঃখ মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। অলিখিত এক মহানাটকের নায়িকা মনে হয় নিজেকে।

আজ গর্বের শেষ নেই মধুমালতীর। বীরেশ্বরকে নিজের চোখে থিয়েটারে দিনারম্ভ করতে দেখেছে মধুমালতী। ধন্য তুমি রাজনটী রাগমালা।

বীরেশ্বরের বিপদের কথা শুনলো মধুমালতী। অতিথিরা একটু পরেই আসতে শুরু করবেন, অথচ ক্যাবারে নর্তকীর দেখা নেই। প্রতিষ্ঠাদিবসের উৎসবেই যদি থিয়েটার বন্ধ রাখতে হয় তার

থেকে অশুভ কাজ আর কী হতে পারে? ক্যাবারে বাদ দিয়েও এই নাটক খাড়া করা যায়। কিন্তু তার ফল আরও খারাপ। পাড়ার ছোঁড়ারা ভাববে বিশিষ্ট অতিথিদের ভয়ে বীরেশ্বর ইচ্ছে করেই একদিনের জন্যে ক্যাবারে ফাঁকি দিয়েছেন। এখন কী কর্তব্য? বীরেশ্বর মনস্থির করতে পারছেন না।

বুকিং ঘরেও খবরটা আভাসে ইঙ্গিতে পৌঁছে গিয়েছে। মিনতি দত্ত চিন্তিত মুখে হারু ভাদুড়িকে জিজ্ঞেস করলো, "যদি মেয়েটাকে না পাওয়া যায় তা হলে কী হবে?"

হারু ভাদুড়ি বললেন, "থিয়েটার মানেই তো আগুন নিয়ে খেলা। যা হবার তাই হবে।"

অধর চাটুজ্যে শুকনো মুখে একা-একা ফিরে এলো। নরহরি তখনও ফেরে নি—চামেলির সন্ধানে সে বেলঘরিয়ার বাগান-বাড়িতে গিয়েছে।

মধুমালতী বললো, "এরকম বিপদে কেউ কখনও পড়েছে বলে জানি না।"

অধর বললো, "থিয়েটার লাইনে এসব কোনো কিছুই নতুন নয়। মায়ের কাছে শুনেছিলাম, ন্যাশনাল থিয়েটারে কপালকুণ্ডলা নাটকের ফার্স্ট নাইটে এর থেকেও বিপদ হয়েছিল। অভিনয়ের কিছুক্ষণ আগেই দেখা গেলো নাটকের খাতাখানা পাওয়া যাচ্ছে না। বোঝো অবস্থাটা। ফার্স্ট নাইট—কারুর তেমন পার্ট মুখস্থ নেই। গিরিশবাবু তো রেগে খাপ্পা। শো বন্ধ রাখতে হয় এমন অবস্থা—এদিকে হলে লোক বোঝাই, ছাপানো প্রোগ্রামে কোন্ অঙ্কে কী হবে তা দর্শকরা দেখছে। শেষে ধর্মদাসবাবু গিরিশকে হাত ধরে অনুরোধ করলেন, যা হয় একটা উপায় করুন। গিরিশ বললেন, 'কোনো ভয় নেই। তাড়াতাড়ি একখানা কপালকুণ্ডলা উপন্যাস কারও বাড়ি থেকে যোগাড় করে নিয়ে এসো।' বই এলো। সেটা

এবং একখানা ছাপানো প্রোগ্রাম হাতে গিরিশ উইং-এ চলে গেলেন। বললেন, 'তোমরা নেমে পড়। আমি নাটক বানিয়ে বানিয়ে প্রমট করে যাবো।' আশ্চর্য ব্যাপার, সেদিনের অভিনয় দেখে কেউ বুঝতে পারলো না, খাতা হারিয়ে গিয়েছে।"

নরহরিও এবার শুকনো মুখে ফিরে এলো। মাখনবাবু, মণ্ডাবাবু কেউ কোনো সাহায্য করতে পারেন নি। বলেছেন, "এ যে ওঠ ছুঁড়ি তোর বে হয়ে যাচ্ছে।"

তারপর মধুমালতী সাজঘরে চলে গিয়েছিল এবং অধরকে ডেকে পাঠিয়েছিল। বলেছিল, "শেষ চেষ্টা করে দেখবেন একবার? লিপিকার কাছে যাবেন? গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেলে কিছুদিন নেচেছিল। বোধহয় এখনও নাচে। মাস চারেক আগে আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কিছুদিন আগে আমার দেওয়া পাশে থিয়েটার দেখতে এসেছিল।"

শো আরম্ভ হবার মাত্র পঁচিশ মিনিট আগে মধুমালতীর চিঠি পেয়ে লিপিকা হন্তদন্ত হয়ে হাজির হয়েছিল কোহিনূর থিয়েটারে। তখন আর মহলার সময় নেই। ছাপানো প্রোগ্রামখানা দেখিয়ে দিয়েছিল মধুমালতী এবং লিপিকাকে অনুরোধ করেছিল বিপদ থেকে উদ্ধার করতে। কোনো কিছু না জেনেই লিপিকা এসেছিল মধুমালতীর সঙ্গে দেখা করতে। নাচের পোশাক আনবার জন্য নরহরির ট্যাক্সি আবার ছুটেছিল লিপিকার বাড়িতে। বেশী দূর বাড়ি নয় লিপিকার।

মনে মনে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বীরেশ্বর। মধুমালতী স্লিপ পাঠিয়ে তাঁকে চিন্তা করতে বারণ করেছে এবং জানিয়েছে বিনা রিহার্সালেই নাচবে লিপিকা। মাথা টিপে বসে আছেন বীরেশ্বর, কিছুই ভাবতে পারছেন না। পর্দা উঠুক, শো আরম্ভ হোক।

পর্দা উঠলো। যথারীতি মঙ্গলাচরণ করলেন পুলোমা

চৌধুরী। অধ্যাপক চাটুজ্যে ও জাস্টিস কারফর্মা সময়োচিত বক্তৃতা দিলেন। অধ্যাপক চাটুজ্যে জানালেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কত ভালবাসতেন—এক সপ্তাহ খবর না পেলে চোখে অন্ধকার দেখতেন। আর জাস্টিস কারফর্মা চাইলেন মহাত্মা গান্ধীর বাণী থিয়েটারে প্রবাহিত হোক। অধর চাটুজ্যে সুললিত বাংলায় নাট্যকার ও নির্দেশক বীরেশ্বর রক্ষিতের নাট্যপ্রতিভা, শিল্পবোধ ও দূরদৃষ্টির প্রশংসা করলেন। প্রাক্তন এই বিপ্লবীটি যে প্রচার-বিমুখ তাও বীরেশ্বরের নির্দেশ মতো উপস্থিত দর্শকদের জানাতে ভুললো না অধর চাটুজ্যে। উত্তর দিতে উঠে বীরেশ্বর রক্ষিত বাংলার নাট্যজগতে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব অর্পণ করলেন। বয়ঃসন্ধি থেকে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চকে বয়ঃপ্রাপ্তির উর্বর মুহূর্তে নিয়ে যাবার আহ্বান জানালেন বীরেশ্বর। তারপর হলের আলো নিভলো, মঞ্চে অভিনয় শুরু হলো।

জাস্টিস কারফর্মা ফিসফিস করে বীরেশ্বরকে বললেন, "অপূর্ব অভিনয় এই মধুমালতীর। বিনোদিনী তারাসুন্দরী তিনকড়ি এর থেকে আর কী ভাল অভিনয় করতে পারতেন?"

বিশিষ্ট অতিথির পাশে বসে বিনয়াবনত বীরেশ্বর হাসলেন। তাঁর উদ্বেগ পরের দৃশ্যের জন্যে, যেখানে ক্যাবারে নৃত্যের ব্যবস্থা।

সেই দৃশ্য আসতেই বীরেশ্বর উঠে যাবেন ভাবছিলেন। কিন্তু হোটেলের দৃশ্যে নতুন এই নারীকে দেখে প্রচণ্ড হাততালি পড়লো। মিস্ চামেলি এই নবীনা নর্তকীর কাছে কোথায় লাগে! এবার বিভিন্ন রঙের আলো তীব্র বেগে ছুটে এসে নবনর্তকীর মসৃণ যুবতীদেহে ধাক্কা খেয়ে চারদিক পিছলে পড়লো। বয়োবৃদ্ধ অধ্যাপক চাটুজ্যে বলে উঠলেন, "অপূর্ব, অদ্ভুত; এই আর্টিস্টকে কোথা থেকে আবিষ্কার করলেন?"

"আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদ," কোনোক্রমে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন বীরেশ্বর রক্ষিত।

নিষ্ঠাবতী নর্তকী নৃত্যের তালে তালে আজ নটরাজের চরণ বন্দনা শুরু করেছে, বীরেশ্বরের মনে হলো। শাড়ি ছেড়ে নাচের পোশাক পরবার পরে বীরেশ্বর এই মেয়েকে দেখেন নি, বিশিষ্ট অতিথিদের সামলাতে তিনি সাজঘরের বাইরে চলে এসেছেন।

শ্রীমতী পুলোমা চৌধুরী নগ্রোধপরিমণ্ডলা এই মেয়েটির পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন।

কী পরিচয় দেবেন বীরেশ্বর ? তিনি নিজেই তো কিছু জানেন না। এখানেও ভাগ্য বীরেশ্বরকে সহায়তা করলো।

পুলোমা বললেন, "বুঝেছি, থিয়েটারের ভিতরের খবর হাত-ছাড়া করতে চান না। আপনাদের অনেক রকম গোপন ব্যাপার থাকে, না হলে পাবলিক থিয়েটার চালানো যায় না।"

বীরেশ্বর শুধু হেঁ-হেঁ করেছিলেন। নৃত্যমুগ্ধ জাস্টিস কারকর্মা বললেন, "মিস্টার রক্ষিত, এই নর্তকীর চরিত্রে আপনি লালসা ছাড়াও আরও কিছু দিতে চেয়েছেন মনে হচ্ছে।"

"গান্ধীজী বলেছেন, *God's grace never descends upon a man who is a slave to lust*," বীরেশ্বর চান্স নিলেন। কোটেশানটা তিনি খোকনের কলেজের খাতায় দেখেছিলেন।

বিশিষ্ট অতিথিদের বিদায় দিয়ে বীরেশ্বর ছুটে আসছিলেন গ্রীনরুমের দিকে। নেদো মল্লিক বুকিং অফিসের কাছে তাঁকে পাকড়াও করলেন। বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "একেবারে কামাল করে দিলে, ব্রাদার। নতুন এই মেয়েকে কোত্থেকে নিয়ে এলে ?"

"গেস্ট আর্টিস্ট," এই বলে নিজেকে আলিঙ্গন মুক্ত করে বীরেশ্বর ছুটলেন গ্রীনরুমের দিকে। কিন্তু ততক্ষণে লিপিকা বিদায় নিয়েছে।

অধর বললো, "আমি অনেক রিকোয়েস্ট করেছিলাম, কিন্তু লিপিকা দেবী শুনলেন না। বললেন, তাড়াতাড়ি আছে।"

"পেমেন্ট ?" বীরেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন।

"সে মালতীদি যা ব্যবস্থা করে দেবেন, তাই নেবেন। ভাউচার পাঠিয়ে দিলে সই করে দেবেন বলেছেন।" নরহরি ফোড়ন দিল।

বীরেশ্বর একটু অবাক হলেন। এই প্রথম কোনো আর্টিস্ট প্রথম দিনের কাজের পরে সায়েবের সঙ্গে দেখা না করেই কোহিনূর থিয়েটার থেকে চলে গিয়েছে। বাইরের অতিথিদের তদারক করতে গিয়ে বীরেশ্বর মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে পর্যন্ত পারেন নি। শুধু তাকে দর্শকের আসন থেকে রঙ্গমঞ্চের আলো-আঁধারিতে দেখেছেন।

গভীর ঘুমে অচেতন মধুমালতীর দেহ নড়ে উঠলো—হাতের চুড়িগুলো নৃত্যছন্দে বেজে উঠলো। বেঁটে মোটা পাশ-বালিশটা জড়িয়ে বিনিদ্র বীরেশ্বরও এবার পাশ ফিরলেন। এক এক সময় বীরেশ্বরের মনে হচ্ছে, নাট্যলোকের রঙ্গিণীদের গ্রীনরুমে না দেখে মঞ্চে দেখাই ভাল—এরা দু'জন এক নয়। এই তো তাঁর পাশে যে শুয়ে আছে এবং কোহিনূর মঞ্চে কয়েক বছর আগে যে রাজনটী রাগমালাকে বীরেশ্বর দেখেছিলেন তারা কি এক ?

বীরেশ্বর সেদিন সমস্ত অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের স্পেশাল খাবারের প্যাকেট দেবার হুকুম করেছিলেন। গ্রীনরুমের বেয়ারা সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছিল মিষ্টির দোকানে প্যাকেট আনতে।

রাত তখন এগারোটা। বীরেশ্বর বসে বসে অফিসে কাজ করছেন।

নরহরি খবর দিলো, "একটা প্যাকেট বেশী হয়ে গিয়েছে, স্যর। লিপিকা দেবীর খাবারটা।"

বীরেশ্বরের একবার লোভ হলো প্যাকেটটা এই রাত্রেই পৌঁছে দিয়ে আসেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বললেন, "তোমরা খেয়ে নাও।"

ঘুমটা পাতলা হয়ে গিয়েছিল মধুমালতীর। কাঁচের শর্সি ভেদ করে ভোরের আলো গুপ্তগৃহের মধ্যে এসে পড়েছে। মধুমালতীর নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ দেহ এবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো। ধড়মড় করে উঠে বসলো সে। একটু আগেই যেন "লিপিকা" কথাটা তার কানে এসেছে।

বীরেশ্বর কি ঘুমের ঘোরে লিপিকার নাম করলেন? না, মধুমালতী নিজেই লিপিকাকে স্বপ্নে দেখতে পেলো?

লিপিকার সমস্ত দেহখানা মধুমালতী এই মুহূর্তে মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছে। মধুমালতী দীর্ঘাঙ্গিনী—সে তুলনায় লিপিকা দৈর্ঘ্যে ছোট। কালো চুলের গুচ্ছ মধুমালতীর মতো লিপিকার প্রশস্ত কপালেও দৌরাত্ম্য করে। লিপিকার রঙ কিন্তু মধুমালতীর মতো হলুদ নয়। লিপিকা বরং শ্যামবরণী। লিপিকার চোখ দুটো অবশ্য টানা-টানা। ওর ভ্রূতে অত গভীর কালো চুল কেমন করে হলো? ঠিক যেন বর্ষার নবদূর্বাদল। ভ্রূ দুটি নাকের উপর এসে জুড়ে গিয়েছে। বক্ষসৌন্দর্যে লিপিকা সৌভাগ্যবতী, কিন্তু ঐ ব্যাপারে মধুমালতী কম ঐশ্বর্যশালিনী নয়।

সেই প্রথম দিনের কথা মনে পড়ছে মধুমালতীর। সে ব্যক্তিগত চিঠি না পাঠালে লিপিকা আজ কোথায় থাকতো? কিন্তু সেরাত্রে অভিনয়ের শেষে বীরেশ্বর গ্রীনরুমে ফিরে এসে প্রথম লিপিকার কথাই তুললেন। বিশিষ্ট অতিথিরা নাকি তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু মধুমালতী আশা করেছিল, বীরেশ্বর একবার তার বিশ্রামঘরে আসবেন, একান্তে বলবেন আজ তোমার জন্তেই এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া গেলো।

বীরেশ্বর যখন সকলের জন্যে স্পেশাল খাবারের প্যাকেট পাঠালেন, তখন একবার মধুমালতীর ইচ্ছে হয়েছিল, জিজ্ঞেস করেন এটা কি লিপিকার সম্মানে ?

কিন্তু তারপর তো অনেক সময় কেটে গিয়েছে। এখন ওসব পুরনো কথা ভেবে কী লাভ ?

প্রবল প্রতাপান্বিত বীরেশ্বর এখনই ঘুম থেকে উঠবেন। তার আগে স্নান সেরে ফেলতে চায় মধুমালতী।

এই ভোরবেলাটা খুব খারাপ লাগে মধুমালতীর। ঘুম থেকে উঠে নিজের বিছানায় বারেশ্বরের রোমশ দেহ দেখলেই মধুমালতীর মন গ্লানি ও ক্লান্তিতে ভরে ওঠে। মনে পড়ে যায়, লোকটার ঘর আছে, স্ত্রী আছে, সন্তান আছে এবং তারা এই মুহূর্তে নিশ্চয় মধুমালতীর ঘাড়ে সমস্ত দোষের বোঝা চাপিয়ে তাকে শাপ দিচ্ছে।

নিজের সম্বন্ধেও মধুমালতীর মনে ধিক্কার আসে। পৃথিবীতে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মেয়ের মতো তার তো এমন একজন থাকতে পারতো যে-তাকে সর্বস্ব দিয়েছে, যার অন্য কোথাও ভালবাসার দেনা-পাওনা নেই। অর্থ, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য এসবে একটুও লোভ নেই মধুমালতীর। খ্যাতিও পেয়েছে সে যথেষ্ট। শুধু সে ভিখারিণী হয়ে আছে হৃদয়ে। কিন্তু বড় দেরি করে ফেলেছে মধুমালতী—এখন এসব ভাবার সময় নয়।

মধুমালতী অযথা সময় নষ্ট না করে বুকের আঁচলটা সামলে বাথরুমে ঢুকলো এবং দাঁত মাজা শেষ করেই শাওয়ারের তলায় এসে দাঁড়ালো।

এই শাওয়ারের তলায় দাঁড়ালেই বর্ষার কথা মনে পড়ে যায় মধুমালতীর। শ্রাবণের আকাশে তিল ঠাঁই নেই, বিশ্বভুবন ডুবিয়ে দেবার জন্যে এবার যেন বর্ষা নামলো। শাওয়ারের তীক্ষ্ণ বৃষ্টিধারায় মধুমালতী চোখ বন্ধ করে। তৃতীয় কোনো নয়নে সে

এবার গগনের গায় শ্রাবণের বিজলীরেখার চমক দেখতে পায়। মধুমালতীর কণ্ঠে তখন তার প্রিয় সেই গানটা আপনা থেকেই গুনগুন করে ওঠে—'শ্রাবণের গগনের গায় বিদ্যুৎ চমকিয়া যায়। ক্ষণে ক্ষণে শর্বরী শিহরিয়া উঠে হায়।' কি শীত, কি বসন্ত, কি গ্রীষ্মে এই গানটাই ঘুরে ফিরে মধুমালতীর কণ্ঠে ফিরে আসে, তাকে বিষণ্ণ করে তোলে। আজও সেই গান দিয়ে মধুমালতী নিজেকে ভোলাতে চায়। কিন্তু শয়নমন্দির জবরদখল করে যে-লোকটা এখনও ঘুমিয়ে রয়েছে তাকে ভোলা কি সহজ? এবং সেই সঙ্গে লিপিকার কথা ছুঁচের মতো মধুমালতীর দেহে বিঁধছে।

নাটকের নায়িকার মতোই কোহিনূরের রঙ্গমঞ্চে লিপিকা সেদিন আবির্ভূত হয়েছিল। নাচ সেরে দ্রুত বিদায় নিয়ে সে নাট্যমুহূর্তকে আরও নাটকীয় করে তুলেছিল। কারণ সকলের মুখেই তখন প্রশংসার বন্যা। বিনা রিহার্সালে একজন এইভাবে মঞ্চে এসে মনোহরণ করে গেলো, অথচ দর্শকদের কেউ ধরতে পারলো না।

বীরেশ্বর পরের দিন অধরের মাধ্যমে ক্যাশ টাকা ও ভাউচার পাঠিয়েছিলেন। যা লিপিকার প্রাপ্য, তার থেকে একশ টাকা বেশী পাঠিয়েছিলেন বীরেশ্বর। এবং সেই সঙ্গে অনুরোধ করেছিলেন একবার সাক্ষাতের। মিস্ সি ইতিমধ্যে ফিরে এলেও বীরেশ্বর তাকে আর রাখবেন না। রঙ্গমঞ্চে অনভিজ্ঞ লিপিকা শেষ পর্যন্ত যোগ দিয়েছিল নর্তকীর ভূমিকায়।

'কামনা-বাসনা' নাটকে এর পর ভিড় আরও বেড়েছে সন্দেহ নেই। বক্স-অফিসের দেবতা বীরেশ্বরের ওপর সদয় হয়েই যেন মিস্ সিকে কোহিনূর মঞ্চ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। বীরেশ্বর সুযোগ বুঝে লিপিকার বিজ্ঞাপন একটু বাড়ালেন। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে তখনও মধুমালতীর একটুও চিন্তা দেখা দেয় নি।

বরং মধুমালতী নিজেই লিপিকাকে বলেছে, "নাচের শেষে আমার সঙ্গে ডায়ালগ একটু বাড়িয়ে নাও।"

লিপিকা তখন নাচতে রাজী থাকলেও মঞ্চে কথাবার্তায় ভয় পেতো। সংলাপে সে একেবারে যেতে চাইতো না। মধুমালতী নিজেই তখন একদিন বকুনি দিয়েছিল, "হাজার লোকের সামনে সাড়ে-পনেরো আনা জামা খুলে ফেলে বুক দেখাতে আপত্তি নেই, যত লজ্জা মুখ খুলতে!"

লিপিকা তখন একটু-একটু সংলাপ শুরু করেছে। মূল নাটকের বাইরের এই সব ডায়ালগ অধর নিজেই লিখে দিয়েছে। বীরেশ্বর প্রথমে এই ডায়ালগ শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন---মধুমালতী এবং অধর দু-জনকেই স্লিপ পাঠিয়েছিলেন। অধরকে রক্ষা করবার জন্যে মধুমালতী বলেছিল, "অধরবাবুর কোনো দোষ নেই। লিপিকাকে একটু সড়গড় করবার জন্যেই আমি ওঁকে স্পেশাল সংলাপ তৈরি করতে বলেছিলাম।" শাওয়ারের তলায় মাথা পেতে দিয়ে মধুমালতীর মনে পড়লো বীরেশ্বর বলেছিলেন, "তোমাদের খেয়ালখুশি মতো যখন-তখন নাটক পাল্টাবে?"

অধরদা তখন ভাল কথা বলেছিলেন। "সিনেমার সঙ্গে থিয়েটারের ওই তো তফাত। থিয়েটার মানেই প্রতিদিন একটু আলাদা। অভিনেতাদের মুড ভাল না মন্দ, হাউস ফুল না ফাঁকা, দর্শকদের মেজাজ ঠাণ্ডা না গরম, দেশের অবস্থা ঝকঝকে না মেঘলা, শীত না গ্রীষ্ম, দিন না রাত, সেই অনুযায়ী অভিনয়ের রঙ বদলে যায়। আর নাটকের খাতাও সকলের অজান্তে চেঞ্জ হয়। প্রথম নাইটে যে-ডায়ালগ থাকে তা পাল্টাতে পাল্টাতে ফাইন্যাল হয় একেবারে শেষ-রজনীতে। থিয়েটারে ফাইন্যাল ডায়ালগ বলে কিছুই নেই—সবসময় সেমি-ফাইন্যাল।"

প্লাসটিক ক্যাপের শাসন না মেনে বেরিয়ে আসা কয়েকটা চুল মুখের ওপর দৌরাত্ম্য করছিল। ভিজে চুলগুলো সরিয়ে

ফেললো মধুমালতী। অধরের এই কথায় সুযোগ নিয়েই বীরেশ্বর দুশো নাইটের পরে লিপিকার দ্বিতীয় নাচ জুড়ে দিলেন। অধরের একটুও মত ছিল না। শুকনো মুখে সে এসে মধুমালতীকে বলেছিল, "আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। একই নাটকে দুবার ক্যাবারে নাচ ? কর্তা বললেন, কেন নায়ক-নায়িকারা একই রেস্তোরাঁয় দুবার যেতে পারেন না ? কোথায় লেখা আছে তাঁরা দুটো নাচ দেখতে পারেন না ?"

পরের সপ্তাহে বীরেশ্বর একদিন অধরকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বুকিং অফিসের সামনে লম্বা লাইন দেখিয়ে বলেছিলেন, "নাচ ডবল করলুম কেন এবার বুঝতে পারছো ?"

কারণটা অধর তখনও বুঝতে রাজী হয় নি। নাটকীয়তা ও অভিনয় ছাড়া অন্য কিছুর আকর্ষণে বাঙালীরা থিয়েটার দেখতে আসে একথা অধর বিশ্বাস করে না।

সাজঘরে মধুমালতী একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, "এতো কী ভাবছো, অধরদা ?"

অধরদা সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু মধুমালতীর মনে তখনও অগাধ আত্মবিশ্বাস। কোহিনূর থিয়েটার ও মধুমালতীকে তখনও সে ভিন্ন করে ভাবতে শুরু করে নি। তখনও রসিকজনের ঘন ঘন হাততালি অভিনেত্রী মধুমালতীকে যশের তুঙ্গশিখরে তুলে রেখেছে।

অধর বলেছিল, "আর্টের একটা বড় কথা হলো পরিমিতি-বোধ। মসলা দিলে রান্নার স্বাদ বাড়ে, কিন্তু তাই বলে শুধু মসলা-বাটা মানুষকে পরিবেশন করা যায় না।"

অধরের সাবধানবাণীতে মধুমালতী তখনও কান দেয়নি। ক্যাবারে নাচ সম্বন্ধে তার একটুও দুশ্চিন্তা নেই।

মাসের পর মাস ধরে চলেছিল কামনা-বাসনা নাটক। প্রতি শোতে কোথা থেকে এতো মানুষ হাজির হয় তা মধুমালতী ভেবে

পায় না। মাঝে মাঝে বিনোদমাসীর কথা মনে পড়ে যায়—লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে অভিনয়-প্রতিভা খুলে ধরবার এই আশ্চর্য সুযোগ সেকালের অভিনেত্রীরা পান নি।

কামনা-বাসনার অভূতপূর্ব সাফল্যে সমৃদ্ধ বীরেশ্বর একদিন আবার অধরের সঙ্গে গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। আবার নাটক লিখতে হবে—কিন্তু তার আগেই নতুন নাটকে অভিনয়ের জন্য লিপিকার সঙ্গে গোপন কনট্রাক্ট হয়ে গিয়েছে। বীরেশ্বর সোজাসুজি অধরকে বলে দিয়েছিলেন, লিপিকাকে ভেবেই নাটক তৈরি করতে হবে। অধর মৃদু প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল। তখন বকুনি লাগিয়েছিলেন বীরেশ্বর, "গিরিশ ঘোষের থেকে বড় লেখক তুমি তো হও নি? তিনি তো তাঁর দলের প্লেয়ারদের অভিনয় ক্ষমতা এবং দুর্বলতা বুঝেই নাটক লিখতেন। লিপিকাকে আমি বড় রোল দিতে চাই।"

"মধুমালতী?" অধরের মুখের দিকে তাকিয়েই বীরেশ্বর বুঝতে পেরেছিলেন, মধুমালতীর রোল সম্বন্ধে অধর জানতে চাইছে। বীরেশ্বর হুকুম করেছিলেন, "তাকেও বড় রোল দেবে। একই নাটকে দুটো প্রধান নারী চরিত্র থাকতে পারে না? একজনকে তুমি করো দেহপ্রধান যার ভাবনা-চিন্তা, কাজকর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে দেহের দাহ, যৌবনের জ্বালা, আর মালতীর চরিত্রকে করো ঠিক উল্টো। নরম নরম মেয়ে, যৌবনের অপরাহ্নে হৃদয় নিয়ে সে ব্যস্ত।"

"শেষ পর্যন্ত কার জয় দেখাবো?" মালিকের মর্জি কী তা জানতে চেয়েছিল অধর চাটুজ্যে।

বীরেশ্বর বলেছিলেন, "একচুয়াল লাইফে দেহেরই জয় হয়। স্ত্রীলোকের দেহ সুন্দর হলে সে কখনও হারে না। কিন্তু থিয়েটারের জগতে তুমি হৃদয়েরই জয় দেখাও। গৃহস্থ ঘরের অনেক মেয়ে-মানুষ নাটক দেখতে আসে। ওরা বড় সেন্টিমেন্টাল। তিন

ঘণ্টার মধ্যে ছু' ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিট ধরে কামনা-বাসনা এবং দেহ নিয়ে যত খুশি ধানাই-পানাই করো আপত্তি নেই, কিন্তু শেষ দশ মিনিটে সমাজের যা-কিছু ভাল তার জয় দেখাতে হবে। না হলে মালক্ষ্মীরা চটে উঠবেন, স্বামীদের থিয়েটারে আসতে দেবেন না!"

অন্য কারুর মুখে বীরেশ্বরের বক্তব্যের এই রিপোর্ট শুনলে মধুমালতী বিশ্বাস করতো না। কিন্তু অধরদা মিথ্যে কথা বলেন না।

নতুন সেই নাটকের নাম 'কালের-কালিমা'। কয়েক মাসের মধ্যে বিজ্ঞাপনের চাপে নাটক বেশ জমে উঠেছে। ধাপে ধাপে এবার লিপিকা এগিয়ে গিয়েছে। নাটকের এমনই গতি যে লিপিকা স্টেজে এসে দাঁড়ালেই ক্ল্যাপ পায়। লিপিকার যৌবনোচ্ছলতায় দর্শকরা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। নাটকে মধুমালতীর চরিত্র অন্য রকম—সুঠাম নিতম্ব ও ছন্দায়িত জঙ্ঘা দেখিয়ে লিপিকার মতো দর্শকদের হৃদয় জয় করবার সুযোগ নেই। তবু এই নাটকের প্রধান স্ত্রী চরিত্র মধুমালতী—মনপ্রাণ ঢেলে অভিনয় করে যাচ্ছে মধুমালতী। রসিকজনের অভিনন্দন প্রায়ই মিলছে। মাঝে মাঝে শুধু মনে সন্দেহ জাগে। মধুমালতী নিজেকেই প্রশ্ন করে এই নাটকের হিরোইন কে? মধুমালতী? না লিপিকা?

শত শত রজনী আবার হাউস ফুল বোর্ড ঝুলেছে। দুয়েক এক দিন আগে হঠাৎ চাপা গুঞ্জন উঠেছে, আবার নাটক বদল হতে পারে। অধরকে জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই। অনেকগুলো নাবালকের দায়িত্ব রয়েছে তার ওপর, ভেতরের খবর জানা থাকলেও সে মুখ খুলতে সাহস পাবে না। তাছাড়া এমনও হতে পারে, এবার অধরকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে নাটক লেখাচ্ছেন বীরেশ্বর।

নতুন নাটক নামাবার ব্যাপারে বীরেশ্বরের মনোভাব আন্দাজ করা অসাধ্য ব্যাপার। বক্স অফিসে প্রচণ্ড ভিড় আছে. রোজ হাউস ফুল হচ্ছে বলেই যে আচমকা কোনো নতুন নাটক নামবে

না, এমন কথা কেউ বলতে পারে না। সূর্য যখন ডুবু ডুবু তখন নতুন কিছু ভাবার চেয়ে, সময় থাকতে নতুন কিছু নামানো ভাল, তাতে দর্শকদের মনে ধাক্কা দেওয়া যায়। এসব কথা মধুমালতী নিজের কানে বীরেশ্বরের কাছে শুনেছেন। কেষ্ট দাস কুণ্ডু স্ট্রীটে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বীরেশ্বর আগে মধুমালতীর মন জয় করবার জন্যে এসব বিষয়ে কত কথা বলতেন। ইদানীং বীরেশ্বর এসব আলোচনা কমিয়ে দিয়েছেন। এখন মাঝে মাঝে বীরেশ্বর যেসব কথা বলেন, মধুমালতীর অনেক সময় তা বিশ্বাস হয় না।

নতুন নাটকের গুজবটা কতখানি সত্য তা জানবার জন্যেই মধুমালতী গতকাল থিয়েটারে গিয়েছিল। ইচ্ছে ছিল বীরেশ্বরের ঘরে বসেই দুটো খবর নেবে সে। পরবর্তী নাটকের নায়িকা কে? আর বীরেশ্বর এখনও থিয়েটারের কাজ শুরু করবার আগে পরমহংস ও গিরিশের সঙ্গে মধুমালতীকেও স্মরণ করেন কিনা।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব মধুমালতী অফিসের বেয়ারার কাছে পেয়ে গিয়েছে। সায়েব আজও অফিসে এসে দরজা বন্ধ করতে বলেছিলেন। ড্রয়ার থেকে একটা ছবি বের করে ওই সময় সায়েব কী করেন, অর্জুন ফিসফিস করে মধুমালতীকে বলেছে।

মধুমালতী চলে যাওয়ার পরে অর্জুন কী করেছে জানলে মধুমালতী আরও খুশী হতো। মধুমালতীর দিকে হাত তুলে ঠাকুরের মতো নমস্কার করেছে সে। ছেলে অভিমন্যু নতুন চাকরিতে ঢুকেছে। তাকে বলেছে, "হাঁ করে দেখছিস্ কি? গড় কর। সাক্ষাৎ জগদম্বা—ওঁর জন্যেই তো থিয়েটার বাঁচলো, এই পাড়া আবার রমরমা হলো। উনি দয়া না করলে কবে তোর বাপের চাকরি চলে যেতো, তোরা সবাই না-খেয়ে মরতিস।"

শাওয়ারের ধারা কমিয়ে দিলো মধুমালতী। নরম টার্কিস টাওয়েলে দেহটা মুছে, সে এবার মাথার প্লাসটিক ক্যাপটা খুলে

ফেললো। গত রাত্রে শোবার আগে প্রথম প্রশ্নটা বীরেশ্বরকে করার ইচ্ছে হয়েছিল। মা বলেছিলেন, পুরুষমানুষের কাছ থেকে পিতিশ্রুতি আদায় করবার ওইটাই প্রশস্ত সময়। কিন্তু মধুমালতী নিজেকে ছোট করে নি, শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে এসেছে। বিনোদমাসীর অভিমানিনী আত্মা মাঝে মাঝে তার ওপর ভর করে। মনের মধ্যে কে যেন বিদ্রোহ করে বসে, বলে তুমি না শিল্পী? অভিনেত্রী? সামান্য একজন ব্যবসাদার মালিকের কাছে নিজেকে তুমি ছোট করবে কেন?

এছাড়া বীরেশ্বরের দৃষ্টিতে এমন এক বশীকরণ মায়া আছে যে মধুমালতী অসহায় বোধ করে। সম্রাট বীরেশ্বরকে অগ্রাহ্য করবার মতো সাহস হারিয়ে যায়। এই অবস্থায় বীরেশ্বরকে বিশ্বাস করতে মন চায়। বীরেশ্বরও সুযোগ বুঝে বলেন, "তোমার জন্যেই থিয়েটারে এসেছি, মধু। কোহিনূরের নাম পাল্টানোর প্রস্তাবটাও আমি ভুলি নি।"

ঘুম থেকে উঠলেন বীরেশ্বর। সানিপার্কের বাড়িতে থাকলে এই সময় চাকরটা পা-টেপা শুরু করে। এই তাঁর বিশ্রী অভ্যাস। পনেরো মিনিট পদসেবার পরে শ্যামা নিজের হাতে চা নিয়ে আসে। সিল্কের লুঙ্গিটা কোনোরকমে কোমরে জড়িয়ে বীরেশ্বর বাথরুমে চলে যান। চোখে মুখে জল দিয়ে বীরেশ্বর বেতের চেয়ারে এসে বসেন। স্বামীকে ফিরতে দেখে শ্যামা সামনের টি-পট খুলে আধ চামচ চিনি ফেলে দ্রুত নাড়তে থাকে। টিপটের মুখ বন্ধ করে দু'জন কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন। তারপর

মুখের দিকে তাকিয়ে শ্যামা জিজ্ঞেস করে, "ঢালবো ?" বীরেশ্বরও অভ্যাস মতো বলেন, "ঢালো।"

খোকন যখন ছোট ছিল তখন সে এই সময়ে চায়ের আসরে যোগ দিতো। বাবার সঙ্গে চা না খেলে তার মন উঠতো না। এখন খোকন দূরে সরে গিয়েছে। সে আরও ভোরবেলায় নিজের ঘরে আলাদা চা খায়। শ্যামা নিজেও সেই সময় খোকার ঘরে চায়ের পর্বটা সেরে নেয়। বীরেশ্বরের সামনে এসে শ্যামা চা ঢেলে দেয়, কিন্তু নিজে আর চা খায় না। বীরেশ্বর নিজেও জোর করেন না। ব্যাপারটা সবার অলক্ষ্যেই ঘটে গিয়েছে—দল থেকে পিছিয়ে পড়ে বীরেশ্বর কখন একলা হয়ে গিয়েছেন।

দল ছাড়া হওয়ার ব্যাপারটা বীরেশ্বরের নজরে পড়ে নি এমন নয়। কিন্তু এর জন্যে মোটেই তার চিন্তা নেই। খোকন নিশ্চয় চায়ের সঙ্গে গোটা কয়েক সিগারেট ওড়ায়—বাবার সামনে বিনা সিগারেটে চা জমতে পারে না। শ্যামা যদি স্বামীর জন্যে এতো বেলা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে, একমাত্র সন্তানের সান্নিধ্য সুখ উপভোগ করতে-করতে চায়ের তৃষ্ণা মিটিয়ে নেয় তা হলেও দোষ দেওয়া যায় না।

প্রভাতের এই নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধতা বীরেশ্বর কাজে লাগিয়ে দেন। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তিনি এই সময় সমস্ত দিনের ফন্দি এঁটে নেন। কাকে ডোবাবেন, কার নামে মামলা করবেন, ব্ল্যাক মার্কেটে সিমেন্টের দাম আজ কত তুলবেন, শেয়ার বাজারে হাওড়া জুট মিল ও কেশোরাম কটন বেচে দিয়ে কত ইণ্ডিয়ান আয়রন কিনবেন। দুনিয়ার কোনো লোককেই বীরেশ্বর রক্ষিত বিশ্বাস করেন না। সুযোগ পেলে সবাই যে তাঁর পিছনে ছুরি লাগাতে পারে, এ বিষয়ে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর বিয়ে-করা স্ত্রীটির স্বভাব ঠিক উল্টো। পৃথিবীর সমস্ত লোককে সে বিশ্বাস করে বসে আছে! কাউকে কখনও তার সন্দেহ হয় না। বীরেশ্বর

মাঝে মাঝে ভাবেন, তিনি যদি মেয়ে হতেন, তা হলে চালচুলোহীন একটা বেকার ছেলের ওপর বিশ্বাস করে শ্যামার মতো ঐভাবে বাপ-মায়ের নিরাপদ আশ্রয় থেকে কিছুতেই বেরিয়ে আসতেন না।

অনেকদিন আগে এ বিষয়ে শ্যামার সঙ্গে তিনি রসিকতা করেছেন। বলেছেন, "যদি তোমাকে আমি ডোবাতাম?"

শ্যামা তখন সরল মনে হাসতো। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতো, "ইস্! ডোবালেই হলো—আমি বুঝি লোক চিনি না?"

"সত্যি শ্যামা কি লোক চেনে?" নেদো মল্লিক একদিন মদের আসরে মন্তব্য করেছিলেন। বীরেশ্বর সেদিনই নেদোকে সাবধান করে দিয়েছেন, "ওয়াইফ তুলে কথা বলবে না।"

নেদো মল্লিক ঠাকুরের নামে দিব্যি করেছিলেন, ওয়াইফের কথা আর তুলবেন না।

স্বামীর কাপে চা ঢেলে দিয়ে শ্যামা বীরেশ্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে, "তুমি কী এতো ভাবো বলো তো?"

"বিষয়-সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাটক-নভেল কত কী ভাববার রয়েছে, শ্যামা। না ভাবতে পারলে সারপেনটাইন লেনের সেই ভাড়া বাড়িটায় এখনও পচতে হতো," বীরেশ্বর উত্তর দেন।

শ্যামা ওই বাড়িটা সম্বন্ধে কোনোরকম খারাপ মন্তব্য সইতে পারে না। শ্যামার ধারণা তার জীবনের যা-কিছু স্মরণীয় ঘটনা সব ওই বাড়িতেই ঘটেছে। রেজিস্ট্রি আপিসে বিয়ের পরে ওখানেই স্বামীর সঙ্গে প্রথম রাত্রি কাটিয়েছিল শ্যামা। "তুমি যে গোপনে দেশের কাজ করো, তা তো ওই বাড়িতেই জেনেছিলাম।" আর ওই বাড়িতেই খোকন এসেছিল শ্যামার গর্ভে।

ধনী গৃহবধূদের এই ধরনের মানসিক বিলাসিতা বীরেশ্বরের মোটেই সহ্য হয় না। শ্যামাকে যদি এখনও সারপেনটাইন লেনের স্যাঁতসেঁতে ঘরে পড়ে থাকতে হতো, তা হলে স্বামীকে কী সব

মধুর বচন শুনতে হতো তা বীরেশ্বর সহজেই কল্পনা করে নিতে পারেন।

বীরেশ্বরের খেয়াল হলো তিনি এখন বাড়িতে নেই। মধুমালতী সামনে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়েছে। সংবাহনে অভ্যস্ত পা দুটো সামান্য সুড়সুড় করছে, কিন্তু বীরেশ্বর ওই দুর্বলতাকে বিশেষ আমল দিলেন না।

"ঘুম হয়েছিল তো?" মধুমালতী জিজ্ঞেস করলো।

ঘুম যে তেমন হয় নি একথা মধুমালতীকে বলে লাভ নেই। কেন ঘুম হয় নি তা নিয়ে এখনই ভাবতে বসবে। মেয়েদের এই এক দোষ—পুরুষমানুষের সামান্য সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে ওরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাথা ঘামায়।

মধুমালতীর মুখের দিকে তাকিয়ে বীরেশ্বর বুঝতে পারছেন তার কিছু বলবার ছিল। বক্তব্যটা কোন্ বিষয়ে হতে পারে তা আন্দাজ করবার মতো বুদ্ধি ভাঁড়ে না থাকলে সেই মলঙ্গা লেন থেকে যাত্রা শুরু করে বীরেশ্বর এই সুন্দরীগৃহে নৈশ সাম্রাজ্য বিস্তারের সুযোগ পেতেন না। পরবর্তী নাটকের নায়িকা কে জানবার জন্যেই মধুমালতী নিশ্চয় উন্মুখ। কিন্তু এ বিষয়ে নিজের তাসগুলো দেখাতে বীরেশ্বর এখনও প্রস্তুত নন। সুন্দরী মধুমালতীর অনেক আবদার ও অনুরোধ রেখেছেন বীরেশ্বর। কিন্তু মধুমালতী, ভুলে যেও না, বীরেশ্বর রক্ষিতের কাছে তুমি সহজে ধরা দাও নি। রাজনটী রাগমালার কাছে নতমস্তকে আসবার জন্যে বীরেশ্বর যখন পাগল তখন তুমি অবহেলায় তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছো। শেষ পর্যন্ত যদি বীরেশ্বর এই কেষ্টদাস কুণ্ডু স্ট্রীটের বিছানায় পৌঁছে থাকেন, তা তিনি বীরেশ্বর রক্ষিত বলেই পেয়েছেন। কোনো অবহেলার বদলা না নেওয়া পর্যন্ত বীরেশ্বর রক্ষিতের রক্ত ঠাণ্ডা হয় না।

এই মুহূর্তে বীরেশ্বরের লিপিকার কথা ভাবতে ইচ্ছে করছে

লিপিকার ভাগ্যসূর্য এখন উদয়াচলে। এত সামান্য সময়ে থিয়েটারের জগতে কেউ কখনও এতো নাম করে নি। নার্স ও নর্তকীদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা ভাল ডায়ালগ বীরেশ্বর শুনেছিলেন, 'ওয়ান্স এ নার্স অলওয়েজ এ নার্স ; ওয়ান্স এ নর্তকী অলওয়েজ এ নর্তকী।' কিন্তু লিপিকা সেই বাধা কত সহজে অতিক্রম করেছে। লিপিকা এখন অভিনেত্রী—এমন অভিনেত্রী যে নৃত্য জানে। যে-মেয়েটি তাঁর সামনে বসে রয়েছে সেও নাচ জানতো—কিন্তু দিশী নাচ। লিপিকা বিলিতী নাচ থেকে শুরু করে এখন বীরেশ্বরের পরামর্শমতো দিশী নাচও শিখে নিয়েছে। কিন্তু মালতী একটুও এগলো না। বরং দেহের ওজন বাড়িয়ে ফেলেছে মধুমালতী। ব্লাউজের যা মাপ ছিল তা দু'নম্বর বেড়ে গিয়েছে। অধর চাটুজ্যেকে মধুমালতী একদিন বলেছিল, "ক্যাবারে নাচ আবার নাচ নাকি ?"

বীরেশ্বর গোপনে অন্য লোকের কাছে শুনেছেন অধরের মন্তব্য : "সায়েব এইসব নাচ পাশ্চাত্য নৃত্য বলে চালাচ্ছেন। মোটেই এগুলো পাশ্চাত্য নৃত্য নয়—ইউরোপের আর্টিস্টরা দেখলে ভিরমি খাবে। এগুলো মিডলইস্টের সস্তা কালচার।"

বীরেশ্বর ভাবলেন, লিপিকাও তো দেশী নাচ সম্বন্ধে নাক বেঁকাতে পারতো। কিন্তু তা না-করে সে মন দিয়ে নাচ শিখেছে। নরহরি বলেছে, "অদ্ভুত মহিলা, স্যার। ঠিক আপনার মতো মনের একাগ্রতা। শরীরটা শাসনে রাখার জন্যে কতরকম যৌগিক একসাইজ করেন, লিপিকাদি।"

এই এক অদ্ভুত থিয়েটারী নিয়ম—বাইশ-তেইশ বছরের পুঁটকে মেয়েকে তার ডবলবয়সী নরহরি দিদি বলছে এবং দিদিমণিও তা বেমালুম মেনে নিচ্ছেন।

বীরেশ্বরের মুখ দেখে মধুমালতী বললো, "হাসছেন কেন ?"

বীরেশ্বর জানতে চাইলেন, "দাদার বয়সী লোকরা মেয়েদের দিদি বললে তোমাদের মনের অবস্থা কীরকম হয় ?"

মধুমালতী বললো, "কেউ দিদি ডাকলে মেয়েরা একটু নিশ্চিন্ত হয়। দাদা সম্বন্ধটা এদেশে তো নিরাপদ নয়।"

বীরেশ্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে মধুমালতী জিজ্ঞেস করলো, "এই সকালেই কিছু ভাবতে আরম্ভ করলেন ?"

সর্বনাশ! মধুমালতী যদি একবার বুঝতে পারে বীরেশ্বর কী ভাবছেন! কিন্তু মনের ভাবনা মনের মধ্যে চেপে রাখতে বীরেশ্বরের তুলনা নেই। তিনি হেসে বললেন, "ব্যবসা বাণিজ্য, সংসার-সম্পত্তি, আইন-আদালত—হাজার রকম জটের মধ্যে বন্দী হয়ে আছি। তোমার এখানে এসে কিছুক্ষণের জন্যে সেসব ভুলতে চাই, মধু। জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই ?"

স্বামী বিবেকানন্দের ঐ প্রিয় গানটা বীরেশ্বরের এইভাবে অপপ্রয়োগ না করলেই পারতেন, মালতী ভাবলো। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বীরেশ্বর বললেন, "অধর বলছিল, ওটাও নাকি থিয়েটারের গান—বুদ্ধদেব-চরিত নাটকে কে যেন গেয়েছিল আঠারশ কত সালে।"

মধুমালতীর মুখ আজ যেন একটু বিষণ্ণ। অন্য সময় হলে বীরেশ্বর নিজেই প্রশ্নে প্রশ্নে তাঁর আদরের মধুমালতীকে উত্যক্ত করতেন জেনে নিতেন তার বিষণ্ণতার কারণ। কিন্তু এখন তিনি অন্য চিন্তায় ব্যস্ত। সদ্যস্নাতা মধুমালতীর প্রশান্ত মুখশ্রীর দিকে তাকিয়ে বীরেশ্বর নিজের ব্যবসার কথা ভাবছেন। গোলাপী রঙের টাঙ্গাইল শাড়িতে ঢাকা প্রায়-চল্লিশবছরের নারীদেহের কোনো রহস্যই বীরেশ্বরের অজ্ঞাত নয়। নিজের খেয়াল-খুশীমতো ঐ দেহকে বীরেশ্বর নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আবিষ্কার ও ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সামান্য ওই দেহ উপভোগের নেশায় বীরেশ্বর এই বাড়িতে ধরা দিয়েছেন যারা ভাবে তারা বীরেশ্বর রক্ষিতকে এখনও চেনে না। নাট্যালয়ের এই নারীকে স্পর্শ করে তিনি শেয়ারমার্কেটে অভূতপূর্ব সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছেন। যতদিন

এই সৌভাগ্য অটুট ছিল ততদিন মধুমালতীকে তিনি মাথায় করে রেখেছেন।

কিন্তু ইদানীং বীরেশ্বর সন্দেহ দোলায় দুলছেন। পীনপয়োধরা পয়মন্ত মধুমালতীর স্পর্শগুণ কী শেষ হয়েছে? মধুমালতী কি আর আগেকার মতো সৌভাগ্যবতী নেই। গত সপ্তাহে পর পর দু'দিন সদ্যস্নাতা মধুমালতীর মুখচুম্বন করে বীরেশ্বর সোজা শেয়ার বাজারে গিয়েছেন। কিন্তু পয়সার ব্যাপারে তেমন সুবিধে করতে পারেন নি। সায়েববাড়ির ব্লু-চিপ শেয়ার পর্যন্ত তাঁকে 'লেট ডাউন' করেছে। বীরেশ্বরের পক্ষে এ এক নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা। মধুমালতীর স্পর্শ-প্রশ্রয় বারবার তাঁকে শেয়ার বাজারে সৌভাগ্য এনে দিয়েছে। যখনই দু-এক হাজার টাকা বাড়তি কামাই-এর ইচ্ছে হয়েছে তখনই দুঃখহরণের গাড়ি চড়ে শেয়ার মার্কেটে যাবার পথে বীরেশ্বর এই কেষ্টদাস কুণ্ডু স্ট্রীট ঘুরে গিয়েছেন। রাতের অতিথিকে ভোরবেলায় দেখে মধুমালতী অবাক হয়ে গিয়েছে। বীরেশ্বর অবশ্য কোনোদিন ওকে আসল ব্যাপারটা বলেন নি। খবরটা জানতে পারলে মেয়েমানুষের দেমাক বেড়ে যাবে। বীরেশ্বর শুধু বলেছেন, "মধু, কাজে যাবার আগে তোমার মিষ্টি মুখটা দেখবার জন্যে মনটা ছটফট করে উঠলো।" অসময়ে বীরেশ্বরের চুম্বন গ্রহণ করে বিব্রত মধুমালতী বলেছে, "আমার সৌভাগ্য।"

এই ভোরবেলায় বীরেশ্বর অন্যরকম হয়ে যান। পৃথিবীর কোনো রমণীর জন্যে কোনোরকম হৃদয় দুর্বলতা তাঁকে বিব্রত করে না। শেয়ারবাজারে দু'দিনের ব্যর্থতা তাঁকে চিন্তায় ফেলেছে। এই সময় থিয়েটারের কথাও তিনি ভাবেন না। শূন্য চায়ের পেয়ালা সরিয়ে দিয়ে বীরেশ্বর মনে মনে বললেন, বারবার তিনবার। আজ শেষ পরীক্ষা করে দেখবেন তিনি। মধুমালতীর অধরসুধা পান করেই তিনি সোজা শেয়ার মার্কেটে চলে যাবেন। শেয়ার মার্কেটই তো ভাগ্যসন্ধানীদের আসল জায়গা।

কিন্তু বিনা হাঙ্গামায় আজ দিন শুরু করা গেলো না। একটু পরেই শ্যামার অপ্রত্যাশিত টেলিফোন এলো। কেষ্টদাস কুণ্ডু স্ট্রীটে কোনো কারণেই যোগাযোগ করবার মেয়ে নয় শ্যামা। কিন্তু গতকাল রাত্রে খোকন হঠাৎ বিনা নোটিশে কলকাতায় ফিরে এসেছে। ট্রেন অনেক লেট ছিল।

"ও কেমন আছে? শরীর ভাল তো? রোগাটোগা হয় নি তো?" বীরেশ্বর কয়েকটা প্রয়োজনীয় খবর দ্রুত নিয়ে নিলেন।

বীরেশ্বর ভাবছিলেন তা হলে সোজা লায়ন্‌স রেঞ্জে না গিয়ে একবার বাড়ি ঘুরে আসা যাক। কিন্তু শ্যামা এই সাতসকালে টেলিফোন করবার কারণ বললো। "খোকন বাথরুমে ঢুকেছে, সেই সুযোগে তোমাকে চটপট ফোন করছি। ছেলের কাছেও তো তুমি আমার মুখ রাখলে না।"

"বলো", বীরেশ্বর কোনো মন্তব্য করলেন না।

শ্যামা বললো, "খোকন এসেই বাবার খোঁজ করছে।" নিজের লজ্জা ঢাকা দেবার জন্যে শ্যামা বাধ্য হয়ে মিথ্যে কথা বলেছে— ব্যবসার কাজে বাবা হঠাৎ কলকাতার বাইরে গিয়েছেন। "তুমি বোলো, সিমেণ্টের ব্যাপারে জামশেদপুর গিয়েছিলে।"

বীরেশ্বরের এব্যাপারে কিছুই করবার নেই। খোকনের সঙ্গে এখন তাহলে দেখা করা চলবে না—জামশেদপুরের গাড়ি এত সকালে কলকাতায় আসে না। শ্যামার ভাঁড়ে যদি কোনো বুদ্ধি থাকে! অন্য কোনো জায়গার নাম করতে পারতো। খোকনের সঙ্গে যখন সকালে দেখা করা চলবে না—তখন সোজা শেয়ার মার্কেটেই যাবেন বীরেশ্বর।

পার্ক সার্কাস ময়দানের কাছে তার নতুন ফ্ল্যাটে লিপিকা সেন ঘরসংসার সাজাচ্ছিল। এই কিছুদিন হলো উত্তর কলকাতা থেকে সে এইখানে উঠে এসেছে। বীরেশ্বরবাবুর বদান্যতা ছাড়া লিপিকার পক্ষে এখানে আসা সম্ভব হতো না। স্বনামে-বেনামে বীরেশ্বরের যে-কয়েকটা বাড়ি আছে তারই একটা সামান্য ভাড়ায় সহৃদয় বীরেশ্বরবাবু লিপিকাকে দিয়েছেন।

ঘড়ির দিকে তাকালো লিপিকা। পূর্বভারতে সর্বাধিক প্রচারিত সচিত্র আলো-আঁধারি পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি এখনই এসে পড়বেন। এবারের সংখ্যায় বড় বড় টাইপে ঘোষণা করা হয়েছে : আগামী সংখ্যার আকর্ষণ, লীলাময়ী লিপিকা সেনের সঙ্গে কিছুক্ষণ।

"লিপিকা-লিপিকা।" আয়নার সামনে বিশেষ ভঙ্গিমায় শাড়িটা ঠিক করে নিয়ে চোখের আগুনে নিজের ছন্দায়িত দেহকে লিপিকা দাহন করবার চেষ্টা করলো। বিখ্যাত পত্রিকার প্রতিনিধিকে সাদর অভ্যর্থনা করবার মতো সাজগোজ হয়েছে। একবার ঘড়ির দিকে তাকালো লিপিকা, তারপর অভিনয়ের কায়দায় আয়নার প্রতিবিম্বকে লিপিকা জিজ্ঞেস করলো, "সিনেমা কাগজের প্রতিনিধি আসছেন—তোমার জীবনের প্রথম সাক্ষাৎকারের জন্যে। তার মানে বুঝতেই পারছো, তুমি এবার জনগণেশের নজরে পড়েছো। কিছু বলো, অমন বোকার মতো তাকিয়ে আছো কেন?"

লিপিকা-লিপিকা। ও হরি, লিপিকা তো তোমার বাপমায়ের দেওয়া নাম নয়। তুমি ছিলে বিমলা সেন। কাশীতে তোমার বাবা

ছিলেন সংস্কৃতের অধ্যাপক। তারপর তিনি এলাহাবাদ কলেজে এলেন। সেইখানেই তোমার জন্ম। গোঁড়া হিন্দুবাড়ির মেয়ে তুমি, তোমার অসচ্ছল পিতা সনাতন ধর্মীয় আদর্শে তোমাকে মানুষ করবার চেষ্টা করেছিলেন। বাবার কাছেই তুমি গার্গী, লোপামুদ্রার গল্প শুনেছো। কিন্তু তুমি ইংলিশ ইস্কুলে-পড়া প্রতিবেশিনী বান্ধবীর প্রভাবে অন্য-জীবনের স্বপ্ন দেখলে। তোমার ভাল লাগলো আধুনিকতা—তুমি যুগের হাওয়ার সঙ্গে পাখা মেলে সুদূর সুখের নীলিমায় উড়ে যেতে চাও। তোমার ইস্কুলের পড়াশোনা মাথায় উঠলো, বোম্বাই-মার্কা সিনেমা দেখে পাগল হলে তুমি। তারপর বিমলা সেন, তোমার সঙ্গে একদিন অশোক ত্রিপাঠীর আলাপ হলো। সুদর্শন অশোক তোমাকে অনেক সুখ ও ঐশ্বর্যের লোভ দেখালো—তুমি একদিন বাবা-মায়ের অনুমতি না নিয়েই বাড়ি থেকে পালালে। তোমাদের লক্ষ্য কলকাতা।

বিমলা সেন, এসব তোমার মনে পড়ছে? আয়নার ছবিটা টেলিভিশনের ঘোষিকার মতো নড়েচড়ে লিপিকা সেনকে প্রশ্ন করলো। এখানকার বাংলা কাগজে ছোট্ট করে তোমার বাবা অধ্যাপক সেনের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। তোমার দুঃখে এবং সেই সঙ্গে রাগে অপমানে ক্ষোভে যে অধ্যাপক সেনের হার্ট-অ্যাটাক হয়েছিল সে-খবর অবশ্য খবরের-কাগজের বারাণসী সংবাদদাতা তোমাদের প্রতি ভালবাসাবশতই প্রকাশ করেন নি। বিমলা সেন, তুমি কিন্তু সেদিন ভাল করে কাঁদবার অবকাশও পাও নি। কারণ, প্রতিবছর ইণ্ডিয়াতে হাজার হাজার অসহায় মধ্যবিত্ত মেয়ের যা হয়ে থাকে তোমারও তা হয়েছিল। অশোক ত্রিপাঠী তোমাকে চরম বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়ে হঠাৎ নিজমূর্তি ধারণ করেছিল।

বিমলা সেন, কলকাতায় এসে কিছুদিন তুমি ও অশোক হনিমুন মেজাজে ছিলে। অশোক ত্রিপাঠী তার প্রাণেশ্বরীকে নিয়ে

কলকাতার গ্রেট-ইণ্ডিয়ান হোটেলে উঠেছিল। তোমরা দু'জন প্রথম তিন সপ্তাহ কী সুখেই ছিলে। তারপর তুমি অথৈ জলে পড়লে। দুর্ভাগ্যের সেই স্রোতে ভাসতে ভাসতে তুমি কলকাতার কোনো ঠিকানাবিহীন পঙ্কিল নর্দমার পাঁকে হারিয়ে যেতে। দারুণ অর্থাভাবে তুমি সেইদিকেই ভেসে যাচ্ছিলে। কিন্তু ভাগ্য তোমার সহায় হলো।

গ্রেট-ইণ্ডিয়ানের অ্যাসিসটেণ্ট ম্যানেজার মিস্টার রুসী কনট্রাক্টরের সঙ্গে হোটেলে থাকাকালীন তোমার আলাপ হয়েছিল। বাঁচবার আর কোনো পথ খুঁজে না-পেয়ে তুমি শেষ পর্যন্ত মিস্টার কনট্রাক্টরের সঙ্গে দেখা করেছিলে। রুসী তোমাকে সুখের দিনে দেখেছিল। হোটেলের চাকরিতে মেয়েদের অনেক অপমান ও অপব্যবহার দেখতে রুসী অভ্যস্ত। তবু তোমার জন্যে সে আন্তরিক কষ্ট অনুভব করলো। রুসীর নিজেরও সেই সময় কাজে অসুবিধে চলছিল। বেরুট, লিবিয়া এবং কায়রো থেকে নর্তকী আমদানি প্রায় বন্ধ। এলিয়ট রোড ও রিপন স্ট্রীটের যে ক'টা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে কিছুটা নাচ জানে তারা সুযোগ বুঝে তিনগুণ দাম চড়িয়ে দিয়েছে, তবুও তাদের নিয়ে হোটেলে হোটেলে খেয়োখেয়ি।

বিমলা সেন, তোমার মনে পড়ছে? রুসী সেদিন তোমার সমৃদ্ধ দেহের দিকে অভিজ্ঞ চোখে তাকিয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, "ছোটবেলায় কখনও নাচগানের অভ্যাস ছিল?" "অবশ্যই ছিল," তুমি উত্তর দিয়েছিলে। রুসী বলেছিল, "তাহলে হোয়াই নট্ টেক দি প্লাঞ্জ? তাহলে ঝাঁপিয়ে পড়ো না কেন?"

কোন্ আগুনের চিতায় বিমলা সেনকে রুসী ঝাঁপিয়ে পড়তে বলছে? রুসী মাথা নেড়েছে। "না না, ইণ্ডিয়ান ডান্স নয়—ও লাইনে হাজার হাজার মেয়ে আছে, তাদের কিছুই হচ্ছে না।"

রুসী বলেছিল, "কেঁদো না বিমলা, তুমি বোসো। আমার

বাবা বলতেন, যে-কোনো লাইনে সাফল্যের একমাত্র পথ হলো—ফাইণ্ড এ গ্যাপ অ্যাণ্ড ফিল ইট। একটা ফাঁক খুঁজে বার করে সেইখানে ঢুকে পড়ো। ক্যাবারে লাইনে ফাঁক রয়েছে, তুমি চাইলে আমি ঢুকিয়ে দেবো।"

বিমলা সেন, তোমার মনে পড়ে মাত্র দু'দিনের ট্রেনিং-এ তুমি গ্রেট-ইণ্ডিয়ান হোটেলের ফ্লোর শোতে নেমে পড়েছিলে এবং তোমার হাঁটু পর্যন্ত নেমে আসা জেনুইন চুল দেখে বিশিষ্ট দর্শকরা বিমোহিত হয়েছিলেন? তোমাকে করুণা করতে গিয়ে রুসী কনট্রাকটর লাভবান হলেন। তোমার জীবনে মাঝে মাঝে হঠাৎ ঝড় আসে, সব কিছু আচমকা পাল্টে যায়। মাত্র একদিনের পরিকল্পনায় কাশীর অধ্যাপক সেনের মেয়ে অশোক ত্রিপাঠীর সঙ্গে ঘর ছাড়া হয়েছিল, আবার মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার নোটিশে বিমলা সেনকে স্মৃতির সিন্দুকে চিরতরে বন্দী করে বেরিয়ে এল লাভলি লিপিকা।

এই নামের পিছনেও রুসীর অনেক চিন্তা ছিল। এনটারটেনমেন্ট ম্যানেজার লোবো মতলব দিয়েছিল, নাম দাও ম্যাগনিফিসেণ্ট মিস্ ম্যাগনোলিয়া, অথবা ভিভাসিয়াস ভায়োলেট। অভিজ্ঞ রুসী হেসে বলেছিলেন, একটু ইণ্ডিয়ান গন্ধ থাক, ফরেন সায়েবরা আজকাল দিশী জিনিস পছন্দ করেন। তন্দুরী চিকেনের সঙ্গে তন্দুরী নর্তকী জমবে ভাল।

নাচের অ-আ-ক-খ না-জেনেও যে এই কলকাতা শহরে নর্তকী হওয়া যায় তা ভাবতে খুব কষ্ট হয়েছে লিপিকার। কিন্তু সেসব বিচার-বিবেচনার সময় কোথায়? কারনানি ম্যানসনে তখন এক কোমরভাঙা ফরাসী বুড়ী ছিলেন। বিদেশী নাচের অনেক কিছু জানতেন সেই বুড়ী। সময় নষ্ট না করে লিপিকা দুপুরবেলায় সেই বিদেশিনীর কাছে মন দিয়ে নাচ শিখেছে। বুড়ী মিস্ রেমঁ তাঁর ইণ্ডিয়ান অভিজ্ঞতায় এমন স্টুডেন্ট কখনও পান নি। নাচের

ইস্কুল খুলেছিলেন ভদ্রমহিলা। কিন্তু বড়লোকের ছোটলোক ছেলেরা সেখানে ছুটে আসে নাচ শিখতে নয়, মেয়েমানুষের সন্ধানে। কিছু দুষ্টুলোকের দুষ্টুমিতে এমন সুন্দর লাইনটা বিষাক্ত হয়ে গেলো, মিস রেম্ দুঃখ করেছিলেন।

ছাত্রীর নিষ্ঠা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন মিস রেম্। নিষ্ঠা নয়—গোঁ। এই গোঁ জিনিসটা হঠাৎ ভোমরার মতো লিপিকার মধ্যে ছোটবেলা থেকেই জেগে ওঠে। চোখ রাঙিয়ে, ভয় দেখিয়ে কেউ কোনোদিন বিমলাকে দিয়ে কিছু করাতে পারে নি। বাবা মা চোখ রাঙিয়েছিলেন। কোনো ফল হয় নি, অশোক ত্রিপাঠীর হাত ধরে সে বেরিয়ে এসেছে। দুষ্টুমি ধরাপড়ার পরে অশোক ত্রিপাঠীও চোখ রাঙিয়েছিল, অবলা অসহায় বাড়ি-থেকে-বেরিয়ে-আসা মেয়েটাকে নানা ভয় দেখিয়েছিল। মাথার মধ্যে গোঁয়ার ভোমরাটা আবার পাখা তুলে উড়তে আরম্ভ করেছিল—বিমলার ভয়ঙ্করী মূর্তি দেখে শয়তান অশোক ত্রিপাঠী পালাবার পথ পায় নি।

ক্যাবারে নর্তকী লিপিকা সেন নিজেকে যোগ্য করে তুলতে চেয়েছিল এরপর। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় চিঠি লিখে লিপিকা নাচের বই আনিয়েছে—শিখেছে চকিতচরণে মনোহরণের নানা মুদ্রা। গ্রেট-ইণ্ডিয়ান হোটেলের বড়দিনের বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছে 'লাভলি অ্যাণ্ড কিসিয়াস লিপিকা।'

একবার ক্যাবারে নাচের এক বিদেশী চলচ্চিত্র কলকাতায় এসেছিল। রুসীর সঙ্গে সিনেমা কোম্পানির ম্যানেজারের আলাপ ছিল। গোপনে ছবিটা বাড়িতে এনে মিস রেম্ ও লিপিকা দু'জনে এক সপ্তাহ ধরে সিনেমার নাচগুলো প্র্যাকটিশ করেছে। কষ্টের সেই দিনগুলোর কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে লিপিকার। ভোর সাতটায় বাড়িতে ছবির স্ক্রিনিং শুরু হতো, সেই সঙ্গে মহড়া চলতো দুটো পর্যন্ত। তারপর ছবি চলে যেতো সিনেমা হলে ম্যাটিনী শোয়ের জন্যে।

লিপিকা সেন সংসারে ছোটখাট দয়া কিছু কিছু পেয়েছে। রুসী কনট্রাকটর, সিনেমা ম্যানেজার রফিক সায়েব, মিস রেমঁ এঁরা না-থাকলে কলকাতার কাল নর্দমা বেয়ে লিপিকা সেনের দেহটা এতোদিনে কোনো আঁস্তাকুড়ের শোভাবর্ধন করতো।

নর্তকী লিপিকা সেন একদিন গ্রেট-ইণ্ডিয়ান হোটেলের ডাইনিং হলে দূর থেকে জগদ্বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক বিশ্বজিৎ বসুকে দেখেছিল। সেদিন সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে নেচেছিল লিপিকা—তার মানস সরোবরে নতুন সম্ভাবনার পদ্ম উঁকি মারছিল, বিশ্বজিৎ বসু যদি তাকে কোনো ছবির জন্যে নির্বাচন করেন। হোটেলের চার-দেওয়ালের মধ্যে নেচে নেচে সামান্য কিছুদিনের মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল লিপিকা।

সেদিন নাচের মধ্যে সর্বস্ব ঢেলে দিয়েছিল লিপিকা। তারপর যা-কখনও করে নি, নৃত্যপর্ব চুকিয়েই ছুটে এসেছিল বিশ্বজিৎ বসুর কাছে। "আমার নাচ আপনার কেমন লাগলো?"

স্বভাবভদ্র বিশ্বজিৎ বসু সুগম্ভীর কণ্ঠে মৃদু প্রশংসা করেছিলেন। লজ্জার মাথা খেয়ে লিপিকা প্রশ্ন করেছিল, "আমার কোনো আশা আছে?"

"আশা? পৃথিবীতে কোন্ মানুষের সামনে আশা নেই?" বিশ্বজিৎ বসু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর নর্তকীর মনের ইচ্ছাটা বুঝে বলেছিলেন, "আমি মনে রাখবো।"

লিপিকা তার ঠিকানা দিতে গিয়েছিল। বিশ্বজিৎ বলেছিলেন, "কোনো প্রয়োজন নেই। সময় হলে, আমি ঠিক খোঁজ করে নোবো।"

সময়? কবে সে সময় হবে? গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেলের বাইরে বিরাট জগতের দিকে মাঝে-মাঝে তাকাতে ইচ্ছে করতো লিপিকার।

বিশ্বজিৎ বসু কোনো একদিন তাকে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের

জন্যে ডাকাবেন এমন একটা বিশ্বাস লিপিকার মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। এবং সেই দিনের প্রতীক্ষায় লিপিকা মাঝে-মাঝে বাংলা সিনেমা-থিয়েটার দেখা আরম্ভ করেছিল। কোহিনূরের মধুমালতীকে লিপিকা এইভাবেই প্রথম রঙ্গমঞ্চে দেখেছিল— তারপর একদিন মধুমালতী যখন গ্রেট-ইণ্ডিয়ান হোটেলে ডিনার খেতে গিয়েছিল, সেদিন আলাপটা জমেছিল। নতুন পরিচয়ে খুশী হয়ে অভিনেত্রী মধুমালতী নর্তকী লিপিকাকে তার নতুন বই দেখবার পাস দিয়েছিল। পাস নিতে একটু সঙ্কোচবোধ করেছিল লিপিকা। মধুমালতী তখন বলেছিল, "আমিও আর্টিস্ট, তুমিও আর্টিস্ট! পাস কেন নেবে না?"

তারপর সেই সামান্য পরিচয় থেকেই একদিন অকস্মাৎ লিপিকার সামনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেলো। মধুমালতীর চিঠি নিয়ে অধরবাবু যখন প্রথম সেই দুপুরে লিপিকার কাছে এসেছিল তখন সে ভেবেছিল, বিশেষ কোনো জরুরী ব্যক্তিগত কাজে মধুমালতী ডেকে পাঠিয়েছেন। একবার মনে হয়েছিল, এমন কি পরিচয় যার সুযোগে মধুমালতী এইভাবে তাকে আচমকা ডেকে পাঠালেন? তেমন দরকার হলে মধুমালতীর নিজেরই এখানে আসা উচিত ছিল। হলেনই বা তিনি নাট্য-জগতের প্রতিষ্ঠিতা অভিনেত্রী।

আজ কিন্তু লিপিকার কোনো দুঃখ নেই। ভাগ্যে সেদিন লিপিকা ছুটে গিয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্টেজে নামবার দুঃসাহস দেখিয়েছিল। মধুমালতী ভরসা দিয়েছিল, "তোমার কোনো চিন্তা নেই। যদি তুমি খারাপ করো কেউ তোমার পরিচয় জানতে পারবে না। আজকের জন্যে তোমার নাম গোপন রাখতে বলে দিচ্ছি।"

কিন্তু আশ্চর্য এই থিয়েটারের লাইন। অধরবাবুর ভাষায়, এখানে ভাল-মন্দ কোনোটাই গোপন থাকে না। এখানে মন্দ খবরগুলো ছড়াবার জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বী থিয়েটার কোম্পানির লোকরা

টাকা দিয়ে লোক রাখে। তারা পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে থিয়েটার হলে ঢুকে দর্শকদের বলে, 'একেবারে কিছুই হচ্ছে না মশাই। এরকম বাজে নাটক জানলে কে পয়সা খরচ করে আসতো?' এইসব পেশাদার প্রচারক (বা অপপ্রচারক) অন্য সময়ে চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেয়, কর্তার হুকুম মতো সুদূর মফস্বলের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে নিরুৎসাহজনক খবর ছড়ায় এবং সুবারবন ট্রেনে বসে নিত্যযাত্রীদের শুনিয়ে-শুনিয়ে কোনো নাটককে ডোবায়, কোনো নাটককে তোলে।

বীরেশ্বরবাবুর ভাষায়—ওয়ার্ড অফ মাউথ—মুখের কথার মতো সার্থক কোনো পাবলিসিটি নেই। সেই মুখের কথার সুবিধে পেয়েছিল লিপিকা। সেদিনের নৃত্যসংবাদ লোকমুখে বিভিন্ন মহলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। বীরেশ্বরের ভদ্র ব্যবহার ও মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়েছিল লিপিকা। প্রথম রাত্রির অ্যাপিয়ারেন্সের জন্যে পুরো পাঁচশ টাকা এবং এক প্যাকেট রামলালের সন্দেশ পাঠিয়েছিলেন নরহরির মাধ্যমে এবং সেই সঙ্গে লিপিকাকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন দেখা করতে।

বীরেশ্বরের সেই উদার ব্যবহার মনে গেঁথে গিয়েছিল লিপিকার। ভাবুকের মতো চোখ বুজে নাট্যকার ও নির্দেশক বীরেশ্বর বলেছিলেন, "হোটেলের নর্তকীর সঙ্গে থিয়েটারের নর্তকীর অনেক তফাত লিপিকা দেবী। আমাদের এই বঙ্গরঙ্গমঞ্চে কত প্রতিভাময়ী নারী অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। কতদিন আগে তাঁরা রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন, কিন্তু আজও তাঁরা অমর হয়ে আছেন। হোটেলে কখনও তা হয়েছে কি?" প্রথম সুযোগে বীরেশ্বর আরও জানিয়ে দিয়েছিলেন, টাকার জন্যে তিনি এ লাইনে আসেন নি। বিপ্লবী গণেশ মিত্রর সঙ্গে একদা তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ছিল। আর্টের পূজারী বীরেশ্বর বঙ্গরঙ্গমঞ্চকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চান।

লিপিকা সকৌতুকে কয়েক মাসের জন্য রঙ্গমঞ্চে নাচতে রাজী হয়ে গিয়েছে। তারপর যে-রঙ্গমঞ্চকে লিপিকা একদিন খেলাচ্ছলে নিয়েছিল তাই ক্রমশ বড় হতে আরম্ভ করেছে। রুসী কনট্রাকটর ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, "কলকাতায় ক্যাবারের কোনো ভবিষ্যৎ নেই।"

"পৃথিবীর সব হোটেলে যদি ক্যাবারে এতো জনপ্রিয় হয়, তা হলে কলকাতা কী দোষ করলো?" লিপিকা জানতে চেয়েছিল।

রুসী বলেছিলেন, "যে-জিনিস দেখতে আগে অন্তত একশ টাকা খরচ করতে হতো, যার জন্যে ইংলিশ ড্রেসে অনেক রাত পর্যন্ত হোটেলে অপেক্ষা করতে হতো, এখন তা নর্থ ক্যালকাটার হলে মাত্র আড়াই টাকায় দেখা যায়। দশ টাকা খরচ করলে নর্তকী থেকে দেড় গজ দূরে বসবার ব্যবস্থা রয়েছে। জামা-কাপড়ের কোনো নিষেধ নেই—লুঙি এবং গেঞ্জি পরে থিয়েটার দেখতে গেলেও কেউ আপত্তি করবে না।"

লিপিকা বুঝেছিল রুসী রেগে কথা বলছেন। রুসীর মুখের ওপর প্রতিবাদ করা হয়তো যেতো, কিন্তু লিপিকা অকৃতজ্ঞ নয়—রুসীর ঋণ তার পক্ষে কোনোদিন শোধ করা সম্ভব হবে না।

রঙ্গজগতে লিপিকার খ্যাতি হোটেলেও সুবিধে এনে দিয়েছিল। দিনের পর দিন লিপিকার সমৃদ্ধ ঊর্ধ্বাঙ্গের ছবি সংবাদপত্র পাঠকদের সামনে বিজ্ঞাপিত করে বীরেশ্বর দর্শকহৃদয়ে লিপিকা সম্বন্ধে নতুন মোহমায়া সৃষ্টি করেছেন।

লিপিকা ক্রমশ কাজের চাপে বিশেষ জড়িয়ে পড়েছে। বাইরে থেকেও স্পেশাল শোর জন্যে মাঝে মাঝে আহ্বান আসে। সেইসব নৃত্য অধিবেশন থেকে মন্দ টাকা পাওয়া যায় না। সেই সঙ্গে সম্মানও আছে যা হোটেলে মোটেই সুলভ নয়। লিপিকা হোটেলের রেগুলার শোতে ইস্তফা দিয়েছে। তবে পুরনো দি[illegible] কৃতজ্ঞতায় বিশেষ-বিশেষ দিনে রুসী অনুরোধ করলেই লিপিকা

এসে গ্রেট-ইণ্ডিয়ান হোটেলে মধ্যরাতের নৃত্যোৎসবে যোগ দেয়। রুসীর কোনো অনুরোধেই লিপিকা কখনও না বলবে না।

বেলের টুং-টাং আওয়াজে লিপিকার সংবিৎ ফিরে এলো। আলো-আঁধারি পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি বোধ হয় এসে গিয়েছেন। ঝিকে সদর ঘরের দরজা খুলতে বলে লিপিকা ভিতরের ঘরে চলে গেল। বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে, বীরেশ্বরবাবুকে না জিজ্ঞেস করে এই সাক্ষাৎকারে লিপিকার রাজী হওয়া উচিত হয় নি।

"বীরেশ্বর রক্ষিত বাড়ির বারান্দায় বসে খোকনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। খোকনকে ধরা বেশ শক্ত। সুযোগ পেলেই সে পিছলে পিছলে বেড়ায়—বীরেশ্বরের কাছে আসে না। বীরেশ্বর সুযোগ বুঝে ছেলের কাছে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন। বিরাট এই বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করাও যে বেশ শক্ত কাজ তা খোকনকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। বাবার কাছে থেকে পালাবার ছুতো খুঁজছিল খোকন। এমন সময় ফোন এলো।

"হ্যালো, হ্যালো।" এই সকালে বাড়িতে লিপিকার ফোন পেয়ে বীরেশ্বর অবাক হয়ে গেলেন। লিপিকা যে তাঁকে নিজে থেকে ফোন করতে পারে তা বীরেশ্বর কল্পনা করতে পারেন নি। অভূতপূর্ব এই সৌভাগ্যে সবিশেষ সুখী হলেন বীরেশ্বর রক্ষিত।

বীরেশ্বর মূল্যবান উপদেশ দিলেন, "এই তো সবে শুরু, লিপিকা। এরপর হয়তো প্রতিদিন বিভিন্ন কাগজের লোকরা তোমাকে জ্বালাতন করবে। একটা কথা জেনে রেখো লিপিকা, এরা 'নেসেসারি এভিল'। কাগজের লোকদের চটানোও বিপদ, আবার মূর্খ ছাড়া আর কেউ এদের কাছে সব কথা বলে না।"

"আপনি বলছেন, আমার জীবনের সব ঘটনা এদের বলবো না ?" লিপিকা জিজ্ঞেস করে।

"অবশ্যই নয়। সব বললে আর রইলো কী ? শুধু সেইটুকু বলবে যাতে তোমার সম্বন্ধে পাবলিকের মনে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়, তাদের কল্পনায় সুড়সুড়ি লাগে—যাতে তাদের ইচ্ছে করে কোহিনূর স্টেজে গিয়ে রক্তমাংসর লিপিকা সেনকে একবার দেখে আসি।"

কাগজের প্রতিনিধি ঘরোয়া পরিবেশে লিপিকার কয়েকটা অন্তরঙ্গ ছবি তুললেন। অশোক ত্রিপাঠী এবং রুসী কনট্রাক্টরের কাহিনী সম্বন্ধে নীরব রইলো লিপিকা। বিশেষ প্রতিনিধি বললেন, "তা হলে ইউ-পি থেকে শিক্ষা নিয়ে আপনি সোজা কলকাতায় প্রখ্যাত হোটেলে যোগ দিলেন ?"

"পশ্চিমের বাঙালীরা একটু ফরওয়ার্ড হয় জানেনই তো," লিপিকা মিষ্টি হেসে উত্তর দিলো।

"তাছাড়া আপনাদের মতো ভদ্রঘরের ইংরিজী শিক্ষিতা মেয়েরা হোটেল লাইনে না এলেই বা চলে কী করে ?" আলো-আঁধারি পত্রিকার প্রতিনিধি নিজের মনেই বললেন, "এই দেখুন না আমাদের থিয়েটার লাইন। বাজারের মেয়ে দিয়ে আরম্ভ হয়েছিল। সামান্য ক'বছরের মধ্যে লাইনটা কীরকম ভদ্রসভ্য হয়ে উঠলো।"

"থিয়েটারে এলেন কীভাবে ?" প্রশ্ন করলেন বিশেষ প্রতিনিধি।

"থিয়েটার লাইনে আমার পরিচিতা এক বান্ধবী যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন।" মধুমালতীর নামটা বীরেশ্বরের নির্দেশ-মতো লিপিকা বাদ দিলো। তারপর বললো, "আমার এই আত্ম-প্রকাশের পিছনে রয়েছে শ্রীবীরেশ্বর রক্ষিতের মহানুভবতা। যৌবনে তিনি রাজনৈতিক বিপ্লব করেছেন, তারপর এই প্রৌঢ়

বয়সে তিনি রঙ্গমঞ্চে বিপ্লব ঘটাচ্ছেন। তাঁর উৎসাহ ছাড়া এ লাইনে আমি কখনও উন্নতি করতে পারতাম না।"

"প্রথম বই কামনা-বাসনায় আপনি ছিলেন সামান্য একজন ক্যাবারে ডান্সার। কিন্তু প্রথম দর্শনেই আপনি দর্শকদের হৃদয় জয় করলেন।"

"ঠিক বলেছেন। এই বইতেই আমার অভিনয়ে দীক্ষা।"

বিশেষ প্রতিনিধি বললেন, "কামনা-বাসনা নাটক আপনাকে ছাড়া কল্পনা করা যায় না। শত শত রজনী ধরে লক্ষ লক্ষ বাঙালীকে আপনি নতুন এক নৃত্যধারার সঙ্গে পরিচিত করালেন।"

লিপিকা বললো, "তারপর কালের কালিমা নাটকে আমি নর্তকী থেকে অভিনেত্রীর মর্যাদা পেলাম শ্রীযুক্ত রক্ষিতের উৎসাহে। এই কাহিনীর লেখক, নাট্যকার, নির্দেশক সব কিছু তিনিই।"

"তারপরের ঘটনা তো আমাদের জানা। কালের কালিমা নাটকে আপনি পাবলিককে বধ করলেন। একই দর্শক বারবার আপনার নাচ ও অভিনয় দেখতে ঘুরে আসছে।"

"বাংলার দর্শকরা যে আমাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এইটাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।" কৃতজ্ঞ লিপিকা আন্তরিকভাবে উত্তর দিলো।

"আপনি সিনেমায় অভিনয়ের কথা ভাবছেন?"

"পরিচালক ভানু সিংহের অর্কেস্ট্রা বইতে আমি ক্যাবারে নর্তকীর পার্ট করেছি। বীরেশ্বরবাবুই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ছবির সিলভার জুবিলী হয়েছে। আরও দুটো ছবির প্রস্তাব আমি বিবেচনা করছি—কিন্তু ক্যাবারে নর্তকীর ভূমিকায় আর নয়। আমি মার্কামারা হতে চাই না?"

এরপর আলো-আঁধারি পত্রিকার কয়েকটা মার্কামারা প্রশ্ন। "আপনি তো বম্বে এবং দিল্লীর পাঁচতারা হোটেলে অতিথি শিল্পী হিসেবে নেচেছেন। আপনি কি বম্বে ছবিতে অভিনয়ে আগ্রহী?"

"না। এখনও পর্যন্ত নয়। বঙ্গরঙ্গমঞ্চই আমার প্রথম প্রেম।"

"আপনি কি সিনেমা অথবা থিয়েটারে চুম্বনে রাজী আছেন?"

এই ধরনের প্রশ্ন অস্বস্তির উদ্রেক করে। তবু সলজ্জভাবে লিপিকা উত্তর দিলো, "চুম্বন ছাড়াও তো জীবনে আরও অনেক কিছু আছে।"

প্রশ্নকর্তা নাছোড়বান্দা। বললেন, "হ্যাঁ কিংবা না শুনতে চাই।"

"সোজাসুজি কিছুই বলতে পারবো না। ঘটনার প্রয়োজনে এবং নাটকীয় মুহূর্তের দাবিতে প্রয়োজনটা খুঁটিয়ে দেখতে হবে," দাঁত দিয়ে ডানহাতের নখ কাটতে কাটতে লিপিকা উত্তর দিলো।

"আপনার প্রথম প্রেম?"

চটপট উত্তর: "এখনও আসে নি।" সেই সঙ্গে মধুর হাসি।

"কখন আসতে পারে?"

"প্রেম কি রেলগাড়ির মতো টাইম-টেবিল ধরে আসে?"

"প্রেম এলে কী করবেন?"

"রেজিস্ট্রি ডাকে এলে আপনাকে ফোন করে জানিয়ে দেবো," অভিনেত্রীর মিষ্টি হাসি দিয়ে লিপিকা এবার বিশেষ প্রতিনিধির প্রশ্নবাণ বন্ধের চেষ্টা করলো।

বিশেষ প্রতিনিধি অনুরোধ করলেন, "আপনার জীবনের একান্ত ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের কথা কিছু বলুন। দর্শকদের ধারণা, নর্তকী, অভিনেত্রী এবং চলচ্চিত্রের উঠতি নায়িকা হিসেবে আপনি সুখের স্বর্গরাজ্যে আছেন। আপনার সামনে সাফল্যের স্বর্ণশিখর।"

মিষ্টি হেসে, রঙীন ছবির জন্যে আকর্ষণীয় পোজ দিতে দিতে লিপিকা বললো, "আপনার পাঠকদের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তাঁদের বলবেন, সত্যি আমি সুখী—সুখের জন্যেই যে আমি জন্মেছি।"

"চমৎকার! ফাস্টক্লাস একটা হেডলাইন হবে আপনার শেষ উক্তি দিয়ে। ওই কথা দিয়ে আমি লেখাও শেষ করবো," এই বলে বিশেষ প্রতিনিধি খুশী মনে বিদায় নিলেন।

"সুখের জন্যেই আমি জন্মেছি." কাগজের প্রতিনিধির কাছে নিজের কথাটাই লিপিকার কানে এখন ব্যঙ্গের মতো শোনাচ্ছে। সুখ বলে সুখ! পার্ক সার্কাসের এই আপনজনহীন বাড়িতে লিপিকা সেন মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে ওঠে। নর্তকীরাও যে সাধারণ মানুষ একথা বোধ হয় বড়লোকের অপদার্থ ছেলেদের মনে থাকে না। বড় মানিব্যাগ পকেটে থাকলে সব কিছু কেনা যায় বলে এদের বিশ্বাস। এরা যত নোংরা চিঠি পাঠায় তাতে প্রত্যহ লিপিকার একটা ডাস্টবিন বোঝাই হয়ে যায়।

লিপিকা এসব নিয়ে অযথা ভেঙে পড়ে না। সুযোগ যখন পেয়েছে তখন সাফল্যের শিখরে সে উঠবেই। বিনোদিনী, তিনকড়ি, তারাসুন্দরী ইত্যাদি অধরবাবু যেসব নাম করেন তাঁদের সমপর্যায়ে নিয়ে যাবে নিজেকে। থিয়েটারের এই জগৎকে লিপিকা নিজের অজান্তে ভালবেসে ফেলেছে। চারতারা হোটেলের ফ্লোর-শো থেকে অনেক অনেক ভাল হাতিবাগান রঙ্গালয়ের এই মঞ্চমায়া।

সানি পার্কের সায়েববাড়িতে বসে বীরেশ্বর রক্ষিত লিপিকার কথা ভাবছেন। কাগজের প্রতিনিধির ব্যাপারে সেদিন লিপিকার ফোন পেয়ে বীরেশ্বর অভিভূত। আগে জানলে তিনি নিজেই

সাক্ষাতের সময় উপস্থিত থাকতেন। কিন্তু কাগজের লোকগুলো বাইরের লোকের উপস্থিতি পছন্দ করে না। অনেকদিন আগে মধুমালতীর সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল ওরা, তখনও বিশেষ প্রতিনিধি কায়দা করে বীরেশ্বরকে এড়িয়ে গিয়েছিল।

লিপিকাকে স্মরণ করবার আগে বীরেশ্বর বাড়ির কথাই ভাবছিলেন। শ্যামা এবং খোকন। খোকনের ভাল নাম বীরেশ্বর রাখতে চেয়েছিলেন হীরক। সে কতদিন আগেকার কথা, তখন বীরেশ্বর সবে শেয়ার বাজারে ছুটো পয়সার মুখ দেখতে আরম্ভ করেছেন। শ্যামা বললো, "আমি হীরক চাই না—ও যেন পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হয়।" বীরেশ্বর রসিকতা করেছিলেন, "নির্মল নামে কাপড়-কাচা সাবান আছে।" শ্যামা অন্য সব ব্যাপারে স্বামীর বাধ্য, কিন্তু ছেলের নাম নিজের ইচ্ছে মতোই দিয়েছিল, বলেছিল, কাপড়কাচা সাবান তো খারাপ জিনিস নয়—নিজেকে নিঃশেষ করে অপরকে নির্মল করে।

বীরেশ্বর অযথা তর্ক করেন নি। নামে হীরক নাই হোক, নির্মলের জন্যে তিনি অনেক হীরে-মানিক রেখে যাবেন, বীরেশ্বর ভেবেছিলেন। কিন্তু বীরেশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোথায় কী যেন ঘটে যাচ্ছে।

আজ শেয়ার বাজার বন্ধ। কোথাকার একটা স্টক ব্রোকার মেম্বার পটল তুলেছে, অমনি নো বিজনেস। দেশটার কিস্‌সু হবে না, বিরক্ত বীরেশ্বর মনে মনে ভাবলেন।

শ্যামা আর এক কাপ ধূমায়িত চা হাতে সামনে এসে বসলো। শ্যামা আজও সুন্দরী। ওর পাতলা চামড়ার মসৃণতা আজও দেখার মত—অথচ শ্যামা কখনও প্রসাধনে সময় ব্যয় করে না। মধুমালতীর মতো টিনটিন অলিভ অয়েল ব্যবহার করতেও দেখেন না শ্যামাকে। একবার বীরেশ্বর ভেবেছিলেন, শ্যামাকে জিজ্ঞেস করবেন, "তুমি ইটালিয়ান অলিভ অয়েল ব্যবহার করো না কেন?"

কিন্তু বীরশ্বরের ভয় হয়, স্বল্পভাষিণী শ্যামা যদি হঠাৎ মুখরা হয়ে ওঠে, যদি অন্য কোনো প্রসঙ্গ তুলে প্রশ্ন করে, "কার জন্যে এসব মাথবো ?"

পাতলা আদ্দির সাধারণ ব্লাউজ পরেছে শ্যামা। শ্যামার মুখের দিকে তাকালেন বীরেশ্বর। আশ্চর্য এই মেয়ে—মলঙ্গা লেন থেকে সেই যে বিশ্বাস করে বীরেশ্বরের হাত ধরে বেরিয়ে এসেছিল, এখনও স্বামীকে বিশ্বাস করে বসে আছে। যেন যে-বীরেশ্বরকে শ্যামা বিয়ে করেছিল, সেই বীরেশ্বরই এখনও কলকাতা শহরে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে।

"শ্যামা, তুমি আমার মুখের দিকে ওইভাবে তাকিয়ে আছো কেন ? তুমি কি জানো না আমাকে অনেক ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হয়। কপর্দকহীন অবস্থা থেকে অনেক পরিশ্রমে আমাকে ব্যবসায় বড় হতে হয়েছে, এইসব বিষয়-সম্পত্তি করতে এবং রাখতে এখনও আমাকে অনেক বুদ্ধি খাটাতে হয়। শ্যামা, তোমার জানা উচিত, আমার নিজের ব্যবসায়ে মামলা-মকদ্দমা লেগেই আছে। আমাকে একদিন ছাড়াই উকিলবাড়ি ছুটতে হয়। আমার অফিসে মাইনে-করা ল' অফিসার আছে। আমি সেইজন্যেই চেয়েছিলাম বি-এ পাসের পরে খোকন আইন পড়ুক। খোকন রাজী হলো না। কোথায় তুমি তাকে বাবার কথা শুনতে বলবে, তা নয় তুমিও জিজ্ঞেস করলে, উকিল হলে তো সারাজীবন মিথ্যে কথা বলতে হয় !"

"খোকনকে কালো গাউন চড়িয়ে মক্কেলের পিছনে ছুটতে বলছে কে ? আমি শুধু চেয়েছিলাম, ওর আইনের শিক্ষাটা থাক—নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য দেখতেই কাজে লেগে যাবে।"

শ্যামা তবুও বীরেশ্বরের দলে এলো না। বীরেশ্বর বললেন, "শ্যামা, এইসব ব্যবসা-বাণিজ্য, আমি কার জন্যে করছি ? আমি কি চিরকাল এইসব ভোগ করবো ? এই বীরেশ্বর

(সিমেণ্ট) লিমিটেড, বীরেশ্বর ফিনান্স, রক্ষিত প্রপার্টিজ, এমন কি কোহিনূর থিয়েটার্স—এসব কি বীরেশ্বর মরার সময় সঙ্গে নিয়ে যাবে?"

শ্যামা এবং নির্মলের তবু কোনো আগ্রহ নেই। বীরেশ্বর অবশ্য ট্যাক্স এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে, খোকন আঠারো বছরে বয়সে পড়া মাত্রই তাকে বিভিন্ন কোম্পানির পার্টনার করে নিয়েছেন, দফে-দফে ওর নামে শেয়ার ট্রান্সফার করছেন। কিন্তু যার জন্যে এতো আয়োজন তার কোনো আগ্রহ নেই।

শ্যামাও জানে, বীরেশ্বরের এই ব্যবসা-বাণিজ্যে খোকনের একটুও আগ্রহ নেই। মা যখন বলেছিলেন, "তোর বাবার ইচ্ছে, আস্তে আস্তে তুই ব্যবসার দায়িত্ব কাঁধে নে," খোকন তখন সোজাসুজি উত্তর দিয়েছিল, "আমি ভাবতে পারি না বাকি জীবনটা আমি বীরেশ্বর (সিমেণ্টে)-এর গোডাউনে বসে পারমিট উল্টো-সিধে করছি।" শ্যামা তখন খোকনকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, "কাজকর্ম তো একটা করতে হবে।"

খোকন একবার হায়ার-সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দিয়ে রামকৃষ্ণপুর ঘাটে বীরেশ্বরের সিমেণ্ট গোলায় গিয়েছিল। সেখানে খোকন দেখলো সিমেণ্টের বস্তাগুলো কুলিরা ধড়াস ধড়াস করে মেঝেতে ফেলছে, আবার উঁচুতে তুলে রাখছে। বীরেশ্বর কুলিদের বললেন, "আবার একবার করে ফেলে তোল, হাত গুটিয়ে বসে থাকিস না।" খোকন এর কারণ জিজ্ঞেস করেছিল, বীরেশ্বর এড়িয়ে গিয়েছিলেন। ছেলেমানুষের কৌতূহল সহজে নিবৃত্ত হয় না। বীরেশ্বর যখন গোডাউনের হিসেব-নিকেশে ব্যস্ত, তখন খোকন গোডাউনের ক্লার্ক শম্ভুবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিল। শম্ভুবাবু হেসে বলেছিলেন, "ধোলাই দিয়ে আমরা সিমেণ্ট বার করে নিচ্ছি। পঞ্চাশ কেজির ব্যাগ থেকে পাঁচ কেজি বার করতে না পারলে তোমাদের পড়তায় পোষাবে কেন?"

চমকে উঠেছিল খোকন। কারণ বীরেশ্বর কদিন আগেই

রেশনের চিনি ফাঁক করার অপরাধে বাড়ির এক চাকরকে পুলিসে ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

শ্যামা বড় শান্ত। দুর্দমনীয় হর্সপাওয়ারের অধিকারী বীরেশ্বরকে সামলাবার মতো ক্ষমতা অথবা ছোট ছেলের সরল মনের প্রশ্নের জবাব দেবার বুদ্ধি কোনোটাই তার নেই।

খোকন এম এ পাস করেছে। তারপর আমেদাবাদে ইনস্টি-টিউট অফ সোস্যাল স্টাডিজ-এ ভর্তি হয়েছে। "আমেদাবাদে পড়ে শুধু শুধু কী করবি? তোর বাবা বলছিল", শ্যামা ছেলেকে প্রশ্ন করেছে।

খোকন তখন মাকে বুঝিয়েছিল, "মাত্র একটা বছর তো, দেখতে দেখতে কেটে যাবে।"

কিন্তু এখন আমেদাবাদ ছাড়বার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। প্রথম কোর্স শেষ করে আবার রিসার্চ স্কলারশিপের সুযোগ এসেছে।

এই সবের কোনো অর্থ বোঝেন না বীরেশ্বর। সামাজিক গবেষণা মানে তো পরের ব্যাপারে নিজের নাক গলানো—তাতে খোকনের বা রক্ষিত পরিবারের কী লাভ হবে?

এবার বাড়ি ফেরার পরে খোকনের সঙ্গে শ্যামার অনেক কথাবার্তা হয়েছে। একমাত্র সন্তানকে কতদিন বাইরে রাখবেন শ্যামা, কী নিয়েই বা তিনি বেঁচে থাকবেন? খোকন বলেছে, "একটুও চিন্তা কোরো না, মা। রিসার্চের অনেকটা কাজ আমাকে কলকাতায় করতে হতে পারে।"

একটু ভরসা পেয়েছিল শ্যামা। গবেষণা ব্যাপারটা কিন্তু তিনি মোটেই বোঝেন না। গবেষণার পরে খোকন কী করবে তা জানবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন তিনি। খোকন এবারে মাকে অবাক করে দিয়েছে। বীরেশ্বরের ব্যবসায়ে যোগ দেবার কোনো কথাই সে ভাবছে না। খোকন বললে, "পড়া শেষ করে কোনো

ভদ্র আপিসে চাকরি নেবো। কলকাতা থেকে অনেক দূরে কোনো এক শহরে ছোট্ট একখানা ফ্ল্যাট ভাড়া করবো। তুমি তখন গরীব ছেলের বাড়িতে এসে থাকবে তো? তোমার গাড়ি থাকবে না, ডজন ডজন চাকর-বাকর পাবে না, তোমাকে নিজেই রান্নাবান্না করতে হবে।”

খোকন গম্ভীর হয়ে থাকে। মা বুঝতে পারে, ছেলে নিজের পায়ে দাঁড়াবে—এখানকার রাজসুখ সঙ্গে করে নিয়ে যাবার ইচ্ছে তার নেই।

শ্যামা নিজেও স্বপ্ন দেখছে, একদিন যেমন দেখেছিল সারপেন-টাইন লেনে। শ্যামা এবার খোকনের মুখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করলো, “আমি একলা রাঁধবো কেন? তুই বিয়ে করবি না?”

“ওই আরম্ভ হলো!” খোকন মায়ের উৎসাহে বাধা দিলো। “দাঁড়াও, আমরা তো সবে ভবিষ্যৎ নাটকের প্রথম অঙ্কে রয়েছি। আমি কেবল একটা চাকরি পেয়েছি, অতিকষ্টে অফিস থেকে অনেক দূরে ছোট্ট এক-কামরা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছি। সেই ঘরে দু'খানা নেয়ারের খাটিয়া রয়েছে যার একটা আমার, একটা তোমার। তুমি কলকাতা থেকে এসে সংসারের দায়িত্ব নিয়েছো। আমার এখনও চাকরিতে কনফার্মেশন হয় নি।”

“সে আবার কী জিনিস?” ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করে শ্যামা। “ওসবের সঙ্গে তোর বিয়ের সম্বন্ধ কী?”

“উঃ, মা! ব্যবসা-বাণিজ্য কাজকর্ম সম্বন্ধে তুমি কিছুই খবর রাখো না। আজকালকার বড় বড় আপিসে নতুন চাকুরেদের এক বছর বাজিয়ে দেখা হয়—যে কোনো মুহূর্তে মালিক বলতে পারেন কাল থেকে এসো না। এক বছর পরে চিঠি দিয়ে চাকরি পাকা করা হয়। কনফার্মেশনের আগে কোনো মেয়ের-বাবা বিয়ের কথা তুলতেই রাজী হবে না।”

ব্যাপারটা মায়ের মোটেই মনঃপূত হলো না। সরল মনে শ্যামা ফোঁস করে উঠলো, "ইস। আমার ছেলে কি জলে ভেসে এসেছে? আজই যদি মত দিস, কাল এখানে মেয়ের বাপেরা লাইন লাগিয়ে দেবে।"

মায়ের কথার ধরন দেখে খোকন হেসে ফেলে। "সে এক বিশ্রী ব্যাপার হবে মা। লোকে ভাববে রেশন কার্ডের লাইন। শিশি বোতল টিন থলে হাতে আরও লোক এসে জড়ো হবে, শেষে পুলিস ডাকতে হবে!"

শ্যামা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে একমাত্র সন্তানের দিকে। ওর বড় বড় চোখ, তীক্ষ্ণ নাক, চওড়া কপাল, এক মাথা কোঁকড়ানো চুল শ্যামাকে বিপ্লবী বীরেশ্বরের কথা মনে করিয়ে দেয়। বিপ্লবী গণেশ মিত্রের ব্যাপারে বীরেশ্বর পুলিস হাজত থেকে বেরোবার ঠিক পরেই খোকন গর্ভে আসে। বীরেশ্বরকে পাছে পুলিসে আবার টানাটানি করে এমন একটা ভয় ছিল শ্যামার। কিন্তু সেই সঙ্গে ভীষণ ভাল লেগেছিল, পাড়ার ছেলেরা কতবার ভরসা দিয়েছিল, আপনার কোনো চিন্তা নেই, আমরা পিছনে রয়েছি। বউদি, আমরা বীরেশ্বরদার জন্যে গর্বিত।

বীরেশ্বর আজ যদি ছেলের ব্যাপারে চিন্তিত হন, তাহলে শ্যামা সঙ্গে সঙ্গে মনে করিয়ে দেবে, তোমারই ছেলে তো খোকন। তুমিও তো একদিন প্রচলিত শাসনের পাঁচিল ভেঙে ফেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলে।

ছেলেকে সামনে ডেকে সেদিন বীরেশ্বর কিছু কথাবার্তা বলেছিলেন। তারপর বীরেশ্বর সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এইসব বিষয়-আশয় দেখবার লোক পাবো কোথায়?" বাবার সামনে খোকন সোজাসুজি কোনো উত্তর দেয় নি। পরে শ্যামার মাধ্যমে বীরেশ্বর শুনেছিলেন, "ও এখনও পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চায়। আমেদাবাদ ইনস্টিটিউটে সুযোগ সবাই পায় না।"

বীরেশ্বর একবার স্ত্রীর দিকে তাকিয়েছিলেন। স্ত্রী এবং পুত্রকে এক এক সময় কেমন তাঁর সন্দেহ হয়। এদের দু'জনের মধ্যে কোনো গোপন ষড়যন্ত্রের যোগসাজশ নেই তো? এরা দুজনে একদিনও তাঁর কোহিনূর থিয়েটারে পদার্পণ করে নি। পাঁচশ রজনীর অভিনয় উৎসবে সেবার স্বয়ং রাজ্যপাল পর্যন্ত এলেন, নরহরি নিজে ফোনে শ্যামাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "বউদি, আসবেন তো? সামনের রোতে দু'খানা সীট রেখে দিই?" বউদি মিষ্টি কথায় প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়েছিল। একথা কে বিশ্বাস করবে, নাট্যকার বীরেশ্বরের স্ত্রী ও একমাত্র সন্তান কোনোদিন ভুল করেও কোহিনূর থিয়েটারে আসে নি—যে-থিয়েটারে ঢোকবার জন্যে সমস্ত দেশের ছেলে-ছোকরা ও মহিলারা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। ষড়যন্ত্র কথাটা আবার বীরেশ্বরের চোখের সামনে ভেসে উঠছে। কিন্তু ষড়যন্ত্রই যদি হবে, তা হলে শ্যামা এখনও এমন অন্ধের মতন স্বামীর ওপর নির্ভর করে বসে আছে কেন?

ষড়যন্ত্রের প্রসঙ্গে বীরেশ্বর ফিক করে হাসলেন। তিনি নিজেও সম্প্রতি এক ষড়যন্ত্রে শ্যামাকে জড়িয়েছেন। দুঃসাহসী সেই কাজটা দূরদর্শী বীরেশ্বর বেশ গোপনে সেরে ফেলেছেন। গোপন সূত্রে খবর এলো, সরকার শীঘ্রই শহুরে এবং গ্রামীণ সম্পত্তির সীমা বেঁধে দেবেন। গুজব উঠলো, স্বামী-স্ত্রীর রোজগার ও সম্পদ একত্র করে ট্যাক্স হিসেব হবে। বোকার মত হাত গুটিয়ে বসে না থেকে বিচক্ষণ বীরেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে উকিলের সঙ্গে গোপন পরামর্শ করলেন। শুনলেন, বুদ্ধিমান বড়লোকরা আইনকে ফাঁকি দেবার জন্যে কাগজে কলমে বউ-এর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে রাখছেন। বিশিষ্ট মহলে এর গোপন নাম পেপার-ডাইভোর্স।

বীরেশ্বর ভেবেছিলেন, শ্যামা কিছুতেই মত দেবে না। বীরেশ্বর রক্ষিতকে তার তো জানতে বাকি নেই। আইনের কোনো একটা ছুতো নিয়ে বউকে বিদায় করে দেওয়া বীরেশ্বরের মতো স্বামীদের

পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু বীরেশ্বরের ওপর শ্যামার কি অবিচল বিশ্বাস! শ্যামা একবার প্রশ্নও করলো না—টাইপ-করা কাগজে বীরেশ্বর যেখানে-যেখানে সই করতে বললেন, সেখানে-সেখানে শ্যামা সই করে দিলো। বীরেশ্বর একবার ভেবেছিলেন, শ্যামাকে সাবধান করে দেবেন, তুমি তোমার মৃত্যুবাণ নিজের হাতে আমার দিকে এগিয়ে দিচ্ছো। কিন্তু শ্যামার বিশ্বাস, বিয়ে স্বর্গে হয়—কাগজে-কলমে সই করে ভবিতব্যের বন্ধন আলগা করা যায় না।

চিন্তানিমগ্ন বীরেশ্বর একটু বিষম খেলেন। কেউ এই মুহূর্তে হয়তো তাঁর কথা আলোচনা করছে।

বীরেশ্বর এবার একমাত্র সন্তান নির্মলকে ডাকলেন। এই ছেলের কাছে যাবার, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করার অনেক চেষ্টা করেছেন বীরেশ্বর—কিন্তু নির্মল সবসময় একটু দূরত্ব রেখে চলে। বীরেশ্বর শুনেছেন, অনেক সংসারে বাবা এবং ছেলের মধ্যে বন্ধুর মতো সম্পর্ক থাকে। নেদো মল্লিক তো বলেনই, "প্রাপ্তেতু ষোড়শবর্ষে, বুঝলে হে বীরেশ্বর, পুত্রের সঙ্গে বন্ধুবদাচরেৎ—অর্থাৎ বন্ধুর মতো বদ আচরণ করবে। কোনো কিছু চেপে রাখবে না—নিজের বত্রিশ পাটি দাঁত দেখিয়ে দেবে!" সন্তানের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক পাতাতে বীরেশ্বরের মাঝে মাঝে যে লোভ হয় না তা নয়। কিন্তু দু'জনের মধ্যে কোথায় যেন দূরত্বের অদৃশ্য প্রাচীর গাঁথা রয়েছে। অথচ বীরেশ্বর জানেন, এই খোকনই মায়ের সঙ্গে খুব গল্প করে। দু'জনের সেই গল্পগুজব কিন্তু বীরেশ্বরকে দেখা মাত্রই বন্ধ হয়ে যায়।

শ্যামার ইচ্ছে খোকনের বিয়ে দিয়ে বাড়িতে রাঙা-টুকটুকে একটি বউ আনেন। ঘোমটা-পরা কমবয়সী একটি লাজুক মেয়ে রুপোর ঝুমুর পরে বাড়িতে ঘুরঘুর করবে, ভাবতে শ্যামার খুব ভাল লাগে। এ-ব্যাপারে বীরেশ্বরের মোটেই আপত্তি নেই—ছেলে নিজে রোজগার করবে, তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে

কেন ? কিন্তু বিয়ে, বিষয়-সম্পত্তি, ব্যবসার কাজকর্ম কোনো ব্যাপারেই খোকনের আগ্রহ নেই—সে নিজের মতেই এগিয়ে চলেছে।

একমাত্র সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে বীরেশ্বর জানতে চাইলেন, "ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কী ভাবছো ? ব্যবসার গোপন কাজগুলো শিখতে অনেক সময় লাগে খোকন।"

"আমি এখন পড়বো," নিজের সিদ্ধান্ত জানাতে খোকন এক মুহূর্ত দ্বিধা করলো না। ওর কথাবার্তায় এমন গাম্ভীর্য আছে যা বীরেশ্বরকে ভাবিয়ে তোলে, ওর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামবার সাহস হলো না বীরেশ্বরের। তিনি চুপ করে রইলেন। তাঁর হুকুম মানে না এমন একটা মানুষকে চোখের সামনে বেশীক্ষণ দেখতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু একমাত্র সন্তানকে নিয়ে তিনি কী করবেন ?

বিরক্ত বীরেশ্বর ভেবেছিলেন শ্যামাকে জিজ্ঞেস করবেন, বাপ-মায়ের হোটেলে থাকতে থাকতেই আজকালকার ছেলে-মেয়েরা কেন এতো স্বাধীন ভাব দেখায় ? কিন্তু দ্বিতীয় চিন্তায় বীরেশ্বর আর এগোন নি। কারণ বীরেশ্বর জানেন, খোকন স্কলারশিপের টাকায় পড়াশোনা করেছে। বাবার কাছ থেকে হাত-খরচের টাকা নিতেও সে বিশেষ আগ্রহ দেখায় না।

"যা ভাল বোঝো করো," এই বলে নির্মলকে বিদায় দিলেন বীরেশ্বর।

ছেলের কথা ভেবে যখন লাভ নেই, তখন অন্য কিছুতে মনোনিবেশ করা যাক, বীরেশ্বর সিদ্ধান্ত নিলেন। শ্যামার কথাও ভাবতে ইচ্ছে করে না—এক সময় শ্যামা খুব পয়মন্ত ছিল, ওর

সৌভাগ্যস্পর্শে বীরেশ্বর শেয়ার মার্কেটে অনেক টাকা লুটেছেন। কিন্তু এখন শ্যামার কোনো ভোল্টেজ নেই। শ্যামাকে চুম্বন করে শেয়ার বাজারে গিয়ে যখন লাভের অঙ্ক কমতে লাগলো তখনই তো তিনি কুসুমকুমারীর খোঁজ করেছিলেন। সেখানে সুবিধে করতে না পেরে তিনি মধুমালতীর দিকে ঝুঁকলেন।

মনের মধ্যে মধুমালতীর কথা উদয় হতেই বিজয়ী বীরেশ্বর কপাল কুঞ্চিত করলেন। গতকাল শেয়ার বাজারে দু'হাজার টাকা লোকসান দিয়েছেন বীরেশ্বর। মধুমালতীর মিষ্টি মুখ চুম্বন করে পর পর তিন দিন শেয়ার বাজারে যা খেললেন তাই হারলেন। সুন্দরী মধুমালতীর সৌভাগ্যের দিনও কি শেষ হলো? অনেক সেণ্ট ও সাবান থাকে কিছুদিন পরে যার সুগন্ধ নষ্ট হয়ে যায়, বীরেশ্বরের হঠাৎ মনে পড়লো।

বীরেশ্বর চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়ছেন। শ্যামা কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, "ভাবছো বুঝি?"

বেমালুম মিথ্যে কথা বললেন বীরেশ্বর। স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে শ্যামা বললো, "অযথা চিন্তা করে শরীর খারাপ করো না। আমি স্বপ্ন দেখেছি, ওর খুব ভাল হবে—খোকন বাপমায়ের মুখোজ্জ্বল করবে।"

বীরেশ্বর বউকে ঘাঁটালেন না। বিশ্বাসের নেশাতে শ্যামা যখন বুঁদ হয়ে আছে, তখন থাকুক। নিজের খেয়ালখুশি মতো বেপরোয়া জীবন যাপনের সুবিধে হবে বীরেশ্বরের।

বউকে সামনে বসিয়েই বীরেশ্বর এখন মধুমালতীর ভবিষ্যতের কথা ভাবছেন। থিয়েটারে সেদিন মধুমালতী আসতে পারে নি। সর্দি এবং জ্বরে গলা বসে গিয়েছিল—টেলিফোনেই বীরেশ্বর মধুমালতীর স্বর শুনতে পাচ্ছিলেন না। বৃহস্পতিবারে সাড়ে-ছটার শো। এই বিরাট হলে গলা ফাটিয়ে কথা না বলতে পারলে পিছনের সারির লোকরা শুনতে পাবে না, সঙ্গে সঙ্গে গোলমাল

গুরু হয়ে যাবে। মধুমালতীকে বিশ্রাম নিতে বললেন বীরেশ্বর। "আপনার টাকার ক্ষতি হবে," মধুমালতী উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। হয় হোক, বীরেশ্বর অভয় দিয়েছিলেন।

শো আরম্ভ হবার আগে মাইকে অধর চাটুজ্যের কণ্ঠ শোনা গেলো। "আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, শারীরিক অসুস্থতার জন্য মধুমালতী দেবী আজ অনুপস্থিত। নায়িকার ভূমিকায় তাঁর জায়গায় অভিনয় করবেন শ্রীমতী অলকা ধর। যাঁরা থিয়েটার না দেখে টাকা ফেরত নিতে চান তাঁরা অনুগ্রহ করে বুকিং অফিসে আসুন।"

দু' বছর আগে এমনই এক ঘোষণার পর রঙ্গালয় অর্ধেক খালি হয়ে গিয়েছিল। বীরেশ্বর নিজের কানে দর্শকদের মন্তব্য শুনেছেন, "মধুমালতীই যখন নেই তখন পয়সা জলে ফেলে লাভ কী?" এবার আশ্চর্য ব্যাপার। অধরের ঘোষণায় মৃদু গুঞ্জন পর্যন্ত উঠলো না। বুকিং অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে বীরেশ্বর দেখলেন, দুটি মহিলা শুধু টিকিট রিফাণ্ড নিলেন। নরহরি পাশে দাঁড়িয়েছিল। বললে, "এদের আমি জানি—অফিস পাড়ায় শখের থিয়েটারে স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয় করে—তিন চারদিন ধরে মধুমালতীর কাজ মুখস্থ করছে।"

তাহলে? অভিনেত্রী মধুমালতী সম্বন্ধেও একটা চাপা সন্দেহ বীরেশ্বরের মনে উঁকি মারছে। নরহরিকে বীরেশ্বর বলে দিয়েছেন খবরটা গোপন রাখতে। গ্রীনরুমে গুজব ছড়াতে পঞ্চাশখানা টিকিটের টাকা ফেরত হয়েছে। নরহরি ভেবেছে নিশ্চয়, যাঁর জন্যে এই থিয়েটার সেই মধুমালতীদির মনে সায়েব কষ্ট দিতে চান না। কিন্তু সায়েবকে বুঝতে হলে নরহরি ব্যানার্জিকে আর একবার মাতৃগর্ভ ঘুরে আসতে হবে। বীরেশ্বর চান না খবরটা লিপিকার কানে যাক—চড়া দাম হাঁকবার আগেই পরের বইতে তিনি লিপিকাকে সই করাবেন।

ড্রাইভার দুঃখহরণকে গ্যারেজ থেকে জলদি গাড়ি বার করতে বললেন বীরেশ্বর।

গাড়ি চালাতে চালাতে রিয়ারভিউ মিররে দুঃখহরণ দেখলো সায়েব নিজের মনেই ফিক ফিক করে হাসছেন। দুঃখহরণের ধারণা, সায়েব নিজে থিয়েটারের নাটকগুলো লেখেন। কোনো হাসির সীন হয়তো সায়েবের মাথায় এসেছে, দুঃখহরণ আন্দাজ করলো।

সায়েব হাসছেন অন্য কারণে। যে-নাটক এখনও লেখা শেষ হয় নি, সেই নাটকের স্ত্রী ভূমিকায় লিপিকাকে সাইন করাতে চলেছেন বীরেশ্বর। নিজের অফিসে গিয়ে বীরেশ্বর একটা চুক্তি-পত্রের ফর্ম বার করলেন। সোজা ছুটলেন অ্যাটর্নি বাড়িতে কনট্রাক্ট সম্বন্ধে গোপন আলোচনার জন্যে। স্ট্যাম্প-পেপারে ওখানেই দু' কপি দলিল টাইপ করালেন বীরেশ্বর। শুধু নায়িকার নামটা খালি রইলো—বীরেশ্বর চান না অ্যাটর্নি অফিসেরও কেউ জানুক কার সঙ্গে তিনি চুক্তিপত্র সই করছেন।

তারপর দুঃখহরণকে বীরেশ্বর বললেন, "চলো, পার্ক সার্কাস ময়দান।"

দুঃখহরণ বললো, "স্যর, যদি অপরাধ না নেন।"

বীরেশ্বর দেখলেন, সেই বদলী ড্রাইভার পরশুরাম পাত্র হেস্টিংস স্ট্রীটের ফুটপাথে মাথা নিচু করে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। দুঃখহরণ বললো, "স্যর, ওর যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। জিভ দিয়ে জুতো চাটতে বললেও ও এখন চাটবে। খেতে পাচ্ছে না, স্যর।

আপনার সঙ্গে ওই ঘটনার পরে চাকরিও পাচ্ছে না। আমার কাছে কান্নাকাটি করছে।"

বীরেশ্বর আড়চোখে দেখলেন পরশুরাম পাত্রকে। পরশুরাম এসে পা জড়িয়ে ধরলো বীরেশ্বরের। পা ছাড়িয়ে নিয়ে বীরেশ্বর বললেন, "মানুষের ক্ষতি করা আমার স্বভাব নয়।"

দুঃখহরণ চোটপাট করলো, "শালা, তুই মানুষ চিনিস না? বিশ্বাস করে তোকে বদলী দিয়ে গেলাম, আর তুই আমার সায়েবের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলি।"

বীরেশ্বর পকেট থেকে একটা টাকা বার করে শতচ্ছিন্ন জামা-কাপড় পরা লোকটার হাতে দিলেন। দুঃখহরণ বললো, "দেখ দেখ শালা। মানুষ নয়, দেবতা।"

লোকটা হাউ-হাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে বললো, "আমি খেতে পাচ্ছি না, স্যার।"

দুঃখহরণ গাড়ি ছেড়ে দিলো। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বীরেশ্বর বললেন, "কয়েকদিন পরে আমার সঙ্গে দেখা করিস।"

বিনা নোটিসে বীরেশ্বরকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে গেলো লিপিকা। বীরেশ্বর মিষ্টি হেসে বললেন, "কাগজের প্রতিনিধি তো তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।"

"আপনি আমায় সাহায্য না-করলে তো আমি থিয়েটারে উঠতে পারতাম না," লিপিকা তার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো।

বীরেশ্বর হেসে বললেন, "এই তো শুরু। তোমাকেই বলছি। পরের নাটকে তোমার মস্ত সুযোগ। একই সঙ্গে ডবল রোল করবে। দুই বোনের এক বোন চঞ্চল প্রজাপতি আর এক বোন সিরিয়াস।"

বীরেশ্বর বললেন, "বর্তমান বই 'কালের কালিমা' আর একশ' নাইট সহজেই চলতে পারে। কিন্তু আমি তোমাকে আরও সুযোগ দেবার জন্যে এখনই শো শেষ করে দেবো।"

নৃত্যপটীয়সী লিপিকার সুশাসিত দেহখানি চোখের আগুনে লেহন করে বীরেশ্বর কনট্রাক্টের টাইপ-করা কাগজ লিপিকার দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। অনেক কিছু লেখা আছে সেখানে। নিজের পকেট থেকে সোনার কলম এগিয়ে দিয়ে বীরেশ্বর বললেন, "বঙ্গরঙ্গমঞ্চে এই প্রথম দুই নায়িকার সমান মাইনে হবে—তোমার এবং মধুমালতীর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না। তোমার কৃতিত্ব অনেক বেশী—একযুগের ওপর অভিনয় করে মধুমালতী যেখানে উঠেছে, তুমি মাত্র ক'দিনেই সেখানে উঠে গেলে।"

বীরেশ্বর ভেবেছিলেন খবরটা শুনে লিপিকার মুখে হাসি ফুটে উঠবে। কিন্তু তাকে গম্ভীর দেখে বীরেশ্বর চোখ টিপে ফিসফিস করে বললেন, "আর একটা সুখবর তোমাকে কিন্তু সম্পূর্ণ চেপে রাখতে হবে। তুমি এবং আমি ছাড়া দু'নয়ার কেউ তা জানতে পারবে না। বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এটাও প্রথম—আমার কাছ থেকে তুমি একখানা নতুন মোটর গাড়ি পাবে, লিপিকা। স্বয়ং গিরিশবাবুও এই ধরনের বোনাস পান নি। কিন্তু তোমার সম্ভাবনা দেখে আমি মুগ্ধ। তোমার মধ্যে যা কিছু সেরা তা আমি বিকশিত দেখতে চাই লিপিকা। গাড়ি সম্বন্ধে থিয়েটারের কেউ জিজ্ঞেস করলে, তুমি স্রেফ বলবে নিজেই কিনেছো।"

অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে লিপিকার চোখ দুটো এবার ছলছল করে উঠেছিল। লিপিকার ধারণা ছিল, মধুমালতী ছাড়া বীরেশ্বর আর কারুর কথা ভাবতে রাজী নন। লিপিকা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কেমন তাও জানতো না সে। চিরকাল ক্যাবারে নর্তকীর বস্ত্র-বিনাশ নৃত্যে ব্যস্ত থাকতে চায় না লিপিকা। সেই জন্যেই সেদিন গোপনে বীরেশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল লিপিকা। ভেবেছিল মুখোমুখি বীরেশ্বরকে জিজ্ঞেস করবে, পরবর্তী নাটকে তাকে আরও কিছু সুযোগ দেওয়া সম্ভব কিনা। সেদিন দেখা না-করেই চলে আসতে হয়েছিল। আজ অযাচিত সৌভাগ্যের

উপহার নিয়ে বীরেশ্বর নিজেই তার বাড়িতে এসেছেন। লিপিকা আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললো, "গাড়ি—এ যে আমার স্বপ্নেরও অতীত মিস্টার রক্ষিত।"

মিষ্টি হেসে কাছে সরে এসে লিপিকার দেহনিসৃত সুগন্ধী সেণ্টের ঘ্রাণ নিতে নিতে বীরেশ্বর বললেন, "অবুঝ হয়ো না লিপিকা। তুমি সুন্দরী অভিনেত্রী—সারাক্ষণ ট্যাক্সিতে ঘোরাঘুরি করলে ভাল দেখায় না। তাছাড়া, আজকাল তুমি প্রাইভেট শো দিতে দূরে দূরে যাও, রাতবেরাতে বাড়ি ফেরো, গাড়িটা তোমার প্রয়োজন লিপিকা।"

নতুন বই আরম্ভ হবার প্রথম রাতেই বীরেশ্বর গাড়িটা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন লিপিকাকে। ড্রাইভার পরশুরাম পাত্র মেমসাহেবকে সেলাম করে বলেছিল, "কাল তাহলে কখন আসবো দিদিমণি ?"

পরের দিন ভোরেই পরশুরামের হাতে লিপিকা ছোট্ট একটা চিঠি পাঠিয়েছিল বীরেশ্বরকে। নীল কাগজে লেখা অন্তরঙ্গ সেই পত্র পড়ে বীরেশ্বরের রক্তে হঠাৎ আগুন ধরে গেলো। লিপিকা লিখেছে, "গতরাত কিছুতেই ঘুম আসছিল না—আপনার উপহার আমাকে অভিভূত করেছে। আপনার এই বিশ্বাসের যোগ্য হতে পারবো তো ? ইতি লিপিকা।"

শেয়ারবাজারে যাবার পথে লিপিকার চিঠিটা পকেট থেকে বার করে বীরেশ্বর বেশ কয়েকবার পড়লেন। ঘড়ির দিকে তাকালেন বীরেশ্বর। গাড়ি তখন এসপ্ল্যানেডে-মেয়ো রোডের মুখে চলে এসেছে। বীরেশ্বর হঠাৎ বললেন, "দুঃখহরণ গাড়ি ঘোরাও।"

"কোথায় হুজুর ?"

"পার্ক সার্কাস ময়দান", গম্ভীরভাবে হুকুম করলেন বীরেশ্বর। নতুন এক নাটকের অসহনীয় সাসপেন্সে দুলছেন বীরেশ্বর রক্ষিত।

লিপিকা সেনের বাড়ির সামনে সায়েবকে নামিয়ে দিয়ে একটা গাছের ছায়ায় দুঃখহরণ গাড়ি পার্ক করেছিল। দুঃখহরণ জানে এক এক জায়গায় ঢুকলে সায়েব কখন বেরোবেন ঠিক থাকে না। কেষ্টদাস কুণ্ডু স্ট্রীটে দুঃখহরণ কখনও কখনও সমস্ত রাত গাড়ির মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছে। সায়েব হয়তো চলে যেতে বলতে ভুলে গেছেন। কিন্তু ফ্ল্যাটে গিয়ে বেল বাজিয়ে সায়েবকে জ্বালাতন করতে সাহস হয় নি দুঃখহরণের। সায়েব অবশ্য এসব ক্ষেত্রে মোটা বকশিশ করেন। নরহরিকে ডেকে বলে দেন, "দুঃখহরণকে স্পেশাল ভাউচারে পনেরো টাকা দিয়ো তো।"

দুঃখহরণ অবাক। সায়েব দশ মিনিট পরেই বেরিয়ে এলেন। দুঃখহরণের মনে হলো সায়েবের চোখ দিয়ে পেট্রোলের লাল আগুন বেরিয়ে আসছে। সায়েবের মুখে এমন রাগের চিহ্ন সে কখনও দেখে নি। সায়েব যেন টগবগ করে ফুটছেন। তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলে দিলো দুঃখহরণ।

সায়েব গম্ভীরভাবে বললেন, "লায়ন্স রেঞ্জ।"

লায়ন্স রেঞ্জের ফাটকা খেলায় প্রচুর হেরেছেন বীরেশ্বর। আজ যে তিনি লোকসান খাবেন তা বীরেশ্বর জানতেন।

সেখান থেকে বেরিয়ে বীরেশ্বর সিমেণ্ট কোম্পানির আপিসে

গেলেন। আজ থিয়েটার নেই। তাই কাজকর্ম সেরে বীরেশ্বর সোজা চললেন নেদো মল্লিকের সান্ধ্য আসরে।

আধ-বোতল হুইস্কি সামনে বসিয়ে নিঃসঙ্গ নেদো মল্লিক ইতিমধ্যেই আহ্নিকে বসে গিয়েছেন। কারুর ওপর নির্ভর না করে, কারুর কাছে প্রত্যাশী না হয়ে, নিজের আনন্দে একা থাকবার বিরল ক্ষমতা নেদো মল্লিক বহু সাধনায় আয়ত্ত করেছেন। কেউ না এলেও তাঁর চলে যায়, আবার বীরেশ্বরকে দেখেও তাঁর কম আনন্দ হলো না। বীরেশ্বরকে স্বাগত জানিয়ে নেদো বললেন, "এসো ব্রাদার, এসো। মুখে যেন মেঘ দেখছি? বাজারে আজ গোঁত খেয়েছো মনে হচ্ছে।"

"ওপরে ওঠবার আগে ঘুড়ি অনেক সময় নিচের দিকে গোঁত খায়, নাহুদা," বীরেশ্বর গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন।

চোখ বড়ো-বড়ো করে নদিয়াচাঁদ মল্লিক বললেন, "তেজী-মন্দা, কিনু-বেচু একসময় অনেক খেলেছি—তারপর সব ভুলে গিয়েছি। এখন তুমি যদি আমাকে আয়রন, গেস্টকীন, কিংবা ডানলপের ক্লোজিং দর জিজ্ঞেস করো বলতে পারবো না। মার্কেট থেকে টু-পাইস কামিয়ে আমি ও-লাইন থেকে সরে গিয়েছি। বীরেশ্বর, তুমি তো থামতে শিখলে না—একই কয়লার উনুনে একের পর এক লোহার ইস্তিরী চড়িয়ে চলেছো। বলি, জীবনটা ভোগ করবে কবে?"

বীরেশ্বর নিশ্চিন্তভাবে উত্তর দিলেন, "ভোগের জন্যেই তো আমার জন্ম, নেদোদা।"

একটু আশ্চর্য হয়ে নেদো বললেন, "তুমি যে ক্যাবারে-নর্তকী লিপিকার মতো কথা বলছো, বীরেশ্বর। সচিত্র আলো-আঁধারি পত্রিকায় লিপিকা বলেছে, সুখের জন্যেই তার জন্ম।"

অনেকদিন পরে বীরেশ্বরকে নিজের দিকে একটা মদের গেলাস টেনে নিতে দেখে নেদো মল্লিক অবাক হয়ে গেলেন। চাকরকে

ডেকে বললেন, "সনাতন, ফ্রিজ থেকে আর একটু বরফ বার করো।"

বীরেশ্বরের গেলাসে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে দিয়ে সহাস্য নেদো বললেন, "খুব সীরিয়স কিছু ঘটেছে মনে হচ্ছে।"

পকেট থেকে লিপিকার কনট্রাক্ট বার করে বীরেশ্বর বললেন, "দলিলটার তুমি সাক্ষী হয়ে থাকো।"

নেদো মল্লিক বললেন, "সেই সারপেনটাইন লেন থেকে সব ব্যাপারে তুমি আমাকে সাক্ষী করে রাখছো, বীরেশ্বর। কি এক দাসীর কাছ থেকে হাতিবাগানের থিয়েটার-বাড়ির জমি কিনলে তখনও আমাকে সাক্ষী রাখলে। সেবাদাসী মধুমালতীর সঙ্গে চুক্তিপত্রও সেবারে আমাকে উইটনেস করতে বললে।"

বীরেশ্বর হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিয়ে বললেন, "তুমিই তো নাটের গুরু, নাদুদা। পরেশবাবুর চায়ের দোকানে কেনই যে তোমার সঙ্গে আমার শুভদৃষ্টি হলো। তুমিই আমাকে ঠেলে পাঠালে।"

হা-হা করে হাসলেন নেদো। "আমি শুধু তোমার ভাগ্যের উনুনটা উস্কে দিয়েছিলুম। তারপর তুমি নিজের কেরামতিতে টকাটক ওপরে উঠে যাচ্ছো, বীরেশ্বর। জেল থেকে শেয়ারবাজার, শেয়ার থেকে সিমেন্ট কোম্পানি, সিমেন্ট থেকে লিজের ব্যবসা। লিজ থেকে মধুমালতী," এই বলে বীরেশ্বরের দিকে আড়চোখে তাকালেন নেদো।

বীরেশ্বর কোনোরকম লজ্জা না-পেয়ে বললেন, "তুমিই তো আমার ভাগ্যরথের ড্রাইভার! সব জায়গাতেই তুমি আমাকে নিয়ে গিয়েছো। যদি গাঁটের পয়সা খরচ করে তুমি আমাকে কোহিনূর থিয়েটারে রাজা-রাণী নাটক দেখাতে না নিয়ে যেতে তাহলে আজ রিভলভিং স্টেজে এমনভাবে ঘুরপাক খেতাম না।"

নেদো মল্লিক আড়চোখে একবার লিপিকার চুক্তিপত্র দেখে

নিলেন, তারপর কাগজের বাঁদিকে সাক্ষীর সই লাগিয়ে মুচকি হাসলেন। "রাজনটী রাগমালা পর্যন্ত আমার দায়িত্ব স্বীকার করছি। কিন্তু ব্রাদার, নাটকের নতুন অঙ্ক শুরু হচ্ছে মনে হচ্ছে!"

চতুর বীরেশ্বর লিপিকা প্রসঙ্গ এড়িয়ে বললেন, "নতুন দর্শকদের টানতে হলে নতুন নতুন নাটক, নতুন নতুন নায়ক-নায়িকা তো চাই, নাড়ুদা।"

"নেদো মল্লিক তো এতো সহজে সন্তুষ্ট হবে না, ব্রাদার। হাঁউ মাউ খাঁউ, মেয়েমানুষের গন্ধ পাঁউ।"

বীরেশ্বর এবার জিজ্ঞেস করলেন, "ফার্স্ট নাইটের অভিনয় কেমন লাগলো?"

"অধর আমাকে বোঝায়, ফার্স্ট নাইটের অভিনয় নাকি কখনও ভাল হয় না। অ্যাকটরদের মনের মধ্যে কোথায় চাপা ভয় থাকে। কিন্তু আমার তো বেশ লাগলো। লিপিকাকে তুমি অনেক সুযোগ দিয়েছো। নর্তকীকে তুমি অভিনেত্রী না-করে ছাড়বে না!"

"চলবে?" বীরেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন।

"ওই যে ডিসকোথেকের সীনটা লাগিয়েছো—সাইকেডেলিক ক্লাবের ফ্লেমিঙ্গো না কি নাম দিয়েছো, ওতেই ফাটাবে। ইয়ং ছেলেরা সেবারের মতো আবার তোমার ওখানে হাঙ্গামা না বাধায়," সন্দেহ প্রকাশ করলেন নেদো মল্লিক।

এক গাল হেসে বীরেশ্বর বললেন, "আমি তো চাই ছোঁড়ারা প্রথমে এসে একটু গোলমাল করুক। তাতে পাবলিসিটি ভাল হবে। তারপর নরহরি ঠিক ওদের ম্যানেজ করবে।"

"সত্যি তোমার জুড়ি নেই বীরেশ্বর," বললেন নেদো মল্লিক। "আমার এক এক সময় লোভ হয়, কোহিনূর থিয়েটারে অভিনয়ার্থে তোমার এবং আমার জীবন নিয়ে একটা নাটক লিখে ফেলি। মধুমালতী পর্যন্ত তরতর করে চলে আসে দৃশ্যগুলো।

তারপরেই কিন্তু আমার মাথা গুলিয়ে যায়। নাটকটার শেষ আমি ভাবতে পারি না।"

বীরেশ্বর আর একটু মদ খেয়ে মিটমিট করে হাসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কীভাবে শেষ করতে চাও?"

নেদো মল্লিক বললেন, "আমার তো কাজকর্ম নেই, বসে বসে শুধু ভাবি। তোমার কোহিনূরে বার বার গিয়ে আমিও নাটকের অনেক কায়দা শিখে ফেলেছি। আমি প্রত্যেকবারই ভাবি, শেষটায় দেখাবো—তারপর বীরেশ্বর স্বনির্বাচিত নারী-সান্নিধ্যে সুখে দিনযাপন করতে লাগলো। কিন্তু ঠিক সেই সময় নতুন ঘটনা ঘটে যায়। এবার লিপিকা হাজির হলো। একটা ছোট্ট পাখি কানে কানে বলে গেলো লিপিকাকে তুমি মূল্যবান উপহার দিচ্ছো, তোমার বিজয় তালিকায় নাকি লিপিকার নামও লেখা রয়েছে!"

বীরেশ্বর চোয়াল চেপে ধরলেন। নেদো জিজ্ঞেস করলেন, "কী হলো? তোমাকে চোয়াল চেপে ধরতে দেখলেই আমার চিন্তা হয়—আবার কী ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসছো কে জানে?"

বীরেশ্বর আজকের সকালের দৃশ্যটা এক-ঝলকে দেখতে পেলেন। পার্ক সার্কাসের বাড়িতে বিমুগ্ধ বীরেশ্বর আজ কিছুই চেপে রাখেন নি। গতরাত্রে বিনিদ্র লিপিকা নিজেই খুব নরম হয়ে রয়েছে এই ভেবে নির্দ্বিধায় মনের গোপন ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ভিতরের তাচ্ছিল্য চেপে রেখে লিপিকা শান্তভাবে তাঁকে বিদায় করেছে। কোনোরকম দুর্বলতা না-দেখিয়ে বলেছে, "আপনার থিয়েটারে আমি কাজ করি, বীরেশ্বরবাবু। যখন-তখন এইভাবে আমার বাড়িতে চলে এলে আপনার এবং আমার দুজনেরই সুনামের ক্ষতি।" লিপিকা তারপরে ভিতরের ঘরে চলে গিয়েছিল। বীরেশ্বরের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করে নি।

সামান্য এক নাট্য-নর্তকীর কাছে মহাপরাক্রমশালী বীরেশ্বর

এইভাবে কখনও প্রত্যাখ্যাত হন নি। প্রত্যাখ্যান মানেই তো অপমান। এবং বীরেশ্বরকে অপমান করে কেউ কখনও ছাড়া পেয়েছে?

"কী ভাবছো, বীরেশ্বর?" নেদো জিজ্ঞেস করলেন।

"লিপিকার বড় বাড় বেড়েছে," বীরেশ্বর বলে ফেললেন। এই এক জায়গায় তিনি কিছু চেপে রাখেন না।

গেলাসে মদ ঢেলে নেদো বললেন, "সামান্য ব্যাপার নিয়ে এতো ভাবনা কেন? দাও না দূর করে তোমার থিয়েটার থেকে। এতো সুনাম, এতো বক্স অফিস সব ফুটো বেলুনের মতো চুপসে যাবে।"

নেদোর দিকে তাকিয়ে আছেন বীরেশ্বর। নেদো বললেন, "আউট অফ সাইট আউট অফ মাইণ্ড। অমন যে অমন বিনোদিনী, স্টার থিয়েটারের কর্তাদের সঙ্গে ঝগড়া করে মধ্যযৌবনে সে থিয়েটার ছেড়ে দিলো। কিন্তু কী লাভ হলো? ক' বছরের মধ্যে সবাই বিনোদিনীকে ভুলে গেলো। ১৮৮৬ সালে থিয়েটার ছেড়ে সে যে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত বেঁচেছিল লোকে তাও জানতো না। দ্বিতীয়বার অবশ্য বিনোদিনী ফেমাস হলো মৃত্যুর পরে। ভাগ্যে পতিতার পদস্খলনের ব্যাপারটা অমন খেলিয়ে নিজের আত্মজীবনীতে লিখে গিয়েছিল।"

বীরেশ্বর বললেন, "অত সহজে এই ছুঁড়িকে শিক্ষা দেওয়া যাবে না। আমি তাড়ালেই অন্য থিয়েটার ওকে লুফে নেবার জন্যে উঁচিয়ে আছে। তাছাড়া আমার আবিষ্কারের ওপর সিনেমার লোকদের নজর পড়েছে।" হা-হা করে হাসছেন বীরেশ্বর।

"কী হলো? এখানেই যে থিয়েটার আরম্ভ হলো", নেদো মল্লিক মন্তব্য করলেন।

বীরেশ্বর বললেন, "নাতুদা, সে-গুড়ে বালি দিয়েছি। যদ্দিন আমার এই থিয়েটার চলবে ততদিন আমার অনুমতি ছাড়া লিপিকা দেবী কোনো সিনেমায় নামতে পারবেন না।"

"বলো কি? এই শর্ত ঢুকিয়েছো? এবং লিপিকা তাতে সই করলো?" নেদো অবাক হয়ে গেলেন।

"তখন যে ওপরে ওঠবার আগ্রহ। নতুন গাড়ির লোভে টাইপ-করা কাগজগুলো না-পড়েই সই করে দিয়েছে। তাছাড়া মেয়েমানুষ তো—ইংরিজীর অত মারপ্যাঁচ বোঝে না।" নিজের কীর্তিতে তুষ্ট বীরেশ্বর বললেন, "তুমি তো আমার ওকালতী বুদ্ধির প্রশংসা করলে না, নাহুদা।"

হাত জোড় করে বীরেশ্বরকে নমস্কার করলেন নেদো। "আইন পাস করে উকিল হলে, লর্ড সিনহার মতো তুমি লর্ড রক্ষিত হতে পারতে।"

"কী যে বলো, নাহুদা", প্রায় বেসামাল বীরেশ্বর খুশী হয়ে লজ্জা প্রকাশ করলেন।

"একটুও বাড়িয়ে বলি নি ভাই। কালো গাউন না-চাপিয়েও তোমার লর্ড হতে বাকি কী? তিন-তিনটে সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মেয়েমানুষের কাছে তুমি সম্রাট হয়ে আছো", নেদো মল্লিক নাটকীয়ভাবে বীরেশ্বরকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন।

কোহিনূর থিয়েটারে আজ হাউস ফুল। দু-একজন লোক এক্সট্রা চেয়ারের জন্যে বুকিং-আপিসে কাকুতি মিনতি করছে। বীরেশ্বর অবাক হয়ে দেখছেন। গাঁটের পয়সা খরচ করে এই চটা-ওঠা ভিজে নোংরা অন্ধকার হলে কীসের আকর্ষণে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসে বীরেশ্বর নিজেই এক এক সময় বুঝতে পারেন না। টয়লেট থেকে আজ তীব্র দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, তবুও

দর্শকদের বিরক্তি নেই। তারা থিয়েটার না-দেখে বাড়ি ফিরবে না।

বৃহস্পতি, শনি ও রবিবারের চারটে শোতে রঙ্গালয় বোঝাই করতে চার হাজার লোকের প্রয়োজন। ছুটির দিনে কোহিনূরে বাড়তি দুটো শো। সব শোতেই এখন দর্শক উপচে পড়ছে। গিরিশ ঘোষের নিজের হাতে লেখা 'হাউস ফুল' বোর্ডটা নরহরি অনেক আগেই টাঙিয়ে দিয়েছে।

বীরেশ্বর ভেবেছিলেন, লিপিকা হয়তো সেদিনের ঘটনার পরে থিয়েটারে আসবে না। লিপিকা এসেছিল কিন্তু শেষ মুহূর্তে।

নরহরি এবং অধর দুজনেই তখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আয়রন সেফে কত টাকা আছে তাও খোঁজ নিয়েছে তারা। থিয়েটারে এই মুশকিল—খেলা খতম না-হওয়া পর্যন্ত পয়সা হজমের কোনো উপায় নেই। টিকিটের কড়ি ফেরত দেবার জন্যে সব সময় রেডি থাকতে হয়। তার মানে এক টাকা-দু টাকার খুচরো নোটে এবং আধুলি সিকিতে সাত-আট হাজার টাকা সব সময় তৈরি রাখো। টাকা ফেরত নেবার সময় পাবলিকের মেজাজ আবার সপ্তমে চড়ে থাকে, একটুও দেরি সহ্য হয় না।

নরহরি বলেছে, "এবারে স্যার লিপিকা দেবীর দু নম্বর একটা তৈরি রাখা যাক।"

বীরেশ্বর আপত্তি করেন নি। বলেছেন, "খোঁজখবর করো। সাত-আটশ' টাকার মধ্যে যদি কাউকে পাও ভাল হয়। খরচ কীভাবে বাড়ছে দেখছো তো?" নরহরি বলেছিল, "এ-বইতে টিকিটের দাম আরও বাড়াতে পারেন, স্যার। শুধু পেছনের দুটো রো দেড় টাকায় কনট্রোল দরে রেখে যাবেন স্যার—কলকাতার ছোঁড়াগুলোর ট্যাঁকে পয়সা নেই, অথচ ক্যাবারে নাচ দেখবার শখ আছে।"

বীরেশ্বর বললেন, "নরহরি, তোমার এখনও বুদ্ধি হলো না।

কখনও দাম বাড়ানোর কথা মুখে আনবে না। সব সময় বলবে, পুনর্বিন্যাস। আগে ফার্স্ট ক্লাস বলতে প্রথম রো বোঝতো, এখন আমরা তার জায়গায় প্রথম পাঁচটা রোয়ের দাম এক করে দিয়েছি। পাঁচ টাকার টিকিট আগে হলের মাঝখানে ছিল, এখন ওই টিকিটগুলো ঠেলতে ঠেলতে হলের শেষের দিকে করে দিয়েছি। এইভাবে মাছের তেলে মাছ ভাজতে হয়—টিকিটের দামও বাড়লো না, অথচ তোমার টোটাল কালেকশন বেড়ে গেলো।"

বীরেশ্বর এবার মন্থরগতিতে হলের চারদিক ঘুরলেন। এই ঐতিহাসিক ভবনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তিনি নিজে কনট্রোল করছেন ভাবতে বেশ রোমাঞ্চ লাগে।

বীরেশ্বর এবার নিজের ঘরে এসে বসলেন এবং সাউণ্ডবক্সের বোতাম টিপে দিলেন। প্রেক্ষাগৃহের প্রবল হাততালির শব্দ ভেসে আসছে, সেই সঙ্গে চপলা নর্তকীর চটুল পদধ্বনি। লিপিকা এখন তাহলে নর্তকী নলিনীর ভূমিকায় অভিনয় করছে। আবার হাততালি পড়লো: লিপিকা তাহলে দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করতে পারছে।

অধর চাটুজ্যে এবার ঘরের মধ্যে উঁকি মারলো। অধরকে বসতে বললেন বীরেশ্বর। অধর বললো, "স্যার, এই 'আমীর ও উর্বশী' নাটক আমার জীবনের স্মরণীয় কাজ হয়ে থাকবে।" ভুল বুঝতে পেরে জিভ কেটে অধর বললো, "স্যরি স্যার, মানে আপনার জীবনে।"

"শুধু শুধু কি নাম হয়। এই নাটকে কত অদ্ভুত জিনিস রয়েছে। লিপিকার অভিনয়, ওর সাইকেডেলিক নৃত্য। আবার হিরোর আলট্রা-মডার্ন প্রেম।"

বীরেশ্বর হেসে জানতে চাইলেন, "পাবলিক কী বলছে?"

অধর বললো, "অমর দত্ত বলতেন, সেই নাটকই আসল নাটক

গার মধ্যে মানুষ যা চায় তাই পায়। আমীর ও উর্বশী দেখুন। একদল লোক রক্ত-তাতানো নাচগান হৈ-হুল্লোড় চাইছে—তারা তা ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা পাচ্ছে। একদল নিজের চোখে কম-বয়সী ছেলেমেয়েদের বোম্বাই মার্কা প্রেম দেখতে চায়—তারা লিপিকার জামাকাপড়, অঙ্গভঙ্গী দেখে খুব খুশী। আর একদল চাইছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জয় হোক—তারা উর্বশী নলিনীর সঙ্গে বিজনেস ম্যাগনেট গণপতির সম্পর্কটা মন দিয়ে স্টাডি করছে। ভিলেনের ভূমিকায় ধীরেন হালদারের যা অভিনয়। নলিনীর প্রতি তার অনুরাগটা বোঝাতে গিয়ে দর্শককে কখনও হাসাচ্ছে কখনও রাগাচ্ছে। আদর্শবাদী ছেলে-ছোকরারা তো রেগেমেগে চিৎকার করছে, 'নলিনী তুমি গণপতিকে চটি খুলে মারো।' পাবলিক চাইছে, শেষ পর্যন্ত নর্তকী নলিনী ওই গণপতির অক্টোপাশ বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসুক।"

বীরেশ্বর মিটমিট করে হাসতে হাসতে অধরের দিকে তাকালেন। অধর বললো, "নোংরা নারীমাংসলোলুপতার পাশাপাশি রয়েছে পবিত্র প্রেম—নায়ক শুভময়ের সঙ্গে প্রেমের ত্রিভুজ। এই শুভময়কে চাইছে উর্বশী নলিনী এবং তার জমজ বোন মালিনী। দু'জনে একরকম দেখতে। অথচ দু'জনের স্বভাবে কত পার্থক্য। প্রেমের দৃশ্যে নবাগত শরৎকুমারকে নিয়ে আমরা খুব ভাল করেছি। কত ছেলে-মেয়ে স্রেফ প্রেম করা শেখবার জন্যে এই দৃশ্য দেখতে আসছে তার ঠিক নেই।"

বীরেশ্বর বললেন, "হুঁ।"

অধর বললো, "সত্যি কথা বলতে কি দু'জনকে খুব মানিয়েছে। লিপিকা এবং শরৎকুমারকে দেখে পাবলিকের মনে হচ্ছে—মেড ফর ইচ আদার।"

অধর এর পর মধুমালতীর কথা তুললো। "এই নাটকের 'আমীর' বিজনেস ম্যাগনেট গণপতির স্ত্রী হিসেবে সবাই ওর

জন্যে দুঃখিত। ওর অভিনয়ে সর্বত্র বিষণ্ণতা ফুটে উঠছে। তবে অভিনয়ের স্কোপ একটু কম।"

"কেন?" বিরক্ত বীরেশ্বর প্রতিবাদ করলেন। "ফ্ল্যাশব্যাকে তরুণ গণপতির সঙ্গে তো লাভ সিন রয়েছে -লটারিতে লাখ টাকা পাবার আগে গণপতির সঙ্গে প্রেমের দৃশ্য। মধুকে স্কোপ দেবার জন্যেই তো ওটা স্পেশালি ঢোকানো হলো।"

অধর বললো, "অদ্ভুত ব্যাপার স্যার, সবাই বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে মশগুল। ফ্ল্যাশব্যাকে কী হয়েছিল তা নিয়ে কারও কানাকড়ি আগ্রহ নেই।"

অধর এর পর কিছু টাকা ভিক্ষে করলো। হাতজোড় করে সে বললে, "কিছুতেই ঘুম আসছে না, স্যার। রাতের পর রাত নাটকটার জন্যে ভেবে ভেবে, সবাইকে সমান সুযোগ দিতে গিয়ে, সব চরিত্রের ওপর সুবিচার করতে গিয়ে আমার ঘুম পালিয়েছে। আমার মাথা দপদপ করে, চোখে অন্ধকার দেখি। টাকা পয়সাও নেই -ভাল করে চিকিৎসা হচ্ছে না।"

বীরেশ্বর বিরক্ত হলেন। বললেন, "প্রত্যেক মাসে দুশ দশ টাকা করে মাইনে দেওয়া হচ্ছে তোমায়, অধর। নাম-কা-ওয়াস্তে সহকারী নির্দেশক হয়ে আছো। তাছাড়া ভাল ভাল কোটেশন ও সংলাপ যোগাড় করবার জন্যে তোমাকে আলাদা দশ টাকা অ্যালাউন্স দিচ্ছি—অথচ মাল সাপ্লাই পাচ্ছি না।"

অধর দুর্বল শরীরে হাঁপাতে লাগলো। হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়ে বললো, "আমি সব সময় ভাল ভাল কোটেশন এবং টাটকা ডায়ালগের খোঁজ করে যাচ্ছি, স্যার। শরীরের জন্যে সব কথা মনে রাখতে পারি না। শুনবেন স্যার, প্রেম সম্বন্ধে একটা ফরাসী ডায়ালগ? প্রেম মানে গদগদ হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা নয়—দু'জনে একাত্ম হয়ে একই দিকে এক সঙ্গে তাকিয়ে থাকার নাম প্রেম।"

"চুম্বন সম্বন্ধে ইনগ্রিড বার্গম্যান বলেছেন, শব্দ যখন নিরর্থক হয়ে ওঠে, তখন কথা বন্ধ করার জন্যে প্রকৃতি চুম্বনের মধুর ফন্দি বার করেছে।"

"চমৎকার", তারিফ করে বীরেশ্বর অধরের হাতে দু' টাকার একখানা নোট দিলেন।

সাউণ্ড বক্সের বোতাম টিপে বীরেশ্বর এবার লিপিকা এবং শরৎকুমারের প্রেমের সংলাপ শুনলেন। ওরা দু'জনেই বাইরের পৃথিবী ভুলে গিয়ে যেন প্রকৃত প্রেমের খেলায় নেমেছে। বীরেশ্বরের সন্দেহ হচ্ছে, ওরা দু'জন এমন কিছু কিছু সংলাপ বলছে যা নাটকে লেখা নেই। নর্তকী নলিনীর ভূমিকায় লিপিকা বলছে, "আমি আর পারছি না, শুভময়বাবু।" শুভময় আশ্বাস দিচ্ছে, "আর ক'দিন। তারপর তোমাকে এই বন্দিশালা থেকে আমি উদ্ধার করে নিয়ে যাবো নলিনী।"

বীরেশ্বর দুটো চোয়াল চেপে ধরলেন। তরুণ নায়ক শরৎকুমারকে একটা স্লিপ পাঠাতে গিয়েও পাঠালেন না।

দিনের পর দিন লিপিকাকে গম্ভীর দেখে স্টেজের অন্য লোকরা একটু চিন্তিত। ওরা জিজ্ঞাসা করছে, "কী হলো তোমার লিপিকা দিদি?"

লিপিকা বলে, "আমার এসব আর ভাল লাগে না।"

অধর বলে, "তুমি যা খেয়ালী, হঠাৎ যেন অভিনয় ছেড়ে-ছুড়ে বোসো না।"

লিপিকা চুপ করে রইলো। সিন শেষ করেও লিপিকা নিজের

ড্রেসিং ঘরে একলা বসে থাকে। আগেকার মতো সবার সঙ্গে গল্প-গুজব করে না। মধুমালতীও লিপিকার এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে, কিন্তু কিছু বলে না। মোটরগাড়ির ব্যাপার নিয়ে মধুমালতীর মনে একটু সন্দেহ হয়েছে। কিন্তু লিপিকা কিছুতেই স্বীকার করলো না গাড়িটা বীরেশ্বর তাঁকে উপহার দিয়েছেন। বিনা উদ্দেশ্যে কোনো কিছু খরচ করবার পাত্র যে বীরেশ্বর নন, এই সামান্য ব্যাপারটুকু মেয়েটা বোঝে না কেন? মধুমালতী মনে মনে ওর জন্যে ভাবনায় পড়লো।

লিপিকা প্রথম ধাক্কা খেলো সিনেমার ব্যাপারে। নতুন একটা বাংলা ছবিতে সে সুযোগ পাচ্ছিল। নায়কের ভূমিকায় শরৎকুমার। বীরেশ্বর খবর পেয়ে সোজা ছবির মালিককে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি এ-বইতে লিপিকাকে অভিনয়ের অনুমতি দেবেন না।

লিপিকা ও শরৎ দু'জনে এক সঙ্গে বীরেশ্বরের অফিসঘরে দেখা করতে গিয়েছিল। বীরেশ্বর গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন, "শরৎবাবু, আপনি কেন এসেছেন? আপনার সঙ্গে সিনেমার ব্যাপারে আমার তো কোনো কনট্রাক্ট নেই। আপনি যে কোনো ছবিতে, যেখানে খুশি অভিনয় করতে পারেন—শুধু যেদিন-যেদিন কোহিনূরে অভিনয় সেদিন ঠিক সময়ে এখানে আপনাকে হাজিরা দিতে হবে।"

"আর লিপিকা?" নায়ক শরৎকুমার প্রশ্ন করেছিল।

বীরেশ্বর গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, "এ-ব্যাপারটা তার সঙ্গে আমি আলাপ করতে চাই।"

লিপিকা বলেছিল, "আপনি কি চান না আমি উন্নতি করি?"

"অবশ্যই চাই। কেন চাইবো না?" দাঁতে দাঁত চেপে উত্তর দিলেন বীরেশ্বর রক্ষিত। "আমার এই নাটক চলা-কালে তুমি কোনো সিনেমায় নামবে না, আমার লিখিত অনুমতি ছাড়া।"

লিপিকা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আমাকে কীসব কাগজ সই করিয়া নিয়েছেন বীরেশ্বরবাবু ?"

মিষ্টি হেসে বীরেশ্বর বললেন, "জেনে-শুনেই তো তুমি সই করেছো লিপিকা। তোমার কাছে কনট্রাক্টের কপি পাঠিয়ে দিচ্ছি, পড়ে দেখো।"

ঘরের মধ্যে ভাগ্যে কেউ ছিল না। লিপিকা ঝাঁঝের সঙ্গে বললো, "আপনি আমাকে কিনে নিয়েছেন নাকি ?" লিপিকা যে মধুমালতী নয় তা বীরেশ্বরকে বুঝিয়ে ছাড়বে সে।

লিপিকার মনের কথা জানতে পারলে বীরেশ্বর এতোক্ষণে চোখের আগুনে তাকে হয়তো পুড়িয়ে ফেলতেন। আজ বীরেশ্বর মেজাজ গরম করছেন না। শান্তভাবে তিনি লিপিকাকে বললেন, "আমি অবশ্যই তোমাকে কিনে নিই নি। আজকালকার আইন-কানুন খুবই কঠিন—কোনো মানুষকে কেনা-বেচা যায় না। আমার এই নাটক যদ্দিন চলবে ততদিন আমাদের উভয়ের স্বার্থে চুক্তিপত্রে কিছু দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে। আমি তোমার ছবি বিজ্ঞাপনে বড় বড় করে ছাপবো, তোমাকে মোটা মাইনে দেবো, তার বদলে তুমি কোহিনূরের এক্সক্লুসিভ আর্টিস্ট থাকবে। একমাত্র কোহিনূর ছাড়া কলকাতার কোনো পাবলিক স্টেজে তুমি অভিনয় করবে না। কলকাতার বাইরে যত খুশী পাবলিক শো দিতে পারো।"

"এসবের অর্থ ?" রাগে উত্তপ্ত লিপিকা জানতে চেয়েছিল। তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লিপিকা চমকে উঠেছিল। রঙচঙ মাখা অবস্থায় দুটো সীনের মাঝখানে সে বীরেশ্বরের অফিসঘরে চলে এসেছিল। অধরবাবু তাকে ডাকতে এসেছেন।

বীরেশ্বর পরম সুখে একবার হাসলেন। তারপর মনে মনে বললেন, "এর অর্থ হলো, যতদিন এই 'আমীর ও উর্বশী' চলছে ততদিন তুমি আমার কথার অবাধ্য হবে না।"

"নরহরি", ডাক দিলেন বীরেশ্বর। "কাগজে পাবলিসিটি বাড়িয়ে দাও। ডবল জায়গা নিয়ে লিপিকার ছবি ছাপাও। আমি দেখতে চাই সামনের রবিবারে দর্শকদের চাপে বুকিং অফিস ভেঙে পড়ছে!"

বীরেশ্বর এবার সাউণ্ড বক্সের বোতাম টিপে দিলেন। নর্তকী নলিনী এখন প্রায়-বিবস্ত্র অবস্থায় পাশ্চাত্ত্যনৃত্যে দর্শকদের মনোহরণ করছে। তাকে দেখে কে বলবে, মাত্র পাঁচ মিনিট আগে বীরেশ্বরের সঙ্গে সুন্দরীর লড়াই চলছিল?

কোহিনূরের কর্তা নির্জনে হাসছেন। তাঁর পা মাড়িয়ে পৃথিবীতে এখনও পর্যন্ত কেউ ছাড়া পায় নি। সামান্য একজন নর্তকীকে সেই অপমানের সুযোগ কিছুতেই দেবেন না বীরেশ্বর।

কোহিনূর থিয়েটারের সুখের সংসারে অশান্তির কাল মেঘ ঘনিয়ে উঠছে। দর্শকের ভিড় যথেষ্ট রয়েছে। মন দিয়ে সবাই কাজ করছে, অভিনয় বেশ ভাল হচ্ছে, প্রতি শোতে হাততালি পড়ছে—তবু কোথাও যেন ছন্দপতন ঘটছে। আগামী দুর্যোগের অজানা আশঙ্কায় নরহরি এবং অধর মাঝে মাঝে শিউরে উঠছে। সায়েব যে কোনো অজ্ঞাত কারণে ক্যাবারে নর্তকীর উপর বেশ ক্ষেপে উঠেছেন তা তারা আন্দাজ করেছে।

অধরের আবার বুকের গোলমাল—আজকাল কোনোপ্রকার নাটকীয় সংঘাত তার সহ্য হয় না। মধুমালতী নিজের ভাগ্যকে অনেকখানি মেনে নিয়েছিল—নিজেকে নিষ্ঠুর বীরেশ্বরের কাছে সঁপে দিয়ে সে-একদিন এই নাট্যশালাকে নিশ্চিত ধ্বংস থেকে রক্ষা

করেছিল, প্রতিদানে সে কিছুই পায় নি। তার মৃত্যুর পরে এই থিয়েটারের নাম মালতীমঞ্চ হবার কোনো সম্ভাবনা নেই তা বুঝেও সে শান্ত হয়ে আছে।

ঈশ্বরের কাছে মধুমালতী কাতরভাবে প্রার্থনা করে, "আমার অবস্থা বিনোদমাসীর মতো কোরো না—বুড়ী হয়ে সর্বস্ব হারিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে আমাকে যেন মরতে না হয়। এই কোহিনূরে পাবলিকের হাততালি পেতে পেতে আমি যেন তোমার কাছে যেতে পারি।" অভিনয় করে বাড়ি ফিরে এলে নিঃসঙ্গ মধুমালতী নানা চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়ে। তার সমস্ত দুঃখের জন্যে প্রবলপ্রতাপান্বিত বীরেশ্বরকেই সে দোষী করে বসে। কিন্তু বীরেশ্বরের বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসবার কোনো পথই তো এখন খোলা নেই।

মনের এই অবস্থায় অদ্ভুত এক চিন্তার উদয় হয় মধুমালতীর মনে। মধুমালতী বিদ্রোহ করতে চায়—বীরেশ্বরকে জানাতে চায় তার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘৃণার বিষ জ্বলছে। নিজের শেষ ইচ্ছা সে চিঠির আকারে লিখে ফেললো—মূল্যবান সেই কাগজটা একটা নীল রঙের মোটা খামের মধ্যে পুরে আঠা দিয়ে মুখ বন্ধ করলো। খামের এক কোণে বড় বড় করে মধুমালতী লিখেছে: 'আমার মৃত্যুর পরে এই খাম যেন খোলা হয়।' ভিতরের চিঠিতে লেখা—"সংসারে কারও কাছে আমার কোনো প্রত্যাশা নেই। কিন্তু মৃত্যুর পরে একটি মাত্র ইচ্ছা যেন অবশ্যই মান্য করা হয়। বীরেশ্বরবাবু যেন আমার মৃতদেহ স্পর্শ না করেন।" জীবনে যাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে নি মৃত্যুর পরে তারই কলুষিত স্পর্শ থেকে নিজেকে দূরে রাখবার ব্যবস্থা করে মধুমালতী অনির্বচনীয় আনন্দবোধ করলো।

মধুমালতীর এই শেষ চিঠি একদিন হাতিবাগানের নাটক পাড়ায় অনেক হাসাহাসির কারণ হবে—স্টার, রঙমহল, বিশ্বরূপা, মিনার্ভার সাজঘরে হয়তো অনেক জিজ্ঞাসা উঠবে, কিন্তু জীবনে

যা সম্ভব হয় নি মৃত্যুর পরে সেই ইচ্ছা মধুমালতী সার্থক করতে চায়। বিষাক্ত বীরেশ্বরের স্পর্শমুক্ত মালতীর মরদেহ পঞ্চভূতে লীন হবে, সে-এক অপূর্ব মুক্তির আনন্দ।

মধুমালতী আজকাল লিপিকাকে অবশ্যই পছন্দ করে না। খ্যাতির শিখরে উঠবার জন্যে সে নিজেকে বীরেশ্বরের কাছে দুর্লভ ও মোহময়ী করে তুলেছে। লিপিকা এইভাবে আসরে না নামলে বীরেশ্বর অবশ্যই মধুমালতীর চরণ-চারণে ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু তাই বলে লিপিকা সম্বন্ধে মনে কোনো ঘৃণা নেই। সব কিছু ভেবে তাকে সহ্য করার সঙ্কল্প নিয়েছে মধুমালতী। কোহিনূর থিয়েটারের পঁচাত্তরজন কর্মীর মুখ দেখে মধুমালতীর চোখে এখনও জল আসে—এদের সংসারের কথা ভেবে মধুমালতী এমন কিছু করতে চায় না যাতে কোহিনূরের কোনো ক্ষতি হয়। হে ঈশ্বর, কোহিনূরের জনপ্রিয়তা যেন উত্তরোত্তর বেড়েই চলে।

কিন্তু হঠাৎ কী এমন হলো যে লিপিকা সব সময় মুখ গম্ভীর করে থাকে, কারও সঙ্গে কথা বলে না। মধুমালতী মনে মনে বলে, "লিপিকা তোমার মতো আমারও একদিন ভরা যৌবন ছিল, তোমারই মতো আমি একদিন স্তাবক বীরেশ্বরকে অবহেলাভরে দূরে সরিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তোমার মতো কায়দা করে মোটরগাড়ি আদায় করি নি।"

গভীর দুঃখেও মধুমালতী হেসেছে। থিয়েটারী পদ্ধতিতে স্বগতোক্তি করেছে, "বীরেশ্বর রক্ষিতকে তুমি এখনও চেনো নি, লিপিকা।"

আর বেচারা লিপিকা। সাজঘরের মেকআ্যাপম্যান, সীন সিফটার, কোকাসম্যান, প্রম্পটার, সবাই জিজ্ঞেস করে, "কী হলো লিপিকাদি? এখন তো আগের মতো মুড়িবাদাম আনতে বলো না?"

স্বল্পবসনা নর্তকী চুপ করে বসে থাকে, কোনো উত্তর দেয় না।

একটা সেকেলে থিয়েটারের স্বেচ্ছাচারী মালিককে এখানকার সকলে কেমন করে সহ্য করে যাচ্ছে তা সে বুঝতে পারে না। "আমরা বিংশ শতাব্দীতে বাস করছি, না মধ্যযুগে?" লিপিকা মাঝে মাঝে নিজেকে প্রশ্ন করে। ঘাড়ে-গর্দানে এই লোকটা থিয়েটারের মালিক না ভারতসম্রাট? লিপিকা মাথা নিচু করবে না—অন্যায় সহ্য করার শক্তি লিপিকার নেই।

মুটকি সুহাসিনী অনেকদিন ধরে থিয়েটারে ঝি-এর পার্ট করছে। সাজঘরের ভিতরের খবরাখবর সে গোপনে বীরেশ্বরের কাছে রিপোর্ট করে। সুহাসিনী কিছুদিন থেকেই লিপিকার ওপর বিশেষ নজর রেখেছে। লিপিকার মন গলানোর নানা চেষ্টা করে সুহাসিনী। লিপিকার ঘরে গিয়ে বিশ্রামরতা নর্তকীকে সে বলে, "কি গো লিপিকাদি? এত মান অভিমান কেন? সায়েবের সঙ্গে মিটমাট করে ফেলো না।"

লিপিকা গম্ভীর মুখে সুহাসিনীর দিকে তাকিয়ে থাকে। "আমাকে কী ভেবেছো তুমি?"

"কত কপাল করে এসেছো দিদি! এক সময় আমাদেরও তো গতর ছিল? কিন্তু সায়েবের নজরে পড়তে পারলাম না, সারাজীবন তাই বাসন-মাজা ঝি-য়ের পার্ট করে গেলাম!"

সুহাসিনীকে শুনিয়ে দিলো লিপিকা, "পৃথিবীর সব মেয়ে মধুমালতী নয়।"

একগাল হেসে সুহাসিনী বললো, "আমার কি ঘাড়ে দুটো মাথা আছে যে তোমার সঙ্গে মধুদির তুলনা করবো? সায়েব তোমাকে মোটরগাড়ি দিয়েছে, তাতেও তোমার মন উঠছে না!"

রঙ্গমঞ্চের এই অস্বাস্থ্যকর পঙ্কিল আবহাওয়া থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে চায় লিপিকা। হোটেলের নরক সে দেখেছে—কিন্তু সেখানে একশ বছরের পচা দুর্গন্ধ নেই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের

শ্রীচরণে সিঁদুর মাখিয়ে অসহায় মানুষদের এইভাবে নিপীড়ন করা হয় না সেখানে।

"লিপিকা, তুমি শান্ত হও", কে যেন লিপিকার ভিতর থেকে বলছে। কিন্তু লিপিকার জেদ চাপলে মাথার ঠিক থাকে না। পার্কসার্কাসের বাড়িতে সেদিন বীরেশ্বরকে সে যে চড় মারেনি। এই যথেষ্ট।

লিপিকা একদিন দুপুরে মধুমালতীর বাড়িতে গিয়েছে। অসময়ে লিপিকাকে দেখে মধুমালতী অবাক। লিপিকা কাঁদতে কাঁদতে তাকে সব বলেছে। "মালতীদি, নরক আমিও অন্যত্র দেখেছি। কিন্তু তোমার সর্বনাশ করবার জন্যে আমি তো কোহিনূরে আসিনি? তুমি আমাকে এখানে এনেছিলে সে কথা ভুলি কী করে?"

মধুমালতীর চোখেও জল। লিপিকা যে তার কথা মনে রেখেই বীরেশ্বরকে প্রশ্রয় দেয় নি তা এই প্রথম মধুমালতী বুঝতে পারলো। লিপিকার ওপর সে যে এতদিন সুবিচার করে নি তা ভাবতে গিয়ে আরও কান্না আসছে। এই উদ্ধত নাচনীকে সে কেন অকারণে ভুল বুঝলো।

লিপিকা যে মধুমালতীর মতো অবলা নয়, তার যে বিষদাঁত আছে তা খুবই ভরসার কথা। কিন্তু মধুমালতী অজানা আশঙ্কায় শিউরে উঠলো। সজল চোখে লিপিকাকে বললো, "এই থিয়েটার বাড়ির রন্ধ্রে-রন্ধ্রে পাপ জমা হয়ে রয়েছে পাপের কোনো প্রতিবিধান এখানে হয় না।"

বীরেশ্বরের ভয়াবহ প্রতিহিংসার কথাও মনে পড়ে গেলো মধুমালতীর। সে বললো, "এখনও সময় আছে লিপিকা—তুমি এখান থেকে পালাও।"

মধুমালতীকে এবার লিপিকা সন্দেহ করলো না। এই থিয়েটার থেকে সরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে লিপিকা। কোহিনূরের সঙ্গে

সম্পর্কচ্ছেদ মানে পার্ক সার্কাসের সাজানো-গোছানো বাড়িটা ছাড়তে হবে, ছোট্ট কোনো বাড়িতে লিপিকা উঠে যাবে। লেডিজ হোস্টেল হলেই ভাল হতো। কিন্তু সেখানে তো থিয়েটারের অভিনেত্রীর স্থান হবে না। সে যে অস্পৃশ্যা। ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা অনেক বেশী পিউরিটান—গেরস্ত ঘরের মেয়েরা থিয়েটারের নায়িকার সঙ্গে একই ছাদের তলায় বসবাস করতে রাজী হবে না।

ছোট ফ্ল্যাট এবং অন্য জীবিকার খোঁজখবর আরম্ভ করেছে লিপিকা। রুসীদার সঙ্গে পরামর্শ করেছে সে। রুসীদা বলেছে, "আমিও খোঁজখবর করবো।"

রুসীদার কাছ থেকে খবর পেয়েই এমারেল্ড থিয়েটারের আলোকচাঁদ জহুরী দূত পাঠিয়েছিলেন। এমারেল্ডে বেশ দুর্দিন। সেকালের প্রখ্যাত থিয়েটার মালিক প্রতাপ জহুরীর দূর সম্পর্কের আত্মীয় জলের দামে থিয়েটারটা কিনে নিয়েছে। আলোকচাঁদের নতুন ম্যানেজার মিছরিবাবু বললেন, "এতো কি ভাবছেন লিপিকা দেবী? এক থিয়েটারে কেউ কখনও চিরদিন থাকে? গিরিশ ঘোষের কথা ভাবুন—কতবার থিয়েটার পাল্টেছেন, এক থিয়েটারে চাকরি করতে করতে লুকিয়ে অন্য থিয়েটারের জন্যে নাটকও লিখেছেন।"

লিপিকা মনস্থির করেছিল—কোহিনূর থেকে বিদায় নিয়ে অন্যত্র কোনো থিয়েটারে চলে যাওয়াই সবদিক দিয়ে যুক্তিযুক্ত হবে।

পদত্যাগের নোটিস দিতে গিয়েই লিপিকার চোখ খুললো। লিখিত চুক্তিতে পদত্যাগের কোনো ব্যবস্থাই নেই। "আমীর ও উর্বশী চলাকালে আপনাকে এখানেই কাজ করতে হবে", বীরেশ্বরের নিজস্ব প্রতিনিধি নরহরি মিষ্টি কথায় লিপিকাকে জানিয়ে দিয়েছিল। নরহরি বিব্রতভাবে বলেছিল, "কিছু মনে করবেন না

লিপিকাদি, সায়েব বলছিলেন, সতেরো নম্বর শর্তটা আপনাকে পড়ে শোনাতে। এই নাটক চলাকালীন হঠাৎ থিয়েটারে আসা বন্ধ করলে আপনাকে আড়াই লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।"

টাকার পরিমাণ শুনে চমকে উঠেছিল লিপিকা। শুকনো মুখে নরহরির কথাবার্তা শুনেছিল। আইনের জালে আবদ্ধ নর্তকীকে ভরসা দেবার জন্যে নরহরি বলেছিল, "একটা বই আর ক'দিন চলবে? আপনি এতো চিন্তা করছেন কেন, দিদি?"

লিপিকার হাতে সময় ছিল না। অভিনয়ের মধ্যেই পদ-ত্যাগের কথাবার্তা বলতে গিয়েছিল লিপিকা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে তৃতীয় অঙ্কে অভিনয়ের জন্যে বোর্ডে ঢুকে গেল। নরহরি তবু বীরেশ্বরের সমস্ত কথা লিপিকাকে শোনায় নি। বীরেশ্বর হুকুম করেছিলেন, "লিপিকাকে বোলো কনট্রাক্টটা মন দিয়ে পড়তে। আমি দেখতে চাই সামান্য একজন নর্তকী কীভাবে আমার এই থিয়েটারের ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করে। এরপর হুঙ্কার ছুড়েছিলেন বীরেশ্বর—"নরহরি, আমার এই বই চলছে এবং চলবে।"

"স্যর?" নরহরি সায়েবের কথা ঠিক বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

বীরেশ্বর হুকুম করলেন, "নরহরি, তুমি আরও বিজ্ঞাপন বাড়াও। নতুন ক্যাবারে ডান্স আইটেম জোড়বার জন্যে তুমি মিস্ হেলেনাকে যোগাড় করো। পাবলিকের কোনো সাধ আমি অপূর্ণ রাখবো না—কিন্তু ওই লিপিকাকে শিক্ষা দেবো। এই নাটক বছরের পর বছর চলবে। আলোকচাঁদ জহুরীকে জানিয়ে দিতে চাই যে বীরেশ্বর রক্ষিত এখনও বেঁচে আছে।"

ভয় পেয়ে নরহরি চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। বীরেশ্বর কীভেবে জিজ্ঞেস করলেন, "বঙ্গরঙ্গমঞ্চের রেকর্ড কত?"

"বোধহয় এক হাজার এক নাইট, স্যর" নরহরি মাথা চুলকলো।

"আমীর ও উর্বশী তাহলে সে রেকর্ড ভাঙবে। যাও, সেইভাবে কাজ করোগে যাও", বীরেশ্বর ভারী গলায় হুকুম দিয়েছিলেন।

বীরেশ্বর এরপর হিসেব করতে বসেছিলেন। সপ্তাহে চারটে শো মানে বছরে ২০৮ শো, প্রায় কুড়িটা পাবলিক ছুটির দিনে আরও চল্লিশ শো—অর্থাৎ বছরে আড়াইশ অভিনয়। সহস্র রজনীর সন্ধানে চার বছর কেটে যাবে।

নিজের মনেই এবার হাসতে লাগলেন মালিক বীরেশ্বর। "নর্তকী লিপিকা সেন, বীরেশ্বরকে যখন অপমান করেছো তখন তোমার মুক্তি নেই। সহস্র রজনীতেই থামবো কেন? দ্বিসহস্র রজনী রয়েছে, তারপর ত্রিসহস্র রজনী। বীরেশ্বরের এই নাটক চলবে এবং তোমাকে নিয়েই চলবে। যতদিন তোমার দেহে এক আউন্স যৌবন আছে ততদিন তুমি এখানে বন্দী।"

অ্যাটর্নিকে ফোন করলেন বীরেশ্বর। "এমারেল্ড থিয়েটারের আলোক জহুরীকে একটা লিগ্যাল নোটিস পাঠিয়ে দিন তো। লিপিকা সেনকে ভাঙাবার চেষ্টা করলে তার নামেও আমি ক্ষতি-পূরণের মামলা আনবো।"

ফোন নামিয়ে হিংস্র বীরেশ্বর শান্তভাবে এক গেলাস বেলের শরবত খেলেন। নেদোদা শুনলে বলবেন, থিয়েটার করছো করো আবার কোর্টঘর কেন? নেদো মল্লিককে মনে করিয়ে দিতে হবে, আইন-আদালত ছাড়া কোনোদিনই বাংলা থিয়েটার চলতো না। অধরের কাছে বীরেশ্বর অনেক গল্প শুনেছেন। গিরিশ যখন ক্লাসিক ছেড়ে মিনার্ভায় যোগ দিতে গেলেন তখন অমরেন্দ্র দত্ত হাইকোর্টে ইনজাংশন নিলেন। তারপর দু'পক্ষের ব্যারিস্টারদের মধ্যে সে কি লড়াই। একদিকে ব্যারিস্টার জ্যাকসন ও ডবলু সি বনার্জি, অপরপক্ষে ব্যারিস্টার গ্রিফিথ এভান্স ও গার্থ।"

নরহরির কাছে বীরেশ্বর শুনেছে, "লাঠিয়াল ও গুণ্ডা ছাড়া

কখনও থিয়েটার চলে? অমৃতলাল বসু বেঙ্গল থিয়েটার লিজ নিয়েছিলেন, কিন্তু দখল পাচ্ছিলেন না। নটী বিনোদিনীর গার্জেনরা বন্ধুকৃত্য করলেন, দূর দেশ থেকে লাঠিয়াল এনে রসরাজ অমৃতলালের থিয়েটারের দখল নিলেন! সুন্দরী অভিনেত্রী তিনকড়ি ও গিরিশ ঘোষকে একই সঙ্গে সাবাড় করে দেবার ফাঁদ পেতেছিলেন একজন বড়মানুষ। তিনকড়িকে এই বড়মানুষটি রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গিরিশ পরামর্শ দিয়েছিলেন, বড়মানুষের খেয়ালে তুমি যদি থিয়েটার ছাড় তা হলে ঠকবে। সেই খবর পেয়ে রেগেমেগে গুণ্ডা আনিয়ে সিঁথির বাগানবাড়িতে গিরিশ ও তিনকড়িকে খতম করবার ব্যবস্থা করেছিলেন জমিদারতনয়। একটুর জন্যে তাঁরা বেঁচে যান।"

অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা না ভেবে নিজের সর্বস্ব ঢেলে দিয়ে অভিনয় করছে লিপিকা। এই উপদেশ সে অধরদার কাছে পেয়েছে। অধরদা একদিন বলেছিলেন, "যখন দর্শকদের সামনে দাঁড়াবে, যথাসর্বস্ব ঢেলে দিও—একটুও বাঁচিয়ে রাখবে না।" লিপিকা তাই চেষ্টা করছে।

কিন্তু রঙ্গমঞ্চের অস্পষ্ট অন্ধকারে হল বোঝাই দর্শকদের কাল মাথার দিকে তাকিয়ে লিপিকার ইচ্ছে হচ্ছে অভিনয় থামিয়ে সে বলে, "আপনারা কি লিপিকা সেনকে সত্যিই ভালবাসেন? তাহলে অনুগ্রহ করে কাল থেকে এখানে আসবেন না। আপনারা না এলে 'আমীর ও উর্বশী' শেষ হবে এবং অসহায় বন্দীদশা থেকে অভাগিনী লিপিকা মুক্তি পাবে।"

ছিঃ, দর্শকরাই তো দেবতা। হাতের দেবতাকে কখনও পায়ে ঠেলতে আছে? লিপিকা নিজেই নিজেকে ভর্ৎসনা করলো। এবার নায়ক শরৎকুমারের সঙ্গে লিপিকার সেই বিখ্যাত প্রেমের দৃশ্য শুরু হলো, যার সুখ্যাতি সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রেমমুগ্ধা নর্তকী নলিনীর অধরে সুদর্শন নায়ক একটি উষ্ণ চুম্বন এঁকে দিতে চায়। কিন্তু মনে সামান্য একটু সৌজন্যের সঙ্কোচ রয়েছে। এবার লিপিকার কণ্ঠে শুরু হলো সেই জনপ্রিয় ইংরিজী গান :

> *"Some say kissing is a sin; but if is was na lawful, lawyers would na allow it; if it was no holy, ministers would na do it; if it was na modest, maidens would na take it."*

এক সময় লিপিকা রঙ্গমঞ্চের সবাইকে গাইতে আহ্বান করে। তরুণ দর্শকরা সাগ্রহে নলিনীর সঙ্গে গাইতে শুরু করে। উচ্ছ্বসিত দর্শকদের উষ্ণ অভিনন্দনে হল ফেটে পড়ার অবস্থা।

আনন্দ এবং হতাশা একই সঙ্গে আক্রমণ করছে লিপিকাকে। পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে কে না অভিনন্দন চায়? কিন্তু এর অর্থ টিকিটঘরে ভিড় বাড়বে, 'আমীর ও উর্বশী' আরও অনেকদিন চলবে।

অলিভ-সবুজ রঙের অ্যামবাসাডার গাড়িতে নিজের ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়েছে লিপিকা। একই দিনে দুটো শোয়ের পর শরীরের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। একই নাচ, একই গান, একই ডায়ালগ, একই প্রেমালাপ—শুধু দর্শকরা আলাদা। তাদের ভাবভঙ্গিতে নূতনত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাদের ক্ল্যাপেই বোঝা যায় জীবনের এই নাটক এখনও পুরনো হয় নি।

সাত ঘণ্টা অভিনয়ে ক্লান্ত লিপিকা এখনও থিয়েটারের কথা ভুলতে পারছে না। সে ভাবছে কবে তার মুক্তি হবে? আর কতদিন এই থিয়েটার চলবে? 'আমীর ও উর্বশী' তাড়াতাড়ি শেষ না হলে তার সমস্ত জীবনের পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে যাবে। বীরেশ্বরের শাসানিতে চলচ্চিত্র পরিচালকরাও কোন উচ্চবাচ্য করছেন না। কিছুকাল আগেও তাঁরা লিপিকাকে সুযোগ দেবার কথা ভাবছিলেন। এমারেল্ড থিয়েটারের আলোক জহুরীও উকিলের চিঠি পেয়ে একটু ঝিমিয়ে পড়েছে। নতুন নাটক না হয়ে কে আর ইনজাংশনের ঝামেলায় পড়তে চায়? আলোক জহুরী অবশ্য একেবারে খোঁজখবর বন্ধ করে নি। লিপিকাকে বলেছে "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার লিখিত চুক্তির একটা ফয়সালা করুন।' আলোক জহুরী বড়জোর আরও তিন মাস লিপিকার জন্য অপেক্ষা করবে। ওদের বর্তমান নাটক তার বেশী টেনে যাওয়া সম্ভব হবে না।

লিপিকা ভেবেছে এখন থেকে সে খুব খারাপ অভিনয় করবে। এমন বেতালে নাচবে, এমন বোকার মতো কথা বলবে, এমন প্রাণহীনভাবে মঞ্চে ঘুরে বেড়াবে, এমন সংযতভাবে বেশবাস করবে যে দর্শকরা ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। বীরেশ্বরের এই নাটকে লিপিকাই তো সব। 'পূর্ণিমা উৎসবে যদি চাঁদই না দেখা গেলো, তা হলে রইলো কী?' অধরবাবু একবার বলেছিলেন। কিন্তু সাজঘরে সাজসজ্জা সেরে লিপিকা যেমন উইংসের আড়াল থেকে হলের দর্শকদের দিকে তাকিয়ে দেখে অমনি তার মন পালটে যায়। স্টেজে নেমে কী করে সে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে? যেমনি মুখে আলো এসে পড়ে, উৎসুক দর্শকদের অবিশ্রান্ত হাততালিতে রঙ্গমঞ্চ মুখরিত হয়ে ওঠে লিপিকা অমনি বীরেশ্বর রক্ষিতের কনট্রাক্টের কথা ভুলে যায়। মনে থাকে না—একালের এক বেয়াদব সম্রাট নিজের বদখেয়ালে অসহায়

এক রমণীকে নজরবন্দী করে রেখেছেন। লিপিকা নিজেকেও ভুলে যায়। নর্তকী নলিনী তখন আপন ভাবে বিভোর। সে তখন সুদর্শন নায়ক শুভময় ও বিজনেস্‌ম্যান গণপতির আকর্ষণের দোলায় নাটকের নতুন সমস্যা বুনতে থাকে।

থিয়েটার থেকে বেরিয়ে বাড়ি যাবার পথে পুরনো চিন্তাগুলো আবার ফিরে আসে। আহত সর্পিণীর মতো ফণা তুলে শত্রুর দিকে ছুটে যেতে ইচ্ছে করে লিপিকার। সেই সঙ্গে নিজেকেও ধিক্কার দেয় লিপিকা। কেন সে বীরেশ্বরকে বিশ্বাস করে টাইপ-করা কাগজটায় সই করতে গেলো? নায়িকা হবার দুর্নিবার লোভে সে কেমন করে কাগজটা না পড়েই বীরেশ্বরকে বলেছে "কোথায় সই করতে হবে বলুন?"

না, ক্লান্ত এই শরীরে লিপিকা আর ভাববে না। কোহিনূরের এই কালিমা ভুলবার জন্যেই লিপিকা এখন শরৎকুমারের সঙ্গে ছোট্ট একটা শখের নাটুকে দল করেছে। সোম, মঙ্গল, বুধ এবং শুক্রবারে কোনো কাজ নেই। ওরা মাঝে মাঝে কলকাতার বাইরে আমন্ত্রিত অভিনয় করে আসে। অধরদার সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করেছে লিপিকা। অধরদার বলেছে, "কেউ যেন না জানতে পারে। তোমাদের দুজনের কথা ভেবেই একটা ছোট নাটক লিখে রেখেছি। কাব্য নাটক। কোনো সীন-সীনারি নেই —মাত্র দুটি চরিত্র। বক্স অফিসের জঞ্জাল না ঘেঁটে, শুধু নাটক ও অভিনয়ের কথা ভেবে এই বই লিখেছি। কিন্তু আমার নাম যেন গোপন থাকে।"

দুঃখ পেয়েছে লিপিকা। "যদি আপনার নামই জানা না গেলো, তা হলে আপনার কী লাভ হবে অধরদা?"

অধরদা ম্লান হেসে বলেছে, "নাট্যকারের নাম দাও—পরিচয় গুপ্ত। যদি কখনও তেমন সময় আসে তখন সবাই জানবে, অধর চাটুজ্যে বস্তাপচা বক্স-অফিস নাটক ছাড়াও কিছু লিখতে পারতো।

লিপিকা একবার ভেবেছিল অধরদার নামটা তাদের প্রোগ্রামে বড় বড় করে ছাপিয়ে দেবে। কিন্তু তারপর খেয়াল হয়েছে ভাল করতে গিয়ে মন্দ হবে। অধরদা বিনা অপরাধে বীরেশ্বর রক্ষিতের কুনজরে পড়ে যাবে।

নামের ব্যাপারে অধরদা কোনো দুর্বলতা প্রকাশ করে না। লিপিকাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, "আমাদের এই অভাগা দেশের সংবাদপত্রে, পাঠ্যপুস্তকে, সিনেমায় কার ছেলে যে কাকে বাবা বলছে! বই লেখে একজন নাম ছাপা হয় অন্য একজনের। থিয়েটারের জন্য কি আলাদা আইন হতে পারে?"

অধরদার লেখা নাটকটা কয়েকবার মহড়া দেওয়া হয়েছে। আগামীকালও রিহার্সালে বসা প্রয়োজন। অথচ শরৎবাবুকে বলতে ভুল হয়ে গেলো। বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভার পরশুরামকে লিপিকা বললো, "আগামীকাল শরৎবাবুর বাড়িতে এই চিঠি দিও এবং উনি যদি এখানে আসতে চান সঙ্গে করে নিয়ে এসো।"

শরৎকুমার যথাসময়ে এসেছিল। চমৎকার মানুষ—মনটি ছেলেমানুষের মতো। থিয়েটারের পোকা মাথায় ঢুকিয়ে ব্যাঙ্কের পাকা চাকরি নষ্ট করেছে বি-এ পাস শরৎকুমার। লিপিকা জিজ্ঞেস করলে নায়ক শরৎকুমার বলে, "দু-নৌকায় পা দিয়ে সমস্ত জীবন কি চলা যায়, মিস সেন? ভাবুন তো, উত্তমকুমার যদি সারাজীবন পোর্টকমিশনার্সে চাকরি করতেন তা হলে কী অবস্থা হতো?"

"কেন? গিরিশবাবু তো বহুকাল মার্চেন্ট আপিসে কেরানি-গিরি করেছিলেন," লিপিকার প্রশ্ন।

"গিরিশবাবুর যুগ এবং এযুগের মধ্যে অনেক তফাত। গিরিশবাবুর যুগে দুটো বউ রাখা যেতো, এখন যায় কী?" এই বলে শরৎকুমার হেসে ফেলেছিল।

কলকাতার বাইরে নতুন নাটকের দু'একটা অভিনয় বেশ হলো। ভিড় তেমন না হোক, মনের শান্তি পেয়েছে লিপিকা। অনাবৃত দেহ ভাঙিয়ে এই নাটকে দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে হয় না। নিজের অভিনয় ক্ষমতা সম্বন্ধে মনোবল পাচ্ছে লিপিকা। অধরদার কানেও এসব খবর গিয়েছে। কোহিনুরের সাজঘরে অধরদা চুপিচুপি বলেছে, "তোমাদের অভিনয় দেখবার ইচ্ছে হয় খুব। কিন্তু উপায় নেই সায়েবকে চটানোর মতো আর্থিক সামর্থ্য ঈশ্বর এ-জীবনে আমাকে দিলেন না।"

তারপরেই বোমা ফাটলো। বীরেশ্বর দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিলেন, "বড় বাড় বেড়েছে এই শরৎকুমার। ঘন ঘন লিপিকার বাড়িতে যাতায়াত করছে। ছোকরা কি জানে না, কোথায় হাত বাড়াচ্ছে?"

নরহরিকে ডাক দিয়েছিলেন বীরেশ্বর। "ঐ ছোঁড়া শরৎ-কুমারের ফাইলটা দেখি।"

বীরেশ্বরের এক হুকুমে শরৎকুমারের ব্ল্যাঙ্ক রেজিগনেশন লেটারটা বার করে দিয়েছিল নরহরি।

"এক মাসের মাইনে ধরিয়ে দিয়ে ওকে দূর করে দাও কাল থেকে।" বীরেশ্বর নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং অনুগত নরহরি সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল করেছিল।

"পরের জিনিসের দিকে হাত বাড়াবার শাস্তিটা কি এবার বুঝুক!" নিজের মনেই বলেছিলেন বীরেশ্বর।

চারদিকের অবস্থা বুঝে নর্তকী লিপিকা এবার নত হবে আশা করেছিলেন বীরেশ্বর রক্ষিত। কিন্তু আত্মসমর্পণের কোনো লক্ষণই এখনও পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না—গরবিনী রমনীর ঔদ্ধত্য যেন বেড়েই চলেছে। সুন্দরীকে শাসন করবার জন্যে নিরপরাধ শরৎ-কুমারের চাকরি নষ্ট হলো, তার জায়গায় নতুন নায়ক সুদর্শন

কুমারকে আনিয়েছেন বীরেশ্বর। শরৎকুমারের ভবিষ্যৎ সমূলে বিনাশের জন্যে বীরেশ্বর গোপন নির্দেশ দিয়েছেন। নরহরি কিছু খরচ করে দু'একটা পত্রিকায় শরৎকুমারের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য লিখিয়েছে—'লিপিকার মতো ব্যক্তিত্বশালিনী অভিনেত্রীর পাশে নায়ক শরৎকুমারকে প্রাণহীন পুতুলের মতো মনে হতো। কি সৌন্দর্যে, কি ব্যক্তিত্বে শরৎকুমার লিপিকাদেবীর নখের যোগ্য ছিল না। তাকে পরিবর্তন করে নাট্যকার নির্দেশক বীরেশ্বর রক্ষিত অপ্রিয় অথচ প্রয়োজনীয় কাজ করেছেন। নবাগত সুদর্শনকুমারকে আমরা স্বাগত জানাই।'

অভিনেত্রীর কোনো অভিমত নেই। বীরেশ্বর যাঁকেই পাঠাবেন তার সঙ্গেই দৃশ্যের পর দৃশ্যে লিপিকাকে প্রেমের খেলায় মাততে হবে। লিপিকা এসে সুদর্শনকুমারের হাত ধরে। মুখে চোখে প্রথম প্রেমের পুলক সঞ্চার করে লিপিকা বলে, "শুভময়বাবু হোটেলের এই ক্যাবারে জীবন আমার আর ভাল লাগে না— আমাকে এই বন্দীশালা থেকে মুক্ত করে অন্য কোথাও নিয়ে চলুন।" কত সহজে, কত আবেগের সঙ্গে লিপিকা কথাগুলো বলে এবং দর্শকদের করতালিতে রঙ্গশালা মুখর হয়ে ওঠে।

শরৎকুমারের জন্য চোখের জল ফেলেছে লিপিকা। একবার ভেবেছিল দু'জনে মিলে থিয়েটার পার্টি করে বাংলার গ্রামে গ্রামে, আসামে, উড়িষ্যায় ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু লিপিকার তো মুক্তি নেই। যেখানেই যাক, কোহিনূরে অভিনয়ের দিনে তাকে কলকাতায় হাজির হতেই হবে। একবার মফস্বল থেকে ফিরতে গিয়ে ট্রেন বিভ্রাট হলো। নির্ধারিত সময়ে অনুপস্থিত থাকার জন্য বীরেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে আইনের ভয় দেখিয়েছেন। ডাক্তারের মিথ্যে সার্টিফিকেট দিয়ে লিপিকা সে-যাত্রা ক্ষতিপূরণের হাত থেকে বেঁচেছে।

এইভাবে শরৎকুমারের চলে না। সাংবাদিকদের বিরূপ মন্তব্য

পড়ে মফঃস্বলের দর্শকরাও তাকে চায় না। কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে বেচারা এখন এমারেল্ড থিয়েটারে অর্ডিনারি পার্শ্ব চরিত্রের পার্ট নিয়েছে। শরৎকুমার ক্রমশ ভেঙে পড়ছে—সে ভাবছে যাত্রা দলে ঢুকবে কিনা। চিৎপুরের জীবন অপেরায় একটা সুযোগ আসতে পারে।

"অধরদা, আপনি কোনো উকিলকে চেনেন?" উদ্বিগ্ন লিপিকা একদিন গোপনে অধরদার সাহায্য প্রার্থনা করেছে।

কয়েকদিন থেকে অধরের শরীর মোটেই ভাল যাচ্ছে না। পয়সার অভাবে ডাক্তারের কাছে যেতে পারছে না। কয়েকটা হোমিওপ্যাথিক বড়ি খেয়ে সুস্থ হবার চেষ্টা করছে অধর চাটুজ্যে। লিপিকার চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে অসুস্থ অধর বলেছে, "উকিলের খোঁজই করো দিদি। বক্স আপিসের যা অবস্থা দেখছি, এ-নাটক কতদিন চলবে ঠিক নেই। কেউ কেউ বলছে, সায়েব এই নাটককে লণ্ডনের 'মাউসট্র্যাপ' নাটকের মতো বছরের পর বছর চালিয়ে যাবেন। জানো তো আগাথা ক্রিস্টির ওই বইয়ের কথা—কুড়ি বছর একটানা অভিনয় চলছে, বন্ধ হবার কোনো নাম নেই।"

অধর অনেক ভেবেছে। বড় কোনো উকিলের সঙ্গে তার পরিচয় নেই। আগেকার যুগ ছিল অন্যরকম। তখন ডবলু সি বনার্জি থেকে আরম্ভ করে স্যর নৃপেন সরকার পর্যন্ত বাঘা—বাঘা ব্যারিস্টাররা থিয়েটারের মানুষদের ভালবাসতেন, তাদের সুখদুঃখে পাশে এসে দাঁড়াতেন। এখনও নিশ্চয়

তেমন মানুষ আছেন, কিন্তু অধরের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় নেই।

লিপিকার জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছে অধর চাটুজ্যের। কেন যে এই মেয়েটাকে অধর অন্তর থেকে স্নেহ করতে আরম্ভ করেছে তা নিজেই বুঝতে পারে না। অধর মনে মনে বলে, "সারাজীবন ধরে এই থিয়েটার লাইনে শুধু রঙ-বেরঙের প্রজাপতি দেখেছি—এই প্রথম আগুনের ফুলকি নজরে পড়ল। থিয়েটারের টিকটিকি গিরগিটিগুলো সুযোগ পেলেই প্রজাপতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অসহায় প্রজাপতিগুলো রঙিন পাখা নাড়তে-নাড়তে ওদের গর্ভে চলে যায়। এবার যদি ধাড়ি গিরগিটির শিক্ষা হয়। সাবধান, আগুনের ফুলকি ধরতে এসেছ বাছাধন।"

লিপিকা একদিন দুঃখ করে বললো, "অধরদা, আপনার ডবল চরিত্রের নাটকটার কিছুই করতে পারলাম না। অভাগিনী আমি, যে-আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে সেই বিপদে পড়ে যায়। বাবা-মায়ের আশীর্বাদ না-নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, তাই বোধ হয় এই শাস্তি।"

"ছিঃ দিদি।" অধর চাটুজ্যে বকুনি লাগিয়েছে লিপিকাকে। "নাটক-নভেল কি একদিনে ফুরিয়ে যাবার জিনিস? তোমার কাছে তো রইলো ম্যানাসক্রিপটা—একদিন এই নাটক থেকে তোমার এবং আমার ভীষণ নাম হবে। তখন আমি হয়তো বেঁচে থাকবো না। কিন্তু কী এসে যায় তাতে? মৃত্যু না-হওয়া পর্যন্ত কোনো লেখকেরই মূল্য যাচাই হয় না।"

উত্তেজিত অধর চাটুজ্যে ইতিমধ্যে রাত জেগে আর একখানা নাটক লিখে ফেলেছে। শরৎকুমারকে সরিয়ে দিয়েছেন বীরেশ্বর। কিন্তু লিপিকা এখনও আছে—সে হারবে না, একা লড়াই করে যাবে। তাই অধরদার নতুন নাটকে একটিমাত্র চরিত্র—অথচ নাম 'সম্রাট ও সুন্দরী'। সম্রাটের শনির দৃষ্টি পড়েছে এক সুন্দরীর

ওপর—তারই মর্মস্পর্শী কাহিনী। লিপিকাকে ডেকে অধর বলেছে, "যদি তোমার ডাক শুনে কেউ না আসে, তা হলে তুমি একলাই যাতে চলতে পারো সেইজন্যে এই ব্যবস্থা করলাম। তুমি একা-একা এই নাটক অভিনয় করতে পারবে।"

সজল চোখে লিপিকা সেই নাটকের পাণ্ডুলিপি অধরদার হাত থেকে নিয়েছিল। তারপর রুসীদার কাছে উকিলের খোঁজ করতে গিয়েছিল।

উকিলের বাড়িতে লিপিকা অনেক সময় কাটিয়েছিল। নরেন বোস কনট্রাক্ট খুঁটিয়ে পড়ে লিখিত মতামত দিয়েছিলেন। লিপিকাকে বলেছিলেন, "পড়ে দেখবেন। আপনার সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। কোনো লোক অবশ্যই আপনাকে প্রতিদিন আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অভিনয় করতে বাধ্য করতে পারেন না; কিন্তু আপনি তাকে যদি ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, তা হলে তা মানতে হবে। ডাক্তারী সার্টিফিকেটের জোরে আপনি এক-আধদিন ঘরে বসে থাকতে পারেন, কিন্তু সে-সময় অন্য কোথাও অভিনয় করলে ক্ষতিপূরণের দায়ে পড়ে যাবেন।" বিরক্ত ও বিস্মিত নরেন বোস আরও জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এমন কনট্রাক্টে সই করলেন কী করে?"

পরমুহূর্তে নরেন বোসের মনে পড়লো, এদেশের কোন্ সাধারণ মানুষ দেখেশুনে বুঝেসুঝে কাগজপত্র সই করে? স্ট্যাম্প-লাগানো দলিলে, হাজার হাজার সরকারী-বেসরকারী ফর্মে খুদে খুদে অক্ষরে, অবোধ্য ভাষায় কত কথাই তো লেখা থাকে—লোকে কিছু না-জেনে ভগবানের নাম করে নির্দিষ্ট জায়গায় স্বাক্ষর বসিয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে। এই নিয়মই তো ইংরেজ রাজত্বের গোড়া থেকে এদেশে চলেছে।

উকিলের বাড়ি থেকে লিপিকা সোজা কোহিনূরে চলে এসেছিল। নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে অধর চাটুজ্যে সেদিন

ছোট্ট এক ভূমিকায় নামছেন। রঙমাখা অবস্থায় অধর চাটুজ্যে কাছে এসে ফিসফিস করে জানতে চেয়েছিল, "কোনো খবর আছে নাকি?"

অভিনয়ের মধ্যিখানে উকিলের কথা ভেবে নিজের মুড নষ্ট করতে চায় না লিপিকা। ডবল-শোয়ের শেষে কথা বলবে বলেছিল লিপিকা।

কিন্তু কথা বলা হলো না। সেকেণ্ড শোয়ের মাঝামাঝি সময় বুকে হাত চেপে অধর চাটুজ্যে সাজঘরের ধুলোভর্তি মেঝের ওপর শুয়ে পড়েছিল। অস্পষ্ট গোঙানির শব্দে কর্মচারীরা ছুটে এসেছিল। নরহরি এবং অন্য লোকরা অচৈতন্য অধরকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। হাসপাতালে যেতে চায় নি অধর, বাড়ি যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল।

সেই রাত্রেই অভিনয়ের শেষে লিপিকা ছুটে যেতে চেয়েছিল অধরের বাড়িতে। দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীটের বিপজ্জনক গলিতে অত-রাত্রে একলা যেতে সকলে বারণ করেছিল লিপিকাকে। সারারাত ঘুম আসে নি লিপিকার। জীবনের স্রোতে ভাসতে ভাসতে বারাণসী থেকে কলকাতায় এসে হঠাৎ কীভাবে এই অধর চাটুজ্যেকে আপন করে ফেলেছে লিপিকা।

ভোরবেলাতেই লিপিকা ছুটেছিল অধরের বাড়িতে। সঙ্গে পাঁচশ টাকা নিয়েছিল লিপিকা, চিকিৎসার জন্যে। অধর বিছানায় শুয়ে লিপিকাকে দেখে খুব খুশী হলো। তাকে কাছে আসতে ইঙ্গিত করলো। তারপর জীবন-মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়ে স্নেহময় অধর ফ্যালফ্যাল করে লিপিকার দিকে তাকিয়ে রইলো। সারা জীবন ধরে বিনা প্রতিবাদে সমস্ত শোষণ ও অবিচার যে নীরবে সহ্য করেছে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেও তীব্র প্রতিবাদে জ্বলে উঠলো। লিপিকাকে কাছে ডেকে উত্তেজিত অধর বললো, "তুমি আমাদের বহ্নিশিখা। তুমি কিন্তু হার মেনো না দিদি। যেমন

করে হোক সম্রাটকে শিক্ষা দিও—আমার নাটকে সেইরকমই লিখে গিয়েছি।"

অধরের কপালে হাত বুলোতে-বুলোতে লিপিকা বললো, "আপনি এখন উত্তেজিত হবেন না, অধরদা।"

অধরদার ঠোঁট কেঁপে উঠলো কিন্তু জিভ জড়িয়ে আসছে। কোনোরকমে অধরদা বললো, "আমি ভেবেছিলাম শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে তোমাকে নতুন একটা পথ দেখিয়ে দেবো। কিন্তু সময় হবে না। আমার ড্রপসিন পড়তে দেরি নেই। তুমি শুধু মনে রেখো, সায়েব ছাড়াও খাতায়-কলমে কোহিনূর থিয়েটারের আর একজন মালিক আছে – সায়েবের ছেলে, যার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ নেই। টাকার লোভে সায়েব পারে না এমন কাজ নেই। এই লোক কী করে বিপ্লবী গণেশ মিত্রের সঙ্গে দেশপ্রেম করেছে ভগবান জানেন।" হাঁপাতে হাঁপাতে অধর বললো, "সায়েবের প্রাণের বন্ধু নেদো মল্লিক অনেক কিছু জানে।"

আরও কিছু গোপন কথার পর যন্ত্রণায় নীল হয়ে উঠলো অধরের মুখ। "আমার বুক গেলো, বুক গেলো।" মঞ্চমুগ্ধ অধর চাটুজ্যে কাতর ক্রন্দন করে উঠলো।

অধর চাটুজ্যের মরদেহ কোহিনূর থিয়েটারে আনা হয়েছিল। নিচুতলার কর্মীরা কাঁদতে কাঁদতে শেষবারের মতো তাদের প্রিয় অধরদার মুখ দেখেছিল। অভিনেতা অভিনেত্রীদের অনেকেই অধরবাবুর হাত ধরে প্রথম কোহিনূর থিয়েটারে এসেছিল। মধুমালতী কাঁদতে-কাঁদতে একটা মোটা বেলফুলের মালা নিজের হাতে অধরদার গলায় পরিয়ে দিল। চুপি চুপি মধুমালতী বললো, "এই যেন কোহিনূরে তোমার শেষ আসা হয়, অধরদা। সমস্ত জীবন অনেক কষ্ট পেয়েছো, অধরদা—আর কখনও থিয়েটারের এই লাইনে তুমি ফিরে এসো না।"

এমন সময় লরি-টায়ারের মতো বিরাট এক ফুলের রিঙ নিয়ে অফিসঘর থেকে নিচে নেমে এলেন বীরেশ্বর রক্ষিত। ঢাউস সাইজের সেই পুষ্পার্ঘ্য তুলতে তুজন কর্মচারী বীরেশ্বরকে সাহায্য করলো। ক্যামেরার ফ্ল্যাশে ছবি উঠলো। বীরেশ্বর বললেন, "নরহরি, আজকের মতো বুকিং আপিস বন্ধ করে দাও। কোহিনূরের সমস্ত বিভাগ আগামীকাল বন্ধ রইলো।"

বীরেশ্বর আড়চোখে উপস্থিত চরিত্রদের দেখলেন। লিপিকা সেন ছাড়া কেউ অনুপস্থিত নয়। "লিপিকাদি খবর পান নি?" একজন কর্মচারী প্রশ্ন করলো।

"কেন খবর পাবে না?" বীরেশ্বর গম্ভীরভাবে বললেন, "আসা না-আসা মানুষের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে।"

শোকযাত্রা নিমতলা ঘাটের দিকে এগিয়ে চললো। বীরেশ্বর নিজের আপিসঘরে ফিরে এলেন। ক্যালেণ্ডার এবং ঘড়ির দিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন বীরেশ্বর রক্ষিত। সোমবারে মরে অধর চাটুজ্যে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছে। বৃহস্পতি, শনি কিংবা রবিবারে মরলে বীরেশ্বরকে ফল্স্ পজিশনে পড়তে হতো। শো বন্ধ রাখবার জন্যে কর্মীরা চাপ দিতো, কিন্তু রাম-শ্যাম-যতু-মধুর মৃত্যুর জন্যে টিকিট রিফাণ্ড দিতে হলে বীরেশ্বরের ব্যবসা চলবে কী করে?

লিপিকা কেন অধরকে দেখতে এলো না? বীরেশ্বর ইদানীং খবর পাচ্ছিলেন, তুজনের দহরম-মহরম বেড়েছে। খবরটা তাহলে সত্যি নয়, নরহরি ও সুহাসিনী তুজনেই মিথ্যা কথা বলেছে।

অধরের মৃতুর জন্যে মোটেই তুঃখ হচ্ছে না বীরেশ্বরের। তাঁর নামে নাটকগুলো অধর লিখে দিয়েছে সত্য, মুখের ওপর লোকটা কখনও কথা বলে নি তাও ঠিক, কিন্তু লোকটার চোখ তুটোকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতেন না বীরেশ্বর। নাটকের পাণ্ডুলিপি বীরেশ্বরের হাতে তুলে দেবার সময় মনে হতো অধরের দৃষ্টি

বড় শীতল, একটুও উত্তাপ নেই—চোখ দুটো যেন কোল্ড স্টোরেজের ডিপফ্রিজে এক মাস রাখা ছিল। ওই চোখ দুটোকে বীরেশ্বর কোনোদিন ক্ষমা করবেন না।

মধুমালতী নিঃশব্দে কখন বীরেশ্বরের ঘরে ঢুকেছে। বীরেশ্বর দেখলেন অধরদার জন্যে কেঁদে কেঁদে ওর চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল হয়ে আছে। মেয়েরা বড় নরম হয়, বীরেশ্বর ভাবলেন।

বীরেশ্বর আজ কেষ্টদাস কুণ্ডু স্ট্রীটে পদধূলি দেবার কথা জানিয়ে রেখেছিলেন। আঁচলে চোখ মুছে মধুমালতী বললো, "আজ আমার শরীরটা তেমন ভাল লাগছে না, বীরেশ্বরবাবু।"

ইঙ্গিতটা বুঝলেন বীরেশ্বর। মুখে দুঃখের ভাব ফুটিয়ে বললেন, "অধরের জন্যে আমার মনটাও খুব খারাপ মালতী। আজ যদি আমি ছুটি নিই? কাল রাতে দেখা হবে কেমন?"

নিজের বাড়িতে সন্ধ্যা-আহ্নিকে বসেছিলেন নেদো মল্লিক। আত্মীয়স্বজন বলতে তাঁর এখন কেউ নেই। দূর সম্পর্কের এক ভাইপো মাঝে মাঝে টেলিফোনে খবর নেয়, বুড়ো এখনো বেঁচে আছে কিনা।

একটু আগে নদীয়াচাঁদ মল্লিক বেশ নাটকীয় পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন। নিজের মনে গড়গড়া টানতে-টানতে একখণ্ড 'ভারতের সাধক' পড়ছিলেন নেদোবাবু। এমন সময় শুকনো মুখে মেয়েটি তাঁর ঘরে ঢুকেছিল। প্রথমে চিনতে পারেন নি নেদো—কোথায় যেন দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে। তারপর বুঝতে

পারলেন রঙ্গমঞ্চের গরীয়সী নর্তকীই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। "এসো মা, বোসো মা", নেদো সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। "রঙচঙ না-মাখলে তোমাদের চেনাই যায় না। বীরেশ্বরের বোর্ডে কতবার তোমাকে দেখেছি। তুমি খুব ভাল পার্ট বলো।"

বিষণ্ণ লিপিকা এরপর কাপড়ের খুঁটে চোখের জল মুছে কাতরভাবে বলেছিল, "বীরেশ্বরবাবুর হাত থেকে আমাকে বাঁচান, মিস্টার মল্লিক।"

অভাবনীয় এই পরিস্থিতিতে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন নেদো মল্লিক। লিপিকা অসহায়ভাবে বলেছিল, "আমি শুধু কোহিনূর থেকে মুক্তি চাই, মিস্টার মল্লিক। আমি কী অপরাধ করেছি যে এইভাবে আমাকে বেঁধে রাখবেন উনি?"

মুহূর্তের জন্যে বীরেশ্বরের প্রতি প্রচণ্ড রাগ অনুভব করেছিলেন নেদো মল্লিক। কিন্তু বীরেশ্বর রক্ষিত এখন তাঁর আয়ত্তের বাইরে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পরে গম্ভীর মুখে নেদো মল্লিক নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন। "আমি বীরেশ্বরের কেউ নই, বিশ্বাস করো।"

"যদি কেউ পারে সে আপনিই পারবেন, আমি শুনেছি," কাতর অনুনয় করেছিল লিপিকা। নেদো মল্লিকের মুখের দিকে তাকিয়ে লিপিকার মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক হচ্ছে।

জীবনে অনেক অপরাধ করেছেন নেদো মল্লিক। কিন্তু অসহায় মেয়েমানুষের চোখের জল তিনি সহ্য করতে পারেন না। মুহূর্তের জন্যে নেদো মল্লিক জ্বলে উঠলেন। বললেন, "বীরেশ্বরের কাছে একসময় আমার কথার অনেক দাম ছিল। বীরেশ্বর তখন সারপেনটাইন লেনের ভাঙা বাড়িতে থাকতো, কিন্তু সেদিন অনেক আগে চলে গিয়েছে।"

"এখন? এখন কেউ সে রকম নেই।"

কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন নেদো মল্লিক, কিন্তু কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। তারপর অনেক কষ্টে লিপিকাকে বিদায় করেছেন নেদো মল্লিক। মেজাজটা নষ্ট হয়ে গেলো। নির্জনে হুইস্কির বোতল নিয়ে সন্ধ্যা-আহ্নিকে বসে নেদো মল্লিক নিজের মনেই বলেছেন, "বীরেশ্বর তুমি বড় বেশী এগিয়ে যাচ্ছো। ভগবানের রাস্তায় ট্রাফিকের যেসব নিয়ম-কানুন লেখা রয়েছে—'নো এনট্রি', 'নো পার্কিং', 'স্পিড লিমিট' কিছুই তুমি মানছো না।"

একটু পরে বীরেশ্বর নিজেই নেদো মল্লিকের আসরে হাজির হলেন। "কী খবর দাদা ?" বীরেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি তো রিটার্ন-জার্নির টিকিট কেটে মালপত্তর ওজন করিয়ে ট্রেনের অপেক্ষায় ভগবানের প্ল্যাটফর্মে বসে আছি! তোমার খবর কি বীরেশ্বর ?"

এইসব আধ্যাত্মিক কথা বীরেশ্বরের মাথায় ঢোকে না। বীরেশ্বর বললেন, "আর দাদা, হাজার রকম ঝামেলা লেগেই আছে।"

"তার মানে এখনও তুমি পার্সোনাল লাগেজ বাড়িয়ে যাচ্ছো ? বীরেশ্বর, ভুলে যেও না আমরা সবাই ওয়েটিং রুমের প্যাসেঞ্জার—পাকা ঘর-বাড়ি বানিয়ে বসবাস করবার জন্যে আমরা কেউ পৃথিবীতে আসি নি। আমাদের প্রত্যেকের পকেটেই ভগবানের টাইম-টেবিল রয়েছে।"

"বাজে-বাজে ওই ধর্মের বইগুলো পড়া ছাড়ো। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ", বীরেশ্বর মন্তব্য করলেন।

"টাইম-টেবিল যখন তুমি দেখবে না প্রতিজ্ঞা করেছো, তখন কিছু রসের কথা শোনাও," নেদো মল্লিক অনুরোধ করলেন। "তার আগে মায়ের চরণামৃত একটু মুখে দাও।"

"মাফ করো দাদা", বীরেশ্বর মদ খেতে রাজী হলেন না। মদ জিনিসটা তাঁর ভাল লাগে না। নেদো মল্লিক ছাড়া আর কেউ কোনোদিন তাঁকে মদস্পর্শ করতেও দেখে নি।

"বীরেশ্বর, মদ না খেয়েও তোমার চোখে এতো রঙ! রহস্যটা কী বলতে পারো?" নেদো মল্লিক সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন।

বীরেশ্বর হাসলেন, একটা কোকাকোলার বোতল খুলে গেলাসে ঢালতে-ঢালতে বললেন, "মদের থেকে কোকাকোলায় তো রঙ বেশী, নাড়ুদা।"

"তুমি নাট্যকার নির্দেশক। আমি পুলিস এবং শেয়ারের ভূতপূর্ব দালাল। তোমার সঙ্গে সংলাপে পারবো কী করে, ব্রাদার? তুমি যা বলতে চাইছিলে বলো।"

বীরেশ্বর বললেন, "হাজার রকম ঝামেলা, দাদা। সিমেন্ট গোডাউনে এনফোর্সমেন্টের লোক তীর্থ করতে এসেছিল।"

"মানে?"

"মানে একটু গঙ্গামাটির খোঁজ করতে! মোটা প্রণামী দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করতে হলো। লিজ-দেওয়া প্রপার্টির ওপর আদালতে ইনজাংশন চাপাবার চেষ্টা করছিল, উকিল মারফত অন্য পার্টিকে মোক্ষম ল্যাং মারলুম। যুব পার্টির ছোকরা ফ্রি-পাস এবং মোটা টাকা চাঁদা আদায় করতে এসেছিল। খরচ কমাবার জন্যে লেকচার দিলুম—সমাজের যা-কিছু অত্যাচার-অনাচার তারই বিরুদ্ধে তো নাট্যকার বীরেশ্বর রক্ষিত ফাইট করে যাচ্ছে, জনমত গড়ে তুলছে। মধুমালতী একটু বেঁকে বসেছে—তার দুঃখু এখনও তাকে সতেরো বছরের ছুঁড়ী-নায়িকার পার্ট দিচ্ছি না কেন? মিষ্টি কথায় মেয়েমানুষের চিঁড়ে ভেজাতে হলো।"

"তারপর?" নেদো ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

লিপিকার প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বীরেশ্বর বললেন, "তারপর শ্যামার সংসার। ছুটিতে খোকা আমেদাবাদ থেকে ফিরেছে। ছোকরা ওখানে কী বিদ্যে শিখছে ভগবান জানেন। এদিকে শ্যামার ভীষণ ইচ্ছে, বাড়িতে লালটুকটুকে একটি বউমা আনে।"

"তা গিন্নি যখন আব্দার করছে তখন আপত্তি কী?" নেদো মল্লিক উৎসাহ দেখান।

বীরেশ্বর বরফ-ঠাণ্ডা কোকাকোলায় লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন, "কোন্ দুঃখে আমার আপত্তি থাকতে যাবে? দেহবল, বুদ্ধিবল, ধনবল তোমার বীরেশ্বরের আছে—নেই শুধু লোকবল। সুতরাং বাড়িতে একজন লোক বাড়লে আমার পক্ষে ভাল। কিছু কিছু সম্পত্তি আর একটা নামে ট্রান্সফার করে দেওয়া যাবে।"

"তা হলে লাগিয়ে দাও, বীরেশ্বর। মাথায় কোনো মতলব চাপলে তুমি তো চুপ করে বসে থাকো না," নেদো মল্লিক উৎসাহ দিলেন।

"খোকনের কাছে আমার কথার কি কোনো মূল্য আছে?" বীরেশ্বর দুঃখ প্রকাশ করলেন।

"বীরেশ্বর, ওই এক জায়গায় তা হলে তোমার হুকুম চলে না। তোমার একমাত্র সন্তান নির্মল নিজের ইচ্ছেমতোই চলে—তাকে এখনও আয়ত্তে আনতে পারো নি।"

স্নেহশীল বীরেশ্বর শান্তভাবে বললেন, "যেমন ইচ্ছে তেমন চলুক, কী বলো দাদা? খোকনের যখন বয়স আর একটু বাড়বে, তখন নিশ্চয় বুঝবে কত ধানে কত চাল। বাবার ব্যবসাতে তখন নিশ্চয় আগ্রহ দেখাবে।" ছেলের ব্যাপারে বীরেশ্বর যে নির্মম হতে পারেন না তা নেদো মল্লিক লক্ষ্য করলেন।

"বীরেশ্বর, তোমার ছেলে এখন কী করে?" নেদো মল্লিক জিজ্ঞেস করেন।

"মোটা মোটা বই মুখে গুঁজে বসে থাকে। মায়ের সঙ্গে গল্প করে, আমি কাছে গেলেই কিন্তু সে-গল্প বন্ধ হয়ে যায়।" বীরেশ্বরকে বোকার মতো হাসতে দেখলেন নেদো মল্লিক।

"ছেলের যখন বই-পত্তরে রুচি রয়েছে তখন প্রথমেই সিমেন্টে

না ঢুকিয়ে থিয়েটারের দায়িত্ব দাও। ওটা তো শিক্ষিত লোকের লাইন।"

আমতা-আমতা করছেন বীরেশ্বর। "তোমার কাছে কিছুই তো চেপে রাখি না নাড়ুদা। খোকন এখনও পর্যন্ত আমার কোহিনূরের ভিতরটা পর্যন্ত দেখে নি। কোহিনূরের ভবিষ্যৎ যা-দেখছি, আমি চোখ বুজলেই বাতি নিভবে। অথচ এখন এইটাই সবচেয়ে লাভের ব্যবসা। এক পয়সা ফুর্তি ট্যাক্সো নেই। শেয়ার বাজারে আমার কপাল পুড়েছে মনে হচ্ছে। আমি লোকসানের পর লোকসান খাচ্ছি।"

নেদো মল্লিক এবার লিপিকার কথাটা পাড়লেন। চোখ বন্ধ করে বললেন, "বীরেশ্বর, একটা মেয়েকে তুমি নাকি জোর করে আটকে রেখেছো ?"

দেশলাই কাঠির মতো জ্বলে উঠলেন বীরেশ্বর। "কেউ লাগিয়েছে বুঝি ?"

"আমি মাল খাই, কাঁসি বাজাই। আমার কাছে কে লাগাবে ?" নেদো মল্লিক ব্যাপারটা পরিষ্কার করলেন না।

বিরক্ত বীরেশ্বর দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "সামান্য একটা নর্তকীকে আমি দয়া-পরবশ হয়ে নায়িকা করতে চেয়েছিলাম। অমনি সে মাথায় চড়ে বসতে চাইলো। আমাকে অপমান করে কেউ কোনোদিন ছাড়া পেয়েছে, নাড়ুদা ? বীরেশ্বরের কথা মতো না চললে ওই নর্তকী রাস্তায় ভিক্ষে করবে।"

বিরক্ত নেদো মল্লিক এবার একমনে আহ্নিক শুরু করলেন। নিজের গেলাস শূন্য করে জিজ্ঞেস করলেন, "তা হলে বীরেশ্বর ?"

"যে যেরকম কর্ম করবে তাকে সেইরকম ফল ভোগ করতে হবে, নাড়ুদা। তুমি সেখানে কী করবে ?" বীরেশ্বর উঠে পড়লেন এবং নেদো মল্লিকও আর কোনো কথা বললেন না।

বীরেশ্বরের ফাঁদ থেকে মুক্তি পাবার পথ খুঁজছে লিপিকা। তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নষ্ট করবার জন্যে মহাপরাক্রমশালী বীরেশ্বর যে বদ্ধপরিকর তা লিপিকা বেশ কয়েকজনের কাছে শুনেছে। এই ষড়যন্ত্র জাল থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠছে লিপিকা।

অনেক রকম চেষ্টা করেছে লিপিকা। কিন্তু বীরেশ্বর রক্ষিতকে পুরোপুরি চিনতে তার এখনও দেরি আছে। নতুন কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে অসহায় লিপিকা আবার এসেছিল নেদো মল্লিকের কাছে। বীরেশ্বরের ব্যবহারে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন নেদো মল্লিক। লিপিকাকে চেয়ারে বসিয়ে নেদো বললেন, "চেষ্টা করেছিলাম, মা। হলো না। টাকা এবং মেয়েমানুষের ব্যাপারে বীরেশ্বর কারও কথা শোনে না।"

ম্লান মুখে লিপিকাকে উঠতে দেখে নেদো মল্লিকের হঠাৎ দয়া হলো। জিজ্ঞেস করলেন, "উকিলরা কী বলছে? তোমার কোনো পথ খোলা নেই?"

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো লিপিকা। ওর অবস্থা বুঝতে পেরে নেদো বললেন, "আইনের কূট-বুদ্ধিতে কে আর বীরেশ্বরের সঙ্গে পেরে উঠবে? নিজের বউকে পর্যন্ত কাগজে-কলমে ডাইভোর্স করে রেখেছে।" গোপন খবরটা মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো।

চমকে উঠলো লিপিকা। তারপর মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বিদায় নিল।

এখন লিপিকার সামনে নতুন কোনো পথ খোলা রইলো না।

মরবার আগে অধরদা যে চরম পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন তা চেষ্টা করে দেখবার আগে আইনের দিকটা লিপিকা সাবধানে যাচাই করে নিতে চায়।

মনের এই অবস্থায় নরেন বোস উকিলের আলিপুরের বাড়িতে হাজির হয়েছে লিপিকা।

নরেন বোস ঝানু উকিল। বীরেশ্বরের পেপার ডাইভোর্সটা তিনিই ব্যবস্থা করেছিলেন। বিচক্ষণ উকিল বীরেশ্বরকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, "ভুলেও কলকাতায় কেস ফাইল করবেন না। পাবলিসিটি হবে। তাছাড়া আইন ফাঁকি দেবার জন্যে আইনের আশ্রয় নেওয়াটাও আইনসঙ্গত নয়।" নরেন বোস চুঁচড়ো না বহরমপুর কোথা থেকে কাজটা সুসম্পন্ন করেছিলেন।

সেই নরেন বোসের কাছে লিপিকার যাতায়াতের খবর বীরেশ্বর যথাসময়ে পেয়েছেন। সাধে কি আর পরশুরাম পাত্রকে লিপিকার ড্রাইভার হিসাবে মনোনীত করেছিলেন তিনি।

খবর পেয়ে চুপ করে বসে থাকেন নি বীরেশ্বর রক্ষিত। নরেন বোসের মুহুরীকে আগে অনেক টাকা বকশিশ দিয়েছেন। তারই সুবাদে মাত্র পাঁচখানা দশ টাকার নোটের বদলে লিপিকা সম্বন্ধে নরেন বোসের লিখিত পরামর্শেরএকটা কপি সংগ্রহ করে ফেলেছেন বীরেশ্বর।

টাইপ-করা সেই কাগজটা সামনে নিয়ে বীরেশ্বর মিটমিট করে হাসছেন। নিজের প্রতিভায় তিনি নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন। বীরেশ্বর ভাবছেন, আমেরিকায় জন্মালে নিশ্চয় তিনি সি-আই-এর গোয়েন্দা-সম্রাট হতে পারতেন। রুশিয়ায় জন্মালে কে-জি-বির কর্তা হতে পারতেন তিনি।

নরেন বোসের লিখিত মতামত পড়তে-পড়তে নিজের চোয়াল চেপে ধরলেন বীরেশ্বর। নর্তকী তাহলে জাল থেকে ছাড়া

পাবার জন্যে সব রকম পথ খুঁজে দেখছে। লিপিকা জানতে চেয়েছে, ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে কতদিন সে কোহিনূরে যাওয়া বন্ধ করতে পারে? নরেন বোস উত্তর দিয়েছেন, অসুখের অজুহাতে এক জায়গায় অনুপস্থিত থেকে অন্য কোথাও অভিনয় করা বিপজ্জনক। সুতরাং ছুটি নিলে হাত-পা গুটিয়ে বিছানায় বসে থাকতে হবে। তেমন সন্দেহ হলে লিপিকার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্যে বীরেশ্বর মেডিক্যাল বোর্ড তৈরির দাবি করতে পারেন।

সমস্ত রিপোর্টটা পড়তে পড়তে এক জায়গায় বীরেশ্বর গম্ভীর হয়ে উঠলেন। ব্যাপারটা মাথায় আসে নি তাঁর। নরেন বোস লিখছেন, চুক্তির উনিশ নম্বর শর্ত বেআইনী। চুক্তিপত্রে কোনো মেয়েকে প্রেগন্যাণ্ট না হবার শর্ত সংবিধানবিরোধী। সন্তান সম্ভাবনাকালে প্রতিদিন ক্যাবারে নৃত্যের প্রশ্নও ওঠে না। বীরেশ্বরের মাথা গরম হয়ে উঠলো। হতভাগী মেয়েটা বীরেশ্বর রক্ষিতকে কলা দেখাবার একটা পথ তাহলে পেয়েছে। সন্তান উৎপাদনের জন্যে এক বছর লিপিকাকে ছেড়ে দিতে হলে আমীর ও উর্বশী নাটকের কিছুই থাকবে না। বীরেশ্বর একটু চিন্তিত হলেন। হা-হা কার হাসলেন। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করার মতো দুঃসাহস লিপিকার হবে না। কিন্তু পুরো-পুরি বিশ্বাস নেই এই মেয়ে-জাতকে। রোখের মাথায় লিপিকার মতো মেয়ে সব কিছুই করে ফেলতে পারে—এমন এক সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হলেও বীরেশ্বরের ভাল লাগছে না। তাছাড়া বীরেশ্বর এখনও লিপিকাকে জয় করবার আশা ত্যাগ করেন নি। "লিপিকা, তোমাকে যে চাই আমি। তোমার মুখচুম্বন প্রত্যা-খ্যানের পর থেকেই শোয়ারবাজারে আমার ভাগ্যবিপর্যয় হয়েছে—এখনও আমি সামলে উঠতে পারছি না।"

আইনের গভীরে নিমগ্ন বীরেশ্বরের দুশ্চিন্তা বাড়ছে। এই মুহূর্তে সন্তানসম্ভবা এক নর্তকীর অস্পষ্ট ছবি তিনি দেখতে

পেয়েছেন। অসহ্য রাগে জ্বলছিলেন বীরেশ্বর। হঠাৎ মনে পড়লো, নতুন নায়ক সুদর্শনকুমারের সঙ্গে লিপিকা এখন খুব হেসে-হেসে কথা বলে। সুদর্শনকুমারকে একটু টাইট দিতে হবে, বীরেশ্বর ঠিক করলেন। স্টেজে যত খুশি হাসাহাসি, নাচানাচি, জড়াজড়ি করো আপত্তি নেই—কিন্তু স্টেজের বাইরে তুমি লিপিকার মুখদর্শন করবে না।

এদিকে লিপিকা শেষ চেষ্টা করে দেখেছিল মধুমালতীর সঙ্গে। চোখের জল মুছতে মুছতে লিপিকা বলেছিল, "এখানে আমার এক মুহূর্ত ভাল লাগছে না—আমার মুক্তির একটা পথ দেখিয়ে দিন, মালতীদি।"

মালতী কাঠের মতো স্তব্ধ হয়েছিল। লিপিকা ওর বাড়ি যেতে চেয়েছিল, কিন্তু বীরেশ্বরের নজরে পড়ার ভয়ে মধুমালতী বারণ করেছিল। "যাবজ্জীবনের আসামী তোমাকে কী পরামর্শ দেবে ভাই?" দুঃখের সঙ্গে বলেছিল মধুমালতী।

লিপিকা বলেছিল, "আমার মনে একটুও শান্তি নেই মালতীদি। কলকাতার বাইরে এক-আধদিন শখের থিয়েটার করে তবু একটু নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। সেখানে আমি সত্যিকারের অভিনয় করি, মালতীদি—এখানকার মতো হাজার লোকের সামনে উলঙ্গ হই না।"

লিপিকা আকুল নয়নে মধুমালতীর দিকে তাকিয়েছিল। মধুমালতী ওর পিঠে হাত রেখে বললো, "বিশ্বাস করো লিপিকা, আমার কথা উনি যদি শুনতেন, তাহলে কবে তোমাকে ছেড়ে দিতাম।"

লিপিকা, একদিন এই কোহিনূর থিয়েটারের অনেকে তোমার শুভানুধ্যায়ী ছিল। আজ অর্জুন, নরহরি, মধুমালতী সবাই তোমার থেকে দূরে সরে গিয়েছে। চাকুরির ভয়ে সুদর্শন তো তোমাকে ত্যাগ করেছে। লিপিকা, তুমি বন্দিনী। তোমার মুক্তির কোনো পথ নেই, এবার কি তুমি বীরেশ্বরের কাছে পরাজয় স্বীকার করবে?—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে লিপিকা নিজেকেই প্রশ্ন করছে। অবিন্যস্ত চুলের কয়েকটি গুচ্ছ লিপিকার মুখের কিছুটা ঢেকে দিয়েছে। চুলগুলো সরিয়ে উত্তেজিত লিপিকা তিড়িং করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। কোহিনূর থিয়েটারের সবাই হেরে যেতে পারে—কিন্তু লিপিকা কিছুতেই ধরা দেবে না। বীরেশ্বর রক্ষিতকে যোগ্য শিক্ষা সে দেবে।

প্রতিবিম্বে প্রতিফলিত লিপিকা প্রশ্ন করলো, "প্রেমের বদলে তুমি কি পেয়েছো?"—প্রবঞ্চনা।

লিপিকা তুমি ভুলো না, উলঙ্গের অবমাননা প্রতিদিন সহ্য করে তোমাকে বেঁচে থাকতে হয়েছে। যে তোমাকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেই ভক্ষণ করতে চায় তোমাকে।

আয়নার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে বলতে লিপিকা ক্রমশ পদদলিত সর্পিণীর মতো অশান্ত হয়ে উঠছে। এই কোহিনূর থিয়েটারে একজন মাত্র লিপিকার হৃদয় জয় করেছিলেন—তিনি অধরদা। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও অধরদা লিপিকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন। ঘর থেকে স্ত্রী-পুত্রকে বার করে দিয়ে অধরদা সেদিন লিপিকাকে বলেছিলেন, "ভেবেছিলুম সময়মতো

তোমাকে মতলবটা দেবো। সত্যিই যদি সম্রাটের হাত থেকে বাঁচতে চাও তাহলে এখন থেকে উঠে-পড়ে লাগো—এখানকার কেউ তোমার এক কড়া উপকারে লাগবে না।"

এরপর অধরদা কাশতে আরম্ভ করেছিলেন। কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। কোনোরকমে সামলে নিয়ে অধরদা বললেন, "মেয়েমানুষকে সুন্দর করে পৃথিবীতে পাঠিয়ে ভগবান তোমাদের সর্বনাশ করেছেন। হাজার হাজার দাঁতালো কুকুর মেয়েমানুষের মাংসের জন্যে জিব বার করে লালা ফেলছে।"

অধরদা বললেন, "যা অবস্থা বুঝছি, কেউ তোমার পাশে থাকবে না।"

অধরদা তারপর বলেছিলেন, "চেঙ্গিস খাঁর মতো নিষ্ঠুর এই বীরেশ্বরকে আমি খুব ভালভাবে স্টাডি করেছি। ওর কোথাও কোনো দুর্বলতা নেই—একমাত্র নিজের বেটা ছাড়া। আমি জানি একুশ বছর হওয়া মাত্রই ছেলেকে বীরেশ্বরবাবু খাতায়-কলমে থিয়েটারের পার্টনার করে নিয়েছেন। ছোকরা কী রকম আমি কিছুই জানি না—তবে আমড়া গাছেও অনেক সময় আম হয়।" অধরদার শেষ পরামর্শ, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়। পিতা-পুত্রের মধ্যে তেমন সদ্ভাব নেই—অধরদা কোথা থেকে খবর পেয়েছিলেন ঈশ্বর জানেন।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে লিপিকা এই মুহূর্তে উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে। বীরেশ্বরের সঙ্গে মিটমাট নেই—এই যুদ্ধ চলছে, চলবে। যদি প্রয়োজন হয় চরম পথই গ্রহণ করবে লিপিকা—নরেন বোস তো বলেছেন আইনের ভয় দেখিয়ে সন্তান-সম্ভাবনা বন্ধ করা যায় না।

কিন্তু তার আগে একবার অন্য চেষ্টা করে দেখবে লিপিকা। বীরেশ্বরের একমাত্র সন্তান নির্মল তো এখন কলকাতাতেই রয়েছে।

ডায়াল করতে গিয়েও লিপিকার দ্বিধা আসছে। ছেলের কাছে বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে কখনও লাভ হতে পারে? কিন্তু লিপিকা এবার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলো।

মাত্র কয়েক সপ্তাহের ছুটিতে এসেছে নির্মল। আমেদাবাদে আর ফিরে না যেতে মা অনেকবার অনুনয় করেছেন। কিন্তু নির্মল লেখাপড়ার এই সুযোগ ছাড়তে চায় না। মাকে যতখানি সম্ভব সান্নিধ্য দেয় নির্মল—বীরেশ্বর এই বাড়িতে থেকেও যে নেই তা বুঝবার মতো বয়স তার হয়েছে।

মায়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে ছুটির অর্ধেক ইতিমধ্যেই ফুরিয়েছে। বাকি কয়েকটা সপ্তাহ এইভাবেই হুস করে কেটে যাবে। খোকন মাকে আশ্বাস দিয়েছে, নতুন পড়াশোনায় তাকে একটা থিসিস লিখতে হবে। থিসিসের কাজে তাকে মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতে হবে।

মায়ের সঙ্গে গল্প শেষ করে সবে একখানা বই নিয়ে নির্মল চেয়ারে বসেছে এমন সময় টেলিফোন।

অপরিচিত নারীকণ্ঠ শুনেই বিব্রত বোধ করেছিল নির্মল। লিপিকার পরিচয় পেয়ে আরও অস্বস্তি। হয়তো কোনো কথাই বলতো না নির্মল। কিন্তু টেলিফোনের অন্যপ্রান্ত থেকে লিপিকা কাতর আবেদন করেছিল, "আপনার সঙ্গে আমার ভীষণ প্রয়োজন, নির্মলবাবু।"

"আমি আপনাকে চিনি না জানি না," নির্মল এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। লিপিকা সম্বন্ধে সে এখনও কিছু জানে না।

লিপিকা তার সমস্ত অভিনয় শক্তি ঢেলে দিয়ে কাতরভাবে টেলিফোনে বলেছিল, "অজানা ডুবন্ত মানুষকেও তো লোকে উদ্ধার করে নির্মলবাবু।"

থিয়েটারের এই অপরিচিতা মেয়েটি যে সত্যিই বিপদে পড়েছে তা নির্মল বুঝতে পারছে। এরকম অস্বস্তিকর অবস্থায় সে কখনও পড়ে নি।

সানি পার্কের এই বাড়িতে লিপিকাকে আসতে বলা যায় না। নির্মলকে লিপিকা তার পার্ক সার্কাসের বাড়িতেও আসতে বলতে চায় না। অবশেষে গ্রেট-ইণ্ডিয়ান হোটেলের কথা তুললো লিপিকা। নির্মল রাজী হয়ে গেল।

নির্মল যে দেখা করতে রাজী হবে তা লিপিকা প্রত্যাশা করেনি। টেলিফোন নামিয়ে মনের আনন্দে সে একটু নেচে নিলো, তারপর রুসীদার সঙ্গে যোগাযোগ করলো লিপিকা। হোটেল ম্যানেজারের অফিসঘরে বসেই লিপিকা কিছুক্ষণ নির্মলের সঙ্গে কথা বলতে চায়।

দ্রুত সাজগোজ করে ফেললো লিপিকা। নতুন এই অ্যাড-ভেঞ্চারের উত্তেজনা তাকে অস্থির করে তুলছে। বাড়ির বাইরে এসে লিপিকা একটা ট্যাক্সি ধরলো। ড্রাইভার পরশুরাম পাত্র গাড়ির ভিতরেই বসেছিল—কিন্তু ইদানীং তাকে একটু সন্দেহ করছে লিপিকা। উকিল নরেন বোসের কাছে যাতায়াতের খবরটা থিয়েটারের দু'একজন জেনে গিয়েছে। মুটকী সুহাসিনী সেদিন একগাল হেসে লিপিকাকে বললো, "কেন ভাই রাগারাগি করে উকিলের কাছে ছুটছো। সায়েব যা বলছে শোনো। আমি বলছি তোমার কোনো দুঃখু থাকবে না। সোনাদানা, হীরে-জহরতে সায়েব তোমায় মুড়ে রাখবে। যখন যা আব্দার করবে তাই পাবে। তুমি একবার বললে সায়েব ওই মধুমালতী মাগীকে বিল্লিপত্তর গুঁকিয়ে তোমাকে একমাত্র হিরোইন করে দেবে।"

লিপিকা রেগে বলেছিল, "মস্ত এক অ্যালসেশিয়ান কুকুর পুষেছি। সায়েবকে আমার বাড়ির সিঁড়ির কাছে দেখলেই বিপদ হবে।"

গ্রেট-ইণ্ডিয়ান হোটেলে নির্মলের সঙ্গে সেই প্রথম সাক্ষাতের দৃশ্য লিপিকার বুকের মধ্যে গেঁথে রয়েছে। বীরেশ্বর রক্ষিতকে দেখে তার ছেলে সম্বন্ধে লিপিকা যা কল্পনা করেছিল তা একটুও মিললো না। দীর্ঘ খেলোয়াড়ী চেহারা। শরীরের কোথাও মেদাধিক্য নেই। নির্মলের চোখ দুটো মোটেই বীরেশ্বরের মতো নয়। বীরেশ্বরের বিশাল শরীরের তুলনায় রীতিমতো ছোট চোখ দুটোর মধ্যে হিংস্রতা আছে। নির্মলের চোখ টানা-টানা এবং সত্যি নির্মল।

এক মাথা কোঁকড়া চুল তেমন সুশাসিত নয়। নির্মলের চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। বীরেশ্বরের ছেলে এমন নাক পেলো কোথায়? লিপিকার হঠাৎ খেয়াল হলো যে মিসেস রক্ষিতকে সে কখনও দেখে নি।

"আপনাকে এর আগে কোনোদিন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না।" লিপিকার এই কথায় নির্মল সহজভাবে বললো, "কেমন করে দেখবেন? আমি তো কোনোদিন কোহিনূর থিয়েটারে যাই নি।"

নির্মল এবার গম্ভীরভাবে লিপিকার দিকে তাকিয়ে রইলো।

নির্মলের দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে লিপিকা বললো, "আমাকে ক্ষমা করবেন, মিস্টার রক্ষিত। কোনো রকম পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও আপনাকে এইভাবে বিরক্ত করতে বাধ্য হয়েছি আমি।"

ব্যাপারটা গুরুতর কিছু তা নির্মল আন্দাজ করতে পারছে। কিন্তু সমস্যাটা কী হতে পারে তা সে বুঝতে পারছে না। নিজের অস্বস্তি যথাসম্ভব চেপে রেখে নির্মল এবার লিপিকার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। হোটেলের নর্তকীরা অশিক্ষিতা এবং আন-কালচার্ড হয় বলেই নির্মলের ধারণা ছিল। কিন্তু লিপিকার ভাবভঙ্গি চালচলনে কোনো অশালীনতা নেই, বরং বেশ একটা নম্রভাব রয়েছে।

নির্মল এবার গম্ভীরভাবে বললো, "মিস সেন, সিমেণ্ট, রিয়েল এস্টেট, থিয়েটার, বাবার কোনো বিজনেসের সঙ্গেই আমার সম্পর্ক নেই। কলকাতায় এলে সানি পার্কে বাবার বাড়িতে থাকি এই পর্যন্ত।"

বাবার ব্যাপারে কিছু করতে পারবে না বলেই নির্মল যে এই কথা শুনিয়ে রাখছে, তা লিপিকা বুঝতে পারে। এই রকম যে হতে পারে তা লিপিকারও জানা উচিত ছিল। শুধু শুধু সময় নষ্ট করলো লিপিকা—খবরটা বীরেশ্বরের কানে গেলে তিনি আরও তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবেন।

কয়েক মুহূর্ত নীরব হয়ে রইলো লিপিকা। চায়ের কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে সবেমাত্র পরিচিত বীরেশ্বরপুত্রের মুখের দিকে সে তাকিয়ে রইলো। অধরদার মুখটা আর একবার স্মরণ করলো লিপিকা। মনের গভীর অনুভূতি চেপে রেখেই শান্ত সংযত লিপিকা বললো, "নাই বা কিছু করতে পারলেন, মিস্টার রক্ষিত। সংসারে সবাই কি পারে সবাইকে সাহায্য করতে? তবু শুনুন না, সামান্য একজন নর্তকী-অভিনেত্রীর দুঃখের কথা।"

অসহায় লিপিকার ছন্নছাড়া জীবনের সেই কাহিনী শেষ হতে প্রায় একঘণ্টা লেগেছিল। পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে নির্মল সে-কাহিনী শুনেছে। বীরেশ্বরের কর্মজীবন যে পুত্রের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত তা নির্মলের দু একটি প্রশ্ন এবং মুখচোখের ভাব দেখেই লিপিকা বুঝতে পেরেছে।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত বীরেশ্বরপুত্র এখনও সব কথা বিশ্বাস করতে পারছে না। ধীরে ধীরে মুখ তুলে মোটা কাঁচের চশমার মধ্য দিয়ে লিপিকার দিকে তাকিয়ে নির্মল এবার প্রশ্ন করলো, "তাহলে আপনি বলছেন, কোহিনূর থিয়েটারের কোনো বই-ই বাবার লেখা নয়? সাহিত্যিক অধর চাটুজ্যে প্রায় অনাহারে বিনা চিকিৎসায়

মারা গিয়েছেন ? প্রত্যেক কর্মচারীর আগাম সইকরা পদত্যাগ-পত্র বাবার আলমারিতে আছে ?"

লিপিকা এখন উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে। তার চোখে জল। সে কোনো উত্তর দিতে পারলো না। কিন্তু তার মুখ দেখেই প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাচ্ছে নির্মল।

বিকেল গড়িয়ে কখন সন্ধ্যা নেমেছে, গ্রেট-ইণ্ডিয়ান হোটেলের আলোকিত অফিসঘরে বসে তা বোঝা যায় নি। পাথরের মতো নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে আছে আমেদাবাদ ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল রিসার্চের ছাত্র নির্মল রক্ষিত। লজ্জায় অপমানে সে মাথা নিচু করে রয়েছে, যদিও বীরেশ্বরের ব্যক্তিগত লালসার ব্যাপারটা আজকের কাহিনী থেকে লিপিকা সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছে।

চোখের চশমাটা খুলে রুমালে মুছতে মুছতে নির্মল প্রশ্ন করেছে, "আপনি বলছেন, কোহিনূরের কর্মচারীরা, শিল্পীরা তবুও চুপচাপ রয়েছেন ? তাঁদের নিজস্ব কোনো দায়িত্ব নেই ?"

লিপিকা নিজেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর নির্মলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, "এই থিয়েটারের প্রধান অংশীদার হয়ে আপনিও তো কোনো খোঁজখবর রাখলেন না, নির্মলবাবু।"

ব্যাপারটা মনেই ছিল না নির্মলের। বাবার অনেক কাগজ-পত্তরে তার নামটাও জড়ানো আছে। এসব করবার আগে বাবা সব সময় বউ এবং ছেলের মতামতও নেন না।

বিষণ্ণ মুখে নির্মল নিজের কপাল টিপে ধরলো। তারপর বললো, "আমাকে কয়েকটা দিন একটু ভেবে দেখবার সময় দেবেন, মিস সেন?"

গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেল থেকে রাস্তায় বেরিয়ে নির্মল রক্ষিত পায়ে হাঁটতে আরম্ভ করেছে।

কলকাতার লক্ষ লক্ষ কয়লা-উনুনের ভারী বিষাক্ত ধোঁয়া সন্ধ্যার সুযোগে অসহায় নাগরিকদের শ্বাস রোধ করবার জন্যে গুপ্তঘাতকের মতো লঘুপদক্ষেপে এগিয়ে আসছে। নির্মলের চোখ জ্বালা করছে। স্ট্রেড রোড ধরে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটছে পঁচিশ বছরের সুশিক্ষিত যুবক নির্মল রক্ষিত।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। চাঁদটার দিকে তাকিয়ে নির্মল বললো, "আজ আমি বড়ই বিব্রত। নিজের কানে যাকে পিতৃনিন্দা শুনতে হয় তার থেকে অভাগা এই পৃথিবীতে কে আছে?"

গড়ের মাঠের জনহীন পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে নির্মলের মনে হচ্ছে চাঁদের মুখে চাপা হাসি। "চাঁদ তুমি হাসছ কেন?"

চাঁদের হাসির কারণটা নির্মল এবার যেন বুঝতে পারছে। চাঁদ বলছে, "নির্মল রক্ষিত, বেশ আছো তুমি। এক পয়সা রোজগার না করেও তোমার হিসেবের খাতায় অনেক ইনকাম জমা হচ্ছে। নিজের হাতে কিছু করো না, কিন্তু অনেক ব্যবসা, অনেক সম্পত্তির অংশীদার হয়ে বসে আছো তুমি! অথচ তোমার মনে কত দম্ভ। তোমার ধারণা তুমি রীতিমত আদর্শবাদী। কোনো অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে চাও না তুমি। নিজেকে নির্মল ও পবিত্র রেখেছো বলে তোমার বিশ্বাস। কিন্তু তোমার প্রতিষ্ঠানের এক অসহায় নারীর ন্যায়সঙ্গত অনুরোধ রাখতে চাও না তুমি। সমস্ত জীবন ধরে নানাভাবে জর্জরিত হয়ে সে তোমার করুণা

ভিক্ষা করছে। তোমার হাতের লেখা দু' লাইন একটা চিঠি তার বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু কোহিনূর থিয়েটারের ছাপানো চিঠির-কাগজে দু'লাইনের একটা চিঠিতে তুমি লিখতে চাও না—'কুমারী লিপিকা সেন সমীপেষু, সবিনয় নিবেদন, আপনার ও এই থিয়েটারের মধ্যে সম্পাদিত বিগত ২৭শে জানুআরির চুক্তির মেয়াদ শেষ হলো। আপনি ইচ্ছা করলে আমাদের সঙ্গে নতুন ভাবে চুক্তি সই করতে পারেন। ইতি শ্রীনির্মল রক্ষিত, পাটনার, কোহিনূর থিয়েটার।' নির্মল রক্ষিতের সামান্য একটা স্বাক্ষর দুর্ভাগা এক নারীর জীবন রক্ষা করতে পারে।

ক্যাঁচ করে একটা গাড়ি এসে থামলো।

"খোকনবাবু যে?" থিয়েটারের গাড়ি নিয়ে যেতে যেতে নরহরি দূর থেকে সায়েবের ছেলেকে ঠিক লক্ষ্য করেছে। "এ কি! এমনভাবে হাঁটছেন কেন?" অবাক হয়ে যায় নরহরি। "আসুন ভেতরে আসুন। আমি হিন্দুস্থান হোটেলে ক্যাবারে নর্তকী লুসির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।"

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো নির্মল। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "নর্তকী ছাড়া আজকাল থিয়েটার হয় না বুঝি, নরহরিবাবু?"

লজ্জা পেয়ে গেলো নরহরি। সায়েবের ছেলের মুখে এই ধরনের প্রশ্ন সে আশা করে নি। মাথা নিচু করে নরহরি বললো, "সমস্ত থিয়েটারে এখন পাশ্চাত্ত্য নৃত্য ঢোকাতে হচ্ছে। স্বয়ং রাম-প্রসাদের বই হলেও তার মধ্যে ক্যাবারে ঢুকে যাবে। সায়েবের অর্ডার মতো আমরাও কোহিনূর থিয়েটারে ক্যাবারে বাড়িয়ে যাচ্ছি। লুসির 'পুসি' ডান্সটা আমাদের বর্তমান নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে ঢোকাতে পারলে আবার বাদুড়ঝোলা হবে। নাটকের পরমায়ু বেড়ে যাবে। এক বছর এখন নিশ্চিন্ত।"

"'গাড়িতে উঠুন", নরহরি অনুরোধ করলো।

"নিজের পায়ে একটু হাঁটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল", নির্মল এই বলে নরহরিকে এড়িয়ে গেলো।

কোহিনূর থিয়েটারে আলো-অন্ধকারের নাটক কিন্তু সমান তালে এগিয়ে চলেছে।

"হাউস ফুল" বোর্ডটা টাঙানো দারোয়ান ভীমপ্রসাদের দৈনন্দিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নোটিসটা ওখানে পাকাপাকি টাঙিয়ে রাখলেই হয়, ভীমপ্রসাদ মাঝে মাঝে ভাবে। বুকিং কাউণ্টারের হারু ভাদুড়ি ভিড়ের চাপে বিরক্ত হয়ে বলেন, "নরহরিবাবু, রোজ রোজ একস্ট্রা চেয়ার ভাড়া করে না-এনে ওগুলোতে নাম্বার বসিয়ে পাকাপাকি করে ফেলুন।" নরহরি মনে মনে বলে, "শিশির ভাদুড়ির আত্মীয় হলেই মাথায় ঘি থাকবে এমন কোনো কথা নেই। ওই সব সীটে পাকা নম্বর বসালেই কর্পোরেশন এবং পুলিসের লোকগুলো হুজ্জত বাধাবে।"

অফিসঘরের জানালা থেকে বুকিং কাউণ্টারের সামনে দর্শকের অন্তহীন প্রবাহ দেখে বীরেশ্বর চাপা আনন্দ অনুভব করেন। ভাবেন, কোহিনূরের মতো এঁদো হলেই এই! স্টার কিংবা বিশ্বরূপার মতো জায়গা পেলে তিনি সত্যিই ফাটিয়ে দিতেন। কেউ অভিনন্দন জানালে বীরেশ্বর বলেন, "ইণ্ডিয়াতে কত বাঙালী আছে বলুন? অন্তত পাঁচ কোটি। আমার কোহিনূর হলের ক্যাপাসিটি মাত্র এক হাজার। হাজার নাইটেও দশ লাখের বেশী পাবলিক পাচ্ছি না আমি। দেশের অর্ধেক লোককেও এই নাটক দেখাতে গেলে পঁচিশ হাজার নাইট চালাতে হবে।"

বীরেশ্বরের এখন কোনো দুঃখ নেই- একমাত্র শেয়ার বাজার ছাড়া। এবং এর জন্য একমাত্র দায়ী ওই কেউটে সাপের মতো দেমাকী মেয়েটা। বীরেশ্বরের বদ্ধ ধারণা লিপিকা বশ্যতা স্বীকার করলেই শেয়ার বাজার আবার তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে আসবে।

নরেন বোসের প্রেগন্যান্সি সংক্রান্ত উপদেশ এখনও বীরেশ্বরের মনে খচখচ করছে। ইউ-পির এই সব দাম্ভিক প্রবাসী বাঙালী মেয়েদের বিশ্বাস নেই—নিজের নাক কেটেও এরা পরের যাত্রা-ভঙ্গ করতে পারে। দু'একদিন ধরে বীরেশ্বর ভাবছেন, প্রেগ-ন্যান্সির ব্যাপারে আদালত থেকে আগাম কোনো ইনজাংশন নেওয়া যায় কিনা। কিন্তু যা-সব আজকালকার উকিল ব্যারিস্টার—অভিনব পথে আইনকে মক্কেলের জন্যে ব্যবহারের কথা তারা ভাবতে পারে না। অথচ এদেরই কেউ-কেউ বছরে তিন চার লাখ টাকা রোজগার করছে।

বীরেশ্বর এখন কড়া নজর রেখেছেন লিপিকার ওপর। ওর প্রেমের সংলাপ তিনি মন দিয়ে শোনেন। টেবিলে মাইক্রো-ফোনের বোতাম টিপে দিলেন বীরেশ্বর। রঙ্গমঞ্চে লিপিকা এই মুহূর্তে সুদর্শনের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করছে। এইখানে একটা চুম্বনের ইঙ্গিত আছে। সুন্দরী লিপিকা কন্দর্পকান্তি সুদর্শনের অশান্ত আবদারে আপত্তি করে না। এবার সুদর্শনের বিখ্যাত ডায়ালগ—"প্রেমের পথে চুম্বন, 'কমা' 'পূর্ণচ্ছেদ' না 'জিজ্ঞাসা চিহ্ন' ?" ঠিক সেই সময় নেপথ্যে ইংরিজী গানের সুর—*Rather an honest slap than a false kiss.*

চুম্বনস্নিগ্ধা নর্তকীর সুললিত কণ্ঠে এবার নতুন গানের সুর গুনগুন করে উঠলো :

I clasp thy waist ,
I feel thy bosom's beat—
O, kiss me into faintness,
sweet and dim.

লিপিকা সেন মনপ্রাণ ঢেলে প্রেমের অভিনয়ে মত্ত হয়েছে। যে-নারীর প্রেমের অভিজ্ঞতা নেই সে কী ভাবে এমন প্রেমের অভিনয় করে বীরেশ্বর বুঝতে পারেন না। ক্ষীণকটী লিপিকার প্রস্ফুটিত তনুদেহটি মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন বীরেশ্বর—যার দেহ এমন সমৃদ্ধ মনে তার একটুও অনুরাগ নেই কেন বীরেশ্বরের জানতে ইচ্ছে করে।

ভুল সন্দেহ করেন নি বীরেশ্বর রক্ষিত। লিপিকার মনের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে। বীরেশ্বর রক্ষিতকে যেভাবে হোক সে যোগ্য শিক্ষা দেবেই—তার জন্যে যেখানে নামতে হয় সে নামবে। লিপিকা ভেবেছিল, নির্মল রক্ষিত কতদূর কী করে দেখা যাক, না-হলে চরম অস্ত্র তার হাতে তো রয়েছে। বীরেশ্বরকে সে বুঝিয়ে দেবে থিয়েটারের সব মেয়েই মধুমালতীর মতো ভালমানুষ নয়। কিন্তু ইতিমধ্যে লিপিকার হৃদয়ে অকস্মাৎ নববসন্তের অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছে। নির্মলকে কয়েকদিন দেখেই, কিছুক্ষণ ধরে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে সে মোহিত হয়েছে।

বিচিত্র এক সমস্যায় পড়েছে নির্মল। পৃথিবীর কোনো সন্তানই যেন এইরকম পরিস্থিতিতে না পড়ে। সানি-পার্কের বাইরে বাবার প্রকৃত রূপটা এই প্রথম সম্পূর্ণভাবে তার চোখের সামনে ধরা পড়ছে। লিপিকার প্রার্থনাও সামান্য। সরল মনে একখণ্ড কাগজে যে-সই করেছিল তার নাগপাশ থেকে সে মুক্তি চাইছে। নির্মলের সইয়ের আদৌ কোনো মূল্য আছে কিনা সন্দেহ ছিল। কিন্তু অনেক আলোচনার পরে নির্মল এসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছে।

ব্যাপারটা অবশ্যই চুপি-চুপি সেরে ফেলা যায়। লিপিকাকে একখানা চিঠি লিখে নির্মল নিঃশব্দে আমেদাবাদে ফিরে যেতে পারে। লিপিকা নিজেও প্রথমে সেইরকম চাইছিল। নির্মলের সেই চিঠির জোরে লিপিকা কোহিনূর থেকে বিদায় নেবে—তারপর আইনের শরণাপন্ন হলে বীরেশ্বর নিজেই বেকুব বনে যাবেন।

কিন্তু হাঙ্গামা এড়াবার জন্যে চুপি-চুপি কিছু করতেও মন চাইছে না নির্মলের। লিপিকার সঙ্গে দেখা করে নির্মল নিজের মনোভাব গোপন করে নি—সে আরও একটু সময় চেয়েছে। অন্য কেউ হলে নগদ বিদায়ের জন্যে পিড়াপীড়ি করতো। কিন্তু লিপিকা বীরেশ্বরের একমাত্র সন্তানের মনের অবস্থা বুঝতে পারছে।

"আপনি রাগ করলেন নাতো ?" নির্মল জিজ্ঞেস করেছে।

"আপনি যে ভাবছেন, এতেই ধন্য হয়েছি নির্মলবাবু", বিষণ্ণ লিপিকা অন্তর থেকে উত্তর দিয়েছে। "আমি তো ভেবেছিলাম, অন্য সবার মতো আপনি আমার সঙ্গে যোগাযোগই করবেন না—বরং খবরটা বাবার কানে তুলে দেবেন।"

হেসে ফেলেছিল নির্মল। "আমার সম্বন্ধে এতোটা খারাপ ধারণা করে বসলেন কেন ? আমাকে দেখলে ঐরকম জাঁহাবাজ মনে হয় বুঝি ?"

মুখ দেখে মানুষ বোঝা যায় না। এই নির্মম সত্যটুকু লিপিকা যৌবনের প্রারম্ভেই বুঝে নিয়েছে। যাকে নিয়ে সে বারাণসী থেকে বেরিয়ে পড়েছিল তার মুখটা শিশুর মতো নিষ্পাপ ছিল। অথচ রুসীদার মুখখানা দেখলেই মনে হয় দুষ্ট লোক—মেয়েরা ওঁর কাছে নিশ্চয় নিরাপদ নয়।

"কী ভাবছেন ?" প্রশ্ন করেছিল নির্মল।

নিজের মনের ভাব চেপে রাখে নি লিপিকা। বলেছিল, "বাড়ি থেকে বেরিয়ে এই ক'টা বছরে কম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হলো না, নির্মলবাবু।" এরপর লিপিকা কোনো কিছুই গোপন রাখে নি।

চিরশত্রুর অপরিচিত পুত্রর কাছে নিজেকে এইভাবে খুলে ধর:ছ কেন, লিপিকা বুঝতে পারে না। নির্মলের একান্ত সান্নিধ্যে নতুন অনুভূতির সঞ্চার হয় লিপিকার মনে।

নির্মল স্তব্ধ হয়ে নৃত্য-নাট্যজগতের সাজঘরের কাহিনী শোনে। বীরেশ্বর রক্ষিতের জীবন সম্বন্ধেও সে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে উৎসুক। অধর চাটুজ্যের পরিবার সম্বন্ধে খবরাখবর নিতে চায় নির্মল। তাদের কথা কোহিনূরের সকলেই যে ভুলে গিয়েছে তা নির্মল কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না। ওদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে লিপিকা। এবং দু'দিন পরেই গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেলে নির্মলের সঙ্গে লিপিকার আবার দেখা হয়েছে। নাট্যকার অধর চাটুজ্যের পরিবারের কোনো খোঁজখবর পাওয়া যায় নি। অনেক টাকা ভাড়া বাকি থাকায় বাড়িওয়ালা গায়ের জোরে তাদের তুলে দিয়েছে।

নির্মলের মুখের দিকে তাকিয়ে সংশয় ও গ্লানির বিচিত্র দোলায় দুলছে লিপিকা। এক একবার ভেবেছে, মধুমালতী ও বীরেশ্বরের উপাখ্যানটা নির্মলকে পুরোপুরি শুনিয়ে দেয়। কিন্তু সঙ্কোচবোধ করেছে লিপিকা।

তার উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ। আপন মোহমায়া বিস্তার করে নির্মলের কাছ থেকে মুক্তিপত্র আদায় করতে হবে। বীরেশ্বরবাবু, আপনি হয়তো ভুলে গিয়েছেন, আইনের চোখে কোহিনূর থিয়েটারের পার্টনার নির্মলের সইয়ের দাম আপনার সই থেকে কম নয়।

নির্মলের মন কোন্ দিকে যাচ্ছে তা এখনও লিপিকা স্পষ্ট বুঝতে পারছে না। তবে আজকাল দু'জনের মধ্যে অনেক অবান্তর কথা হয়। নাট্যজগতের প্রসঙ্গও উঠে পড়ে। লিপিকা সাহস সঞ্চয় করে নির্মলকে জিজ্ঞেস করেছে, "আমার অভিনয় একদিন দেখবেন না?"

থিয়েটার-পাড়ায় পদার্পণের কোনো ইচ্ছে নেই নির্মলের। কিন্তু ব্যাপারটা হাল্কা করবার জন্যে নির্মল রসিকতা করলো, "সেই তো একজন নায়ক থাকবে এবং ভিলেন থাকবে—তাদের টানা-টানিতে নায়িকা কষ্ট পাবে, চোখের জল ফেলবে। তারপর হয় মিলন নয় বিচ্ছেদ।"

ভিলেন এবং নায়ক সম্পর্কে অধরদার একটা কথা মনে পড়ে গেলো লিপিকার। ওর মুখে হাসি দেখে নির্মল জিজ্ঞেস করলো, "হাসছেন কেন?"

সলজ্জভাবে লিপিকা বললো, "অধরদা বলতেন, নায়ক এবং ভিলেনের মধ্যে তফাত খুব সামান্য। নায়ক ভাবে প্রত্যেক স্ত্রীলোকই মহিলা; আর ভিলেনের ধারণা প্রত্যেক মহিলাই মেয়েমানুষ।"

কোহিনূর নাট্যমঞ্চে থিয়েটার দেখতে নির্মলের যে আগ্রহ নেই তা লিপিকা বুঝতে পেরেছে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নাটকের নামে যে কালোয়ারী ব্যবসা চলেছে তার সম্বন্ধে নির্মলের একটুও শ্রদ্ধা নেই। অভিযোগটা হয়তো পুরোপুরি মিথ্যে নয়, তবু শিল্পী লিপিকা দুঃখবোধ করে। সাহস সঞ্চয় করে লিপিকা বলেছে, "ক্যাবারের বাইরেও আমরা কিছু করতে পারি, নির্মলবাবু। আমার জন্যে অধরদা ছোট একটা নাটক লিখে দিয়েছিলেন। যাবেন আমার একক অভিনয় দেখতে আগামী বুধবার?"

"কোথায়?"

"কলকাতার মধ্যে তো অভিনয় করবার অধিকার নেই আমার। ব্যাণ্ডেলের কাছে একটা ক্লাবে। সাড়ে-পাঁচটা থেকে সাতটা।"

লিপিকা ভেবেছিল নির্মল কোনো উৎসাহ দেখাবে না। এই-ভাবে ভদ্রলোককে লজ্জায় ফেলা তার উচিত হয় নি। কিন্তু কি আশ্চর্য, নির্মল মুখের উপর না বললো না। বললো, "আপনাকে জানাবো।"

আরও অনেক কথা হয়েছে দু'জনে। লিপিকা নিজের সম্বন্ধে কিছুই লুকিয়ে রাখে নি। নির্মল গম্ভীরভাবে বলেছে, "থিয়েটারের নামে এই যে ক্যাবারে ছড়িয়ে পড়ছে, এর বিরুদ্ধে কেউ কিছু কথা বলেন না ?"

চোখ বড় বড় করে লিপিকা বলেছে, "আপনাকে তো বলা হয় নি। কাল যা বিপদ হয়েছিল। তরুণ ছাত্রনেতা অসিত সেনশর্মা থিয়েটার দেখে সোজা আমার কাছে হাজির। আমি তখন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠছি। অসিত আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আর্টের নামে আপনারা এইসব নোংরামি কেন করছেন ?' আমি বললাম, 'আমরা তো নাট্যকার ও নির্দেশকের হাতের পুতুল। আমাদের যা বলা হয় তাই করি।' আমি ভয় পেয়েছিলাম, ছেলেটি হয়তো এবার হৈ-চৈ করবে। কিন্তু অসিত ভদ্রভাবে বললো, 'আপনার উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না, দিদি। শিল্পী এবং কলাকুশলীরাই তো থিয়েটারের সব—আপনারা কেন পুতুল হতে যাবেন ?' পরে একদিন কথা হবে এই বলে তখনকার মতো পালিয়ে এসেছি।"

"বীরেশ্বর, তুমি কি এখনও বেঁচে আছো ?" আহত সিংহের মতো পদচারণা করতে করতে বীরেশ্বর রক্ষিত নিজেকে জিজ্ঞেস করলেন।

একটু আগেই একটা ছোঁড়া সিংহের গুহায় এসে পশুরাজকে শাসিয়ে গিয়েছে। অপমানের আগুন ছাই-ঢাকা টিকের মতো বীরেশ্বরে বুকের মধ্যে জ্বলছে।

আপিসঘরে বসে বীরেশ্বর লিপিকার ঔদ্ধত্যের কথা ভাবছিলেন। সামান্য ক্যাবারে নর্তকীর এখনও নত হবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। শান্ত হয়ে ধরা দেবার অনেক সুযোগ তিনি এই ক্যাবারে-কুমারীকে দিয়েছেন—কিন্তু তার পর্বতপ্রমাণ ধৃষ্টতা এবার বীরেশ্বরকে বিরক্ত করছে। নগ্ন এই নর্তকীকে একদিন বীরেশ্বরের পদলেহন করতেই হবে—বীরেশ্বরের তূণীরে এখনও যে অনেক অস্ত্র আছে তা লিপিকা বোধহয় বুঝতে পারে নি। লিপিকা-লাঞ্ছনার নতুন এক প্রোগ্রাম মনে-মনে ছকছিলেন বীরেশ্বর—এমন সময় দূত মারফত অসিত সেনশর্মার আগমনবার্তা পেলেন। বীরেশ্বর ভেবেছিলেন ছেলে-ছোকরাদের ইউজুয়াল কোনো ব্যাপার হবে—বিনা-পয়সায় একদিন হয়তো হল ভাড়া দিতে হবে, কিংবা কিছু চাঁদা। কলকাতার অনেক উদ্ধত বেয়াদপ ছোঁড়াকে ফ্রি-পাস এবং চাঁদার মন্তর দিয়ে নরহরি বশ করেছে। টাকার অসাধ্য কিছু নেই এমন একটা বিশ্বাস বীরেশ্বরের মনে মধ্যে গেঁথে গিয়েছে।

কিন্তু সবাই যে টাকায় ভেজে না বীরেশ্বর তার প্রমাণ পেলেন অসিত সেনশর্মার সঙ্গে কথা বলে। ছোকরা এম-এ পাস করে ইস্কুলে মাস্টারি নিয়েছে এবং বাকি সময় দেশোদ্ধার করছে।

"এই যে আসুন, আসুন। সব খবর ভাল তো ভাই ?" লিপিকা-চিন্তা বিসর্জন দিয়ে বীরেশ্বর একগাল হেসে সেনশর্মাকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। "কই একদিনও তো থিয়েটারের পাস নিলেন না ?" বিনা-পয়সায় অসিতকে থিয়েটার না দেখানো পর্যন্ত বিগলিত বীরেশ্বরের যেন ঘুম হচ্ছে না।

অসিত সেন জানালো, গতকালই নিজের পয়সা খরচ করে সে নাটক দেখেছে। "সে কি! আপনি কেন পয়সা নষ্ট করে থিয়েটার দেখলেন ?" ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বীরেশ্বর।

এবার বজ্রপাত। "থিয়েটারের নামে এসব কী চালাচ্ছেন বীরেশ্বরবাবু ?" চাঁচাছোলা প্রশ্ন করেছিল অসিত সেনশর্মা।

"আপনি নাচের কথা বলছেন ?"

"অশ্লীলতা এবং আরও অনেক কিছুর কথাই আজ বলতে এসেছি আমি", সিংহের মুখের ওপর সেনশর্মা জবাব দিলো।

একগাল হেসে তরুণ নেতাকে তর্কজালে আবদ্ধ করবার চেষ্টা করলেন বীরেশ্বর। "ক্যাবারে তো শুধু আমার থিয়েটারে চলছে না।" বীরেশ্বর আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই অসিত সেন শুনিয়ে দিলো, "অন্য কে কী করেছে তা পরে দেখা যাবে। আপনি কেন এইসব নোংরা ঘাঁটছেন বলুন ?"

বিরক্ত বীরেশ্বরের দেহে চারশ-চল্লিশ ভোল্টের এসি কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে। নিজেকে যথাসম্ভব শান্ত করে বীরেশ্বর বললেন, "অশ্লীলতা সম্পর্কে সরকারের আইন-কানুন আছে—আদালত তো বলে নি এই সব আধুনিক নাচ দেখিও না।"

"সভ্যতা এবং সংস্কৃতিরও একটা অলিখিত আইন আছে, বীরেশ্বরবাবু। আমি শুনলাম, নর্তকীদের জামাকাপড়ের পরিমাণ আপনি কমিয়েই চলেছেন।"

অন্য যে-কেউ এই কথা বললে, বীরেশ্বর তাকে এখনই ঘাড় ধরে ঘর থেকে বার করে দেবার হুকুম করতেন। কিন্তু এই সব লোক্যাল ছেলেদের বীরেশ্বর একটু ভয় পান। অসিত সেনশর্মা হঠাৎ দেওয়ালে-টাঙানো গিরিশচন্দ্র এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি দেখিয়ে বললো, "আমাদের দেশের মেয়েদের চরম অপমান করবার আগে এইসব মহাপুরুষের কথা একটু মনে রাখবেন। অশ্লীল নাট্যব্যবসায়ীর ঘরে এইসব ছবি মানায় না।"

বিজনেসম্যান বীরেশ্বরের মাথার ভিতরে বসানো কমপিউটার যন্ত্রটা দ্রুত কাজ করতে আরম্ভ করেছে। এই নাটক তো বেশ কিছুদিন চলছে। এতোদিন পরে হঠাৎ অসিত সেনশর্মার টনক নড়লো কেন ? গতকাল রাত্রেই বীরেশ্বর রিপোর্ট পেয়েছেন, লিপিকার সঙ্গে অসিত সেনশর্মাকে অনেকক্ষণ চাপা গলায় কথা

বলতে দেখা গেছে। "লিপিকা তুমি বড়ো বেশী এগিয়ে যাচ্ছো", মনে মনে হিংস্র হুঙ্কার ছাড়লেন বীরেশ্বর রক্ষিত।

কিন্তু বাইরে কিছুই বোঝা গেলো না। শান্তভাবে বীরেশ্বর বললেন, "চা খান ভাই। ফাইনাল রায় দেবার আগে আসামীকে একটু সময় দিন—নাট্যকারের তো কিছু বক্তব্য থাকতে পারে। শিল্পীর স্বাধীনতা তো আপনাদের সরকারও স্বীকার করেন।"

অসিত সেনশর্মা তখনও মুখ খোলে নি। বীরেশ্বর সুযোগ বুঝে বললেন, "যুবনেতা এবং নাট্যকারদের উদ্দেশ্য এক—সমাজের দুর্নীতি ও ক্লেদ আমরা ফাঁস করে দিতে চাই।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ! ভুলেই গিয়েছিলাম, নাট্যকার, নির্দেশক, সুরকার, মঞ্চমায়াবী—আপনিই তো এখানকার সব!"

অসিত সেনের কথার মধ্যে যেন প্রচণ্ড অবিশ্বাস ও ব্যঙ্গ রয়েছে। অন্তত বীরেশ্বরের তাই মনে হলো। তার মানে কি অসিত সেনশর্মা বলতে চাইছে, বীরেশ্বর মোটেই কলম ধরেন না?

এবার শেষ অস্ত্র ছাড়তে মনস্থ করলেন বীরেশ্বর রক্ষিত। অগ্নিযুগে বিপ্লবী বীরেশ্বরের ক্রিয়াকাণ্ডের কথা তুলবেন। কিছুদিন আগে বুদ্ধি করে বিপ্লবী গণেশ মিত্রের ছবি এই ঘরে টাঙিয়েছেন বীরেশ্বর রক্ষিত। বিপ্লবের কথা সবেমাত্র তুলেছেন বীরেশ্বর, এমন সময় গণেশ মিত্রর ছবিটার দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো অসিত সেনশর্মা। হাসি থামতেই চায় না।

"থাক্ থাক, ওসব কথা যাক।" এই বলে আরও হাসতে লাগলো অসিত সেনশর্মা। বহু বছর পরে বীরেশ্বর হঠাৎ সমগ্র দেহে অস্বস্তিকর শিহরণ অনুভব করলেন।

"আমি আবার আসবো—আপনার সম্বন্ধে যতই জানছি ততই অবাক হচ্ছি," এই বলে অসিত ঝড়ের বেগে বিদায় নিলো।

আহত সিংহ ঘরের মধ্যে অস্থির পায়চারি শুরু করেছে। অসিত সেনশর্মা কেন ওইভাবে হাসলো? হয়তো এমনিই হেসেছে

অসিত সেনশর্মা—বীরেশ্বর নিজের সঙ্গে তর্ক করলেন। সারপেন-টাইন লেনের খবর অসিত কী করে জানবে? কিন্তু অসিত সেনশর্মা কি এখানকার খবরাখবর পাচ্ছে?

নরহরিকে ডাকলেন বীরেশ্বর। "তোমাদের কেউ কি ওই হারামজাদা অসিতের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, এখানকার খবরাখবর ফাঁস করে?"

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নরহরি মা-কালীর দিব্যি করলো। "লিপিকাদি ছাড়া আর কারও সঙ্গে অসিতবাবুকে কথা বলতে দেখি নি। খবর পাওয়া মাত্রই আপনাকে জানিয়ে গিয়েছি স্যার।"

"পরশুরামকে কোশ্চেন করেছিলে?" হুঙ্কার ছাড়লেন।

"করেছি, স্যার। লিপিকাদির বাড়িতে পাড়ার ছোঁড়াদের কোনোদিন দেখা যায় নি।"

"ইডিয়ট, খবর নাও অসিত সেন কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত।"

খবর যোগাড় করবার জন্য নরহরি দ্রুত বেরিয়ে গেলো এবং ফিরে এলো কয়েক মিনিটের মধ্যে। বললো, "এখনও পাড়া-পলিটিকসই করছেন অসিতবাবু। তবে এই কিছুদিন হলো গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেল কর্মচারী ইউনিয়নের অনারারি সেক্রেটারি হয়েছেন। এখান থেকে উনি সোজা চলে গেলেন গ্রেট-ইণ্ডিয়ান হোটেলে। প্রায়ই ওখানে যেতে হয়।"

এবার যেন রহস্যের সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন বীরেশ্বর। টু প্লাস টু ইজিকলটু ফোর হচ্ছে। লিপিকা সেনও যে আজকাল প্রায়ই গ্রেট-ইণ্ডিয়ান হোটেলে যাচ্ছে সে খবর পরশুরামের কাছ থেকে বীরেশ্বর পেয়েছেন। দাঁতে দাঁত চাপলেন বীরেশ্বর রক্ষিত।

অনেকদিন পরে বীরেশ্বর এই প্রথম বিচলিত বোধ করছেন। বিপ্লবী গণেশ মিত্রের সঙ্গে সহযোগিতার ব্যাপারটা এই ক'বছর বার বার পুনরাবৃত্তি করে কখন যেন তিনি নিজেই সত্য বলে ভাবতে

আরম্ভ করেছিলেন। আজ অসিত সেনশর্মার আচমকা হাসি তাঁর শান্ত পৃথিবীতে ভূমিকম্প ঘটিয়ে গেলো। ছোকরা কতটা কি জানে তা আত্মরক্ষায় তৎপর বীরেশ্বর ঠিক বুঝতে পারছেন না।

কিন্তু তার আগে লিপিকার একটা ব্যবস্থা বিশেষ প্রয়োজন। "লিপিকা, তুমি বড় বেশী এগিয়ে যাচ্ছো। আমার সম্বন্ধে তুমি কতটা জেনে ফেলেছো বুঝতে পারছি না। একটা উড়ো খবর, তুমি নাকি গোপনে নেদো মল্লিকের সঙ্গে দেখা করছো। কিন্তু নেদোদা তা স্বীকার করলেন না। শেষবয়সে এসে নেদোদা আমার সঙ্গে এই খেলা খেলছেন তোমারই জন্যে।"

আবার দাঁতে দাঁত চাপলেন বীরেশ্বর রক্ষিত এবং স্বগতোক্তি করলেন, "আমার সাজানো বাগান অত সহজে শুকোবে না।" ব্যস্তভাবে পায়চারি করতে করতে আকাশ-পাতাল কীসব ভাবলেন বীরেশ্বর। তারপর নিজের মনেই প্রশ্ন করলেন, "লিপিকা, আমার অতীত সম্বন্ধে তুমি কি বড় বেশী জেনে ফেলেছো? দি উয়োম্যান হু নোজ টু মাচ্।"

লিপিকার ওপর এতোদিন প্রচণ্ড দুর্বলতা ছিল বীরেশ্বরের। ওই শ্যাম সুললিত দেহখানি মাত্র একদিন নিজের আয়ত্তে পেলেই সন্তুষ্ট হতেন বীরেশ্বর। তারপর ওই দেহের মালিক যা চাইতো তাই পেতো বীরেশ্বরের কাছে। এমন কি লিপিকার সঙ্গে চুক্তিপত্রটা এককথায় ছিঁড়ে ফেলতে পারতেন বীরেশ্বর রক্ষিত।

"কিন্তু লিপিকা তুমি সাফল্যের সহজ পথ ছেড়ে দিয়ে অসিত সেনের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে নেমেছো।"

ষ-ড়-য-ন্ত্র—অনেকদিন আগে দেশাত্মবোধক এক নাটকে এই কথাটা বিপ্লবী নায়কের মুখে বিচিত্রভাবে উচ্চারিত হতে শুনেছিলেন বীরেশ্বর। তাঁরই হুকুমে অধর চাটুজ্যে কথাটা বর্তমান নাটকে ঢুকিয়েছিল। বীরেশ্বর এবার স্টেজের শব্দযন্ত্রের বোতাম

টিপে দিলেন। মঞ্চ থেকে ঠিক সেই সময় ভেসে এলো নিষ্করুণ প্রশ্ন—ষড়যন্ত্রের শাস্তি কী?

গোপন বিপ্লবীদের ফেরারী নেতা আশুদা যখন এই প্রশ্ন করছেন তখন সবাই নির্বাক। কেউ কোনো উত্তর দিচ্ছে না। বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে আশু সেন আবার জিজ্ঞেস করলেন—"একজন পাপিষ্ঠকে তোমাদের সামনে বেঁধে রেখে দিয়েছি। পাপের বেতন কী?" এমনই এক নাটকীয় মুহূর্তে সাসপেন্সের খাতিরে ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ ঘুরতে লাগলো। অন্য এক দৃশ্যে নটী লিপিকা আপন নৃত্যছন্দে বিমোহিত। বীরেশ্বর এই মুহূর্তে লিপিকার নূপুরনিক্কনও সহ্য করতে পারছেন না, বোতাম বন্ধ করে দিলেন।

খোলা জানালার কাছে এই মুহূর্তে একটা চড়ুই পাখির ডাক শোনা গেলো। এই ডাক শুনেই অনেক দিন আগের একটা ঘটনা বীরেশ্বরের চোখের সামনে ভেসে উঠছে। বীরেশ্বর গুম হয়ে ভাবতে লাগলেন।

বীরেশ্বর তখন খুব ছোট। একটা চড়ুই পাখি তাঁর পড়ার ঘরের মধ্যে ঢুকে বীরেশ্বরের মাথায় নোংরা ফেলেছিল। বালক বীরেশ্বর সেই পাখিটাকে ধরবার জন্যে লাফিয়ে উঠেছিলেন। পাখিটাকে যেমনি ধরতে যান অমনি সে ধড়ফড় করে ওপরে উড়ে যায়। আধ-ঘণ্টা চেষ্টার পরেও জেদী পাখিটাকে না ধরতে পেরে বীরেশ্বর খাবার নিয়ে এসে লোভ দেখালেন। তবুও পাখিটাকে আয়ত্তে আনতে না পেরে বীরেশ্বর ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে পাখিটাকে বন্দী করেছিলেন। পরের দিন পড়ার ঘরে ঢুকে বীরেশ্বর দেখলেন পাখিটা চুপ করে স্কাইলাইটের কাছে বসে আছে। আবার চেষ্টা করলেন বীরেশ্বর। জেদী পাখিটা তখনও ধড়ফড় করে ছুটে বেড়ালো, ধরা দিলো না। হাতে না মারতে পেরে বীরেশ্বর এবার পাখিকে ভাতে মারবার ফন্দি আঁটলেন। তিন দিন বন্ধ রাখার পর বেড়াল বগলে বীরেশ্বর

যখন আবার ঘরের দরজা খুললেন তখন পাখিটা ধুঁকছে। বাঁচবার অদম্য আগ্রহে পাখিটা এবার অদ্ভুত করুণ এক শব্দ করেছিল। কিন্তু বীরেশ্বর কোনোরকম বিচলিত না হয়ে বেড়াল লেলিয়ে দিয়েছিলেন। মাত্র পাঁচ মিনিটে হুলো বেড়ালটা নিজের কাজ শেষ করে মনের আনন্দে রক্তমাখা থাবা চাটতে চাটতে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

বীরেশ্বরের চিন্তায় বাধা পড়লো। নরহরি আবার ঘরে ঢুকে পড়েছে। পরশুরাম পাত্র একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়। ওকে অপেক্ষা করতে বলে, বীরেশ্বর আবার স্টেজের বোতাম টিপে দিলেন। নৃত্যের দৃশ্য এতোক্ষণে নিশ্চয় শেষ হয়ে গিয়েছে। নাঃ, পরের সেই নাটকীয় দৃশ্যটাও শেষ হয়ে গিয়েছে—যেখানে ষড়যন্ত্রকারী কানাই হাজরাকে বিপ্লবীদের গোপন আদালত মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিলো। পাপের বেতন মৃত্যু, বাইবেলের পুরনো কথাটা এখানে অধর বেশ সুন্দর ব্যবহার করেছিল।

ড্রাইভার পরশুরাম পাত্রকে বীরেশ্বর এবার ডেকে পাঠালেন। বিনয়ে বিগলিত পরশুরাম সায়েবকে সেলাম করলো।

"তারপর পরশুরাম?" বীরেশ্বর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন।

পরশুরাম বললো, "গত কয়েকদিন মেমসায়েব তেমন কোথাও যান নি। বাড়িতেই নিজের মনে বসে থাকেন।"

"বাড়িতে কারা-কারা আসছে? সুদর্শনকুমার গিয়েছিল?"

"না স্যার। ওঁকে একবারও দেখি নি। মেমসায়েব গতকাল শুধু সকালবেলায় স্নান সেরে কালীঘাটে পুজো দিতে গিয়েছিলেন।"

কালীঘাটে ক্যাবারে নর্তকী! বীরেশ্বর একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "মেমসায়েব যে কালীপুজো দেন, আগে তো কখনও বলোনি পরশুরাম।"

"না সায়েব, এই প্রথম—আগে কখনও দেখি নি।"

"মদের বোতল-টোতল কিছু কিনে এনেছো?"

"মদ তো ওঁকে কখনও খেতে দেখি নি সায়েব। এক বোতল অরেঞ্জ স্কোয়াস কিনেছিলাম গত মাসে।"

বীরেশ্বরের জেরার উত্তরে পরশুরাম বললো, "গ্রেট-ইণ্ডিয়ান হোটেলে মেমসায়েব মাঝে মাঝে যাচ্ছেন। ওখানকার ম্যানেজার সায়েব নাকি ওঁর বন্ধু। একদিন বলছিলেন, গ্রেট-ইণ্ডিয়ান হোটেলের নাইট ক্যাবারেতে এবার হয়তো রেগুলার নাচবেন।"

"কেন বাইরের থিয়েটার চলছে না?"

পরশুরাম বললো, "কোথায় চলছে? লাস্ট তো সেই উলুবেড়ে গেলেন দশদিন আগে।"

"হুম", বীরেশ্বর দাঁতে দাঁত চাপলেন।

সংবাদে সায়েব যে সন্তুষ্ট না তা বুঝতে পেরে পরশুরাম বললো, "বুধবার ব্যাণ্ডেল ক্লাবে শো রয়েছে, সাড়ে-পাঁচটা থেকে সাতটা।"

একটা পাঁচ টাকার নোট ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বীরেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, "হাইওয়ে ধরেই যাও তো তোমরা?"

"ওইটেই তো ভাল রাস্তা হুজুর," পরশুরাম মাথা চুলকোতে লাগলো।

"ওখান থেকে ফিরবে কখন?" জিজ্ঞেস করলেন বীরেশ্বর।

পরশুরাম বললো, "সাড়ে-সাতটার মধ্যে নিশ্চয় বেরিয়ে পড়বো আমরা। যা-রাস্তার অবস্থা! অন্ধকার হলেই দশটন টাটা লরির মাতাল ড্রাইভারদের ঘাড়ে ব্রহ্মদৈত্য ভর করে।"

চমৎকার! বীরেশ্বরের চোখের সামনে নতুন সম্ভাবনার ফ্ল্যাশবাল্ব জ্বলে উঠলো। খুশী হয়ে পকেট থেকে আর একখানা পাঁচটাকার নোট বার করে পরশুরামের হাতে গুঁজে দিলেন বীরেশ্বর।

থিয়েটার থেকে বেরিয়ে বীরেশ্বর গাড়ি চড়ে নিজের সিমেন্ট গোলায় চললেন। কোহিনূরের গেটের কাছে পরশুরামের দিকে নজর পড়লো তাঁর। একবার ভাবলেন মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস

করবেন, "তোমার কে কে আছে ? বিয়ে থা হয়েছে কিনা।" কিন্তু পরমুহূর্তেই মত পাল্টালেন বীরেশ্বর। পরশুরামের জন্যে একটুও মায়া হলো না বীরেশ্বরের। "শালা, মনিবের নামে চুকলি খেতে ভূভারতে তোমার জুড়ি নেই।"

রাস্তার মোড়ে লোকাল বয়েজদের ছোট এক জটলা দেখে বীরেশ্বর চোখ বন্ধ করলেন। এই লোকাল বয়েজদের সম্বন্ধে ভাবতে গেলেই বীরেশ্বর রাগে অন্ধ হয়ে পড়েন। অনেকদিন আগে বেলেঘাটায় কুসুমকুমারীর ওখানে অপমানের কথা মনে পড়ে যায়। প্রাণের ভয়ে অপমান হজম করে সেদিন বীরেশ্বর পিছিয়ে এসেছিলেন—কুসুমকুমারীর বিয়ের সব টাকাও সেদিন তাঁকে দিতে হয়েছিল। অনেক বছর সেই অপমানের জ্বালা মনের মধ্যে পুষে রেখেছিলেন বীরেশ্বর রক্ষিত। তারপর একদিন কুসুমকুমারী বিধবা হয়েছিল। কুসুমকুমারীর স্বামী নাইট শিফটে কারখানায় কাজে যাবার পথে লরি চাপা পড়েছিল। বীরেশ্বর হাসলেন—অজানা লরি, খোঁজখবর কিছুই পাওয়া যায় নি।

দুঃখহরণ ড্রাইভারের দু'দিন ছুটি ও পঞ্চাশ টাকা ধার প্রয়োজন। সায়েবকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে সে বললো, "আপনি স্যার সত্যিই দেবতা। ছোঁড়াগুলোকে দেখে আপনি হাসছেন··· আমার তো স্যার ইচ্ছে করে ছুটে দিয়ে গাড়ির হ্যাণ্ডেল দিয়ে পিটুনি লাগাই।" বীরেশ্বর আবার মিটমিট করে হাসলেন। কোনো উত্তর দিলেন না।

সিমেণ্ট গোলার সামনে গাড়িটা রেখে বীরেশ্বর দু'মিনিট আপিসে বসলেন। দু'একখানা কাগজপত্র দেখলেন। তারপর দুঃখহরণকে এড়িয়ে, পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। পায়ে হেঁটে কাজীবাগান বস্তিতে লরি ড্রাইভার ইদ্রিসের খবর করতে চলেছেন বীরেশ্বর। ব্যাটাচ্ছেলে ইদ্রিস আসানসোলের কাছে দ্বিতীয় সংসার পেতেছে। খুব টাকার খাঁকতি।

আজ একটু দেরিতেই নেদো মল্লিকের সান্ধ্য আসরে ঢুকলেন বীরেশ্বর।

"এসো বীরেশ্বর এসো", নেদো মল্লিক স্বাগত জানালেন।

বীরেশ্বর চেয়ারে বসেই হুইস্কির বোতলটা টেনে নিলেন। নেদো বললেন, "তোমার চোখগুলো লাল মনে হচ্ছে। কোথাও একলা আহ্নিক সেরে এলে নাকি?"

"মদের নেশা ছাড়াও তো আরও কত রকমের নেশা আছে, নাতুদা। সেসব তুমি তো চেখে দেখলে না।"

"অগ্নিসাক্ষী করে এই মদের বোতলের সঙ্গেই তো আমার মালাবদল হয়েছে। তাই তো অন্য কোনো দিকে নজর দিই না। আই অ্যাম নট অ্যান অ্যানফেথফুল হাজবেণ্ড, বীরেশ্বর।"

বীরেশ্বর তবুও হাসলেন না। নেদো মল্লিক বললেন, "তা তোমার খবর কী বলো।"

"থিয়েটার? হাউসফুল," বীরেশ্বর বললেন।

"বাড়ি? রাঙা-টুকটুকে বউমা আনবার ব্যাপারটা এগলো?" নেদো মল্লিক জিজ্ঞেস করলেন।

"শ্যামা কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে। খোকা অনেকখানি নরম হয়েছে। মনে হচ্ছে এবার একটি রাঙাটুকটুকে বউমা ঘরে আনা যাবে। এই বুধবারে খোকা কিছু বলবে।"

"চমৎকার", বললেন নেদো মল্লিক। "তাহলে নিশ্চিন্তে আমার এই আশ্রমে আহ্নিক শুরু করো। মাকে ডাকো, বলো মা আমার মনের অন্ধকার ঘুচিয়ে দাও, আমার চৈতন্য হোক।"

ইদ্রিসের সঙ্গে দেখা করবার পর থেকে বীরেশ্বর আজ বেশ হাল্কা বোধ করছেন। বীরেশ্বরকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে নেদো মল্লিক বললেন, "কী ব্যাপার বীরেশ্বর? মায়ের কাছে কিছুই চাইছো না?"

"কারুর কাছে হাতপাতা বীরেশ্বরের স্বভাব নয়, নেদোদা। যা-দরকার তা আমি নিজেই যোগাড় করে নিতে জানি।"

বিস্মিত নেদো মল্লিক বললেন, "তোমাকে সত্যিই আমি হিংসে করি, বীরেশ্বর। ভগবানের কাছেও ভিক্ষে করলে না, অথচ জীবনের কোনো ট্রাফিক রুল তুমি মানলে না।"

"আমার নাটকটা এবার তুমি লিখে ফেলতে পারো নাদুদা। আগামী বুধবার থেকে তোমার বীরেশ্বরের জীবনে কেবল সুখ আর সুখ।" মদের গেলাসটা তুলে নিয়ে এবার হা-হা করে হেসে উঠলেন বীরেশ্বর রক্ষিত।

বুধবারের সকালবেলায় লিপিকা সেই অপ্রত্যাশিত ফোন পেলো। লিপিকা বিশ্বাস করতে পারছে না নির্মল তার একক অভিনয় দেখতে ব্যাণ্ডেলে যাবে।

"একক অভিনয় কীভাবে হয়?" নির্মল ফোনেই জিজ্ঞেস করেছে।

"কেন? আপনি তৃপ্তি মিত্রের অভিনয় দেখেন নি?" লিপিকা জিজ্ঞেস করেছে। "নাটকে একটি মাত্র চরিত্র থাকে—সেই কাঁদিয়ে হাসিয়ে গল্প বলে নাটকের অগ্নিমুহূর্ত সৃষ্টি করে।"

"তা হলে আমি ঠিক সময়ে আপনার বাড়িতেই চলে যাবো," নির্মল বলেছিল। লিপিকা চায় না পার্কসার্কাসের বাড়িতে নির্মলকে দেখা যাক। লিপিকা বললো, "তিনটের সময় আপনি গ্রেট-ইণ্ডিয়ান হোটেলের কফিশপে অপেক্ষা করবেন, আমি চলে আসবো।"

টেলিফোন নামিয়েই অনাস্বাদিত এক আনন্দ অনুভব করছে

লিপিকা। সমস্ত হৃদয় ঢেলে দিয়ে সে আজ সম্রাট ও সুন্দরীতে অভিনয় করবে। খামখেয়ালি সম্রাটের বেপরোয়া নিষ্ঠুরতার ছবি একের পর এক নির্মলের চোখের সামনে তুলে ধরবে।

গ্রেট-ইণ্ডিয়ান হোটেলের কফিশপ চব্বিশ ঘণ্টাই খোলা থাকে, কখনও বন্ধ হয় না। নির্মল রক্ষিত ওখানে বসেই নিজের কথা ভাবছিল। এই ক'দিনে সে মন স্থির করে ফেলেছে। মাকে পেপার ডাইভোর্স করার খবরটা পাওয়া পর্যন্ত তার সমস্ত দেহটা জ্বলছে। সেদিন লিপিকার মুখে খবরটা শুনে সে বিশ্বাস করে নি। ব্যাপারটা মা নিজেও গোপন রেখেছিলেন। মায়ের অপমানের কথা শোনা পর্যন্ত এই শহরে এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করছে না। দেহ এবং মনে অসহ্য এক জ্বালা অনুভব করছে নির্মল। বীরেশ্বর রক্ষিতের অপকর্মের পাহাড়টা যেন ক্রমশ তাঁর সন্তান নির্মলকেই গ্রাস করবার জন্যে এগিয়ে আসছে।

নির্মলের মনে পড়ছে মহাভারতের অমর চরিত্র পুরুর কথা — পিতা যযাতির অভিশাপের বোঝা মাথায় নিয়ে যে অকালে জরাগ্রস্ত হয়েছিল। নির্মল মনস্থির করে ফেলেছে—কোহিনূর থিয়েটারের ছাঁপানো প্যাডে লিপিকার মুক্তিপত্র সে সই করে এনেছে। ব্যাণ্ডেল থেকে ফেরবার পথে কাগজটা সে লিপিকাকে হাতে তুলে দেবে। এই চিঠির ব্যাপারে বাবার সঙ্গে আলোচনা করবার কোনো প্রয়োজন অনুভব করে নি নির্মল। গোপনে একমাত্র সন্তানের জননীকে ডাইভোর্স করতে বীরেশ্বরের তো দ্বিধা হয় নি? তাঁর আদরের খোকাকে তো এর কিছুই জানানো হয়নি।

"আসুন।" লিপিকার কথায় নির্মলের হুঁশ হলো।

অলিভ গ্রীন রঙের ডবল্-এম-বি ২০১৩ গাড়ীর সামনে এসে সুসজ্জিতা লিপিকা নিজেই দরজা খুলে দিলো। "বাঃ, সুন্দর রঙ তো," নির্মল গাড়িটার দিকে তাকিয়ে বললো।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বড়ো রাস্তায় পড়ে লিপিকা বললো, "লাস্ট মোমেন্টে ড্রাইভার নিলাম না। লোকটাকে আজকাল আমার একটু সন্দেহ হয়। গাড়ির ভিতরের কথাবার্তা বাইরে ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। আমি যে উকিলের কাছে যাচ্ছি তা থিয়েটারের অনেকে জেনে ফেলেছে।"

"খুব ভাল করেছেন," নির্মল হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। আজকের এই যুগলযাত্রায় তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি তার পক্ষে অস্বস্তিকর।

"আপনার ইচ্ছে হলে আমরা হাওড়া স্টেশন থেকে লোকাল ট্রেন ধরতে পারি", লিপিকা বলেছিল।

"কোনো প্রয়োজন নেই। এইটুকু রাস্তা দু'জন ভাগাভাগি করে ড্রাইভ করবো। গাড়িটা আপনার না হলে বলতাম আমি একাই চালাবো।" নির্মল হাসতে হাসতে বলেছিল।

বাড়ি থেকে বেরোবার পথে লিপিকার মনে নানা চিন্তা জট পাকিয়েছিল। প্রথমে জয়ের প্রচণ্ড আনন্দ অনুভব করেছিল লিপিকা। কিন্তু তারপরেই বিষণ্ণতা। লিপিকা নিজেকে হাল্কা করতে চায়। কিন্তু নির্মলের মুখের হাসি ভীষণ ভাল লাগছে।

দিল্লী রোডের হাইওয়ে ধরে গাড়ি চলেছে। কিছুক্ষণ এক ভাবে ষ্টিয়ারিং ধরে থাকবার পর লিপিকা বললো, "নির্মলবাবু, আমি অনেক ভেবে দেখলাম। আমার দুঃখের সঙ্গে অযথা আপনাকে জড়িয়ে ফেলা উচিত হবে না। আপনার লেখা চিঠি নিয়ে, আইনের ফুটো দিয়ে আমি হয়তো বেরিয়ে আসবো—কিন্তু আপনাদের সংসারে অশান্তি ঢুকবে।"

"অশান্তি সেখানে এখনই রয়েছে লিপিকা," গম্ভীরভাবে বললো নির্মল।

লিপিকার চোখে জল। নির্মল বললো, "লিপিকা, তুমি কাঁদছো? সামনে তোমার অভিনয়—মুড খারাপ হলে অভিনয় নষ্ট হবে।"

"আমাকে ক্ষমা করুন, নির্মলবাবু। চুক্তিপত্রের ফাঁদ থেকে মুক্তির লোভে আমি আপনাকে একটা যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম। খোঁজখবর নিয়ে জেনেছিলাম, এই বাঁকা পথ ছাড়া কোহিনূর থিয়েটারের গারদখানা থেকে আমার বেরিয়ে আসবার কোনো উপায় নেই।"

"এখন ?" প্রসন্ন নির্মল শান্তভাবে প্রশ্ন করেছিল।

গভীর দুঃখের সঙ্গে লিপিকা বললো, "যন্ত্রটা আমার চোখের সামনেই হঠাৎ মানুষ হয়ে উঠলো। আমি দ্বিধায় পড়ে গেলাম।"

এক মুহূর্তের জন্য গাড়ি থামাতে বললো নির্মল। অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের উষ্ণ আনন্দে দুজন পরস্পরের দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে রইলো। তারপর নির্মল বললো, "কোহিনূর থেকে মুক্তি দিয়ে তোমাকে এখানে ফেলে যাবো না লিপিকা। আমরা এই শহর থেকে দূরে বহু দূরে অন্য কোথাও চলে যাবো।"

লিপিকা বিশ্বাস করতে পারছে না। তার সর্বদেহে শিহরণ। আজ যেন থিয়েটার না-থাকলেই ভালো হতো। বিমুগ্ধ দুটি প্রাণ সংবিৎ হারিয়ে ফেলেছিল—সময়ের শাসন অমান্য করে তারা স্তব্ধ হয়ে রইলো। অনেকক্ষণ পরে নির্মল ঘড়ির দিকে তাকালো, ড্রাইভিং সীট থেকে লিপিকাকে সরিয়ে দিয়ে গাড়ি চালু করতে করতে কবিতার ছন্দে নির্মল মনে করিয়ে দিল ঃ

The woods are lovely dark and deep
But I have promises to keep
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.

•

বুধবারের এই রাত্রে বীরেশ্বর রক্ষিত কোহিনূরের অফিসে এসেছেন। আজও শেয়ার বাজারে অনেক লোকসান করেছেন বীরেশ্বর। কিন্তু চাপা এক পরিতৃপ্তির আনন্দে তিনি বুঁদ হয়ে আছেন। পায়ে যেন একটা বিষাক্ত কাঁটা ফুটেছিল। অনেক কষ্টে

সেটা তুলে ফেলবার ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। ইদ্রিস ড্রাইভার এবং মিলিটারি ডিসপোজালে কেনা দৈত্যাকার লরিটা বীরেশ্বর মানস নেত্রে দেখতে পাচ্ছেন। আর দেখতে পাচ্ছেন অলিভ গ্রীন রঙের ডবলু-এম-বি ২০১৩—যার পিছনে লিপিকা সেন এবং ড্রাইভারের আসনে পরশুরাম পাত্র। গাড়িটা এতক্ষণে নিশ্চয় ব্যাণ্ডেল ছেড়ে দিল্লী রোডে পড়েছে।

জীবনটা ঠিক যেন সিঁড়িভাঙা অঙ্কের মতো – স্টেপ বাই স্টেপ হিসেব করে ওপরে উঠে যাচ্ছেন বীরেশ্বর। কেউ তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে নি। শেষ মুহূর্তে সামান্য এক নর্তকীর চ্যালেঞ্জ এসেছিল। শান্তভাবে তার সমাধান করতে পেরেছেন বীরেশ্বর। অসিত সেনশর্মা আর কখনও কোহিনূরের ভিতরের খবরাখবর পাবে না।

"কিছু বলবেন, স্যার?" জিজ্ঞেস করলো নরহরি।

"না, আজ একটু সকাল-সকাল বাড়ি যাবো।" এই বলে বীরেশ্বর উঠে পড়লেন।

বাড়তে গিয়েই কোহিনূরের পরবর্তী নাটকের কথা ভাবতে হবে বীরেশ্বরকে।

"হ্যালো, হ্যালো, ক্যালকাটা পুলিস কনট্রোল? দিস ইজ চিনসুরা পুলিস কনট্রোল।"

"স্পিকিং।"

"একটা আর্জেন্ট মেসেজ লিখে নিন, ভাই। অ্যাট কিলো-মিটার ফর্টি, নিয়ার ল্যাম্প পোস্ট নাম্বার হানড্রেড টু—ওয়ান

অ্যামবাসাডার কার স্ম্যাশড বাই আননোন লরি। কলকাতার দিকে অ্যামবাসাডার গাড়ি আসছিল, লরিটা উল্টো দিক থেকে। হেড অন কলিশন। গাড়িটা ধানক্ষেতের মধ্যে পড়ে আছে।”

“লরি অ্যারেস্টেড?”

“কোথায় লরি? অন্ধকারে মেরে পালিয়েছে—ইনজিওর্ড-দের হাসপাতালে পর্যন্ত নেয় নি।”

বীরেশ্বরের বাড়ির টেলিফোন বাজছে। “হ্যালো, হ্যালো, মিস্টার বীরেশ্বর রক্ষিত? ক্যালকাটা পুলিস কনট্রোল স্পিকিং। আই অ্যাম সরি স্যার, দুঃসংবাদ দিচ্ছি। ওয়ান মিস্টার নির্মল কুমার রক্ষিত অ্যাকমপেনেড বাই ওয়ান আনআইডেন্টিফায়েড উয়োম্যান দিল্লী হাইওয়েতে মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছেন। বডিজ ওয়েটিং অ্যাট চিনসুরা হাসপাতাল।”

একটা গোঙানির শব্দ বেরুলো। গুলিবিদ্ধ পশুর মতো সম্রাট বীরেশ্বর বুকটা চেপে ধরে মেঝেতে বসে পড়লেন।

পরের দিন সকালে টেলিফোনে নেদো মল্লিক দুঃসংবাদ পেলেন। নরহরি জানাচ্ছে, ওদের বডি কলকাতায় আসছে। পথে কোহিনূরে নামানো হবে।

নেদো মল্লিকের চাকর সনাতন উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলো, “কী হয়েছে হুজুর? বীরেশ্বরবাবুর কিছু হয় নি তো?”

নেদো মল্লিক হা-হা করে হেসে ফেললেন। তারপর কাপড়ের খুঁটে চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, “আমার ছাত্তর বীরেশ্বরের কিছুই হয় নি। সে এখন ছেলে এবং ছেলের-বউকে বরণ করে নেবার জন্যে কোহিনূর থিয়েটারের গেটের সামনে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে।”